**মহাবিশ্বের সীমানা**

**আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ**

**সূচিপত্র**

**ভাগ-১: জ্যোতির্বিদ্যা**

**প্রথম অধ্যায়: কসমোলজি**

**মহাবিশ্বের সীমানা**

**আলোর বেগের হার যেখানে**

**মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথায়?**

**মহাবিশ্বের বয়স কত**

**মহাবিশ্বে কতগুলো পরমাণূ আছে**

**ব্যর্থ তারকাদের গল্প**

**মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় নক্ষত্র**

**মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র**

**আমার ল্যাপটপ অন কেন?**

**শেষ হয়ে যাচ্ছে সূর্য?**

**মিল্কিওয়ের নিকটতম গ্যালাক্সি**

**আন্তঃছায়ায়াপথীয় সংঘর্ষে নতুন তারা**

**আণবিক কৃষ্ণগহ্বরর**

**পালসার সংকেতের রহ্যসভেদ**

**মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে ধূম্রজাল**

**ডার্ক ফোটনের সন্ধানে**

**দ্বিতীয় অধ্যায়: সৌরজগৎ**

**আমাদের সৌরজগত কত বড়?**

**উন্মোচিত হলো সূর্যের লুকানো রহস্য**

**কেপলার গ্রহের সসূত্র কোথায় পেলেন**

**গ্রহদের অদ্ভুত উলটো গতি**

**শনি গ্রহ বলয় পেল কোথায়**

**ধূমকেতু লেজ পায় কোথায়**

**চাঁদের বুকে পৃথিবীর অক্সিজেন**

**পৃথিবীর ২য় চাঁদ**

**কোথায় গেল মঙ্গলের পানি**

**অলিম্পাস মনসঃ সৌরজগতের উচ্চতম আগ্নেয়গিরি**

**যে যান মানুষকে মঙ্গলে নেবে**

**নবম গ্রহের সন্ধানে**

**প্লুটোর গ্রহত্ব হারানো কাহিনি**

**মহাবিশ্বের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ**

**সৌরজগতের বাইরে বৃহত্তম গ্রহ**

**নতুন বাসযগ্য গ্রহ**

**স্পেস ট্রেনে মহাকাশ ভ্রমণ**

**তৃতীয় অধ্যায়: রাতের আকাশ**

**উজ্জ্বল তারাদের গল্প**

**অন্য গ্রহের আকাশ**

**চতুর্থ অধ্যায়: পৃথিবী**

**বড় হচ্ছে দিনের দৈর্ঘ্য**

**পৃথিবীর প্রকৃত মানচিত্র উদ্ভাবন**

**পৃথিবীর কত জোরে ঘোরে**

**পৃথিবীর ঘূর্ণনে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন?**

**নিজে বের করুন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ**

**পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ মেরু থাকলেও পূর্ব পশ্চিম মেরু নেই কেন?**

**কুয়াশাধনু**

**পঞ্চম অধ্যায়: আকাশ দেখে শিখি**

**দিক নির্ণয়ে হাত ঘড়ি**

**সময় জানাবে সপ্তর্ষী**

**দিক নির্ণয়ে আদমসুরত**

**সূর্য দেখে দিক নির্ণয়**

**ভাগ-২: পদার্থবিদ্যা**

**ষষ্ঠ অধ্যায়: আপেক্ষিকতা**

**আইনস্টাইন ও আপেক্ষিক তত্ত্ব**

**সময় কেন পেছনে চলে না**

**মহাকর্ষের ইতিহাস**

**কাল দীর্ঘায়নে মহাকর্ষের কারসাজি**

**মহাকর্ষ তরঙ্গঃ কেন কীভাবে**

**সপ্তম অধ্যায়: কণাপদার্থবিদ্যা**

**ফোটন-ফোটন সংঘর্ষ**

**মহাশূন্যে কোয়ান্টাম বিজড়ন**

**এক ঢিলে পাঁচ পাখি**

**পঞ্চম মৌলিক বল**

**ত্বরকযন্ত্রের কণা গতি পায় কোথায়**

**যন্ত্র কথনঃ অ্যালাইস**

**উৎসর্গ**

**প্রয়াত আব্বাকে**

**ভূমিকা**

**পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ করুণায় প্রকাশিত হলো মহাবিশে^র সীমানা বইটি। এটি আমার প্রথম মৌলিক বই। গত (২০১৭) বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিল অনূদিত বই অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম। লেখক স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লোডিনো।**

**শৈশবে ভাবতাম, পৃথিবী না জানি কত বড়? কোথায় এর শেষ? যেখানে শেষ তার পরে কী আছে? মানুষ কি পৃথিবীর বাইরে যেতে পারে? একটু বড় হয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলাম। বরং প্রশ্নগুলোকেই লেগেছে হাস্যকর।**

**কিন্তু প্রশ্নগুলোতে যদি পৃথিবী শব্দটি কেটে ‘মহাবিশ^’ বসিয়ে দেই, তাহলে আর হাস্যকর থাকে না। মহাবিশে^র যেখানে শেষ আসলেই তার পরে কী আছে? প্রশ্নটির উত্তর পৃথিবীর প্রশ্নের মতো অত সোজা নয়। সেটাই আলোচিত হয়েছে মহাবিশে^র সীমানা বইয়ের শুরুর অংশে। বাকি অংশে রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখার সংকলন।**

**বইটির অধিকাংশ লেখাই ইতোপূর্বে বিজ্ঞানচিন্তা, ব্যাপন ও জিরো টু ইনফিনিটিসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেখা ছিল আবার আমার মহাকাশ চর্চার ওয়েবসাইট বিশ^ ডট কমের মহাবিশ^ বিভাগে (ংশু.নরংযড়ি.পড়স)।**

**বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের কাছে প্রশ্ন করি, নিজে বিজ্ঞানী না হয়ে কি বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করা উচিৎ? প্রশ্নটা আসার কারণ হলো, এ কাজ করতে গিয়ে হয়ত অনেক সময় লেখকরা (আমিও) বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলো থেকে সরে আসেন। তবুও লেখার সপক্ষে আমার যক্তি হলো, জ্ঞানের চর্চার স্বার্থে লেখালেখি হওয়া উচিৎ। উপরন্ত বিজ্ঞানীরা সব সময় বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার সময় পান না। অথচ বিজ্ঞানের ধারণাগুলো সাধারণ মানুষেরও জানা প্রয়োজন। নতুন নতুন তত্ত্ব ও ধারণার সাথে পরিচিত থাকা প্রয়োজন।**

**বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞানের অভাবেই আজকের আধুনিক পৃথিবীতেও ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি নামে সংগঠনের অস্তিত্ব আছে। এমনকি তারা ২০১৭ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় একটি বড় সম্মেলনও করেছে। বিজ্ঞানের অগগ্রতির জন্যে এসব ধারণা ক্ষতিকর।**

**লেখায় ভুল এড়াতে আমি চেষ্টা করি বেশি তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা না আনতে। তাত্ত্বিক বিষয়কে সহজ করে বলার চেষ্টা করার বদলে চেয়ে বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করি তথ্যনির্ভর লেখা লিখতে। সঠিক তথ্যসূত্র দেখে লিখলে এক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা কমে আসে। যেমন ধরুন, এ বইয়ের ‘উজ্জ্¦ল তারাদের গল্প’ লেখাটি। লেখাটি তথ্য ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণ নির্ভর। তাত্ত্বিক আলোচনা কম।**

**বিজ্ঞান লেখালেখির সাথে যুক্ত আছি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু লেখালেখির সঠিক ধারাটা বুঝতে সময় লেগেছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছি বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক বড় ভাই তুল্য আব্দুল গাফফার রনি ভাই ও নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ভাই এর কাছ থেকে। এ দুজনের অবদান কখনও ভুলব না। অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম প্রকাশ করার ব্যাপারেও রনি ভাইয়ের অকৃত্রিম সহায়তা ও তত্ত্বাধান পেয়েছিলাম। এ বইটিও ভাইয়ের দেয়া উৎসাহের ফসল।**

**বই প্রকাশের আন্তরিকতা প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের অন্বেষার প্রকাশক মো. শাহাদাৎ হোসেন ভাইকেও ধন্যবাদ। বইয়ের বিষয়বস্তু উপযোগী একটি প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্যে আনোয়ার হোসেন ভাইকেও ধন্যবাদ না দিলেই নয়।**

**এটি আমার প্রথম মৌলিক বই। বই নিয়ে কাজ করার সময়গুলোও বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে বইটিতে ছোট-বড় ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকের চোখে এমন কোনো ভুল চোখে পড়লে ইমেইলে বা ফেসবুকে জানানোর অনুরোধ করছি।**

**আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ**

**মতিঝিল, ঢাকা**

**প্রথম অধ্যায়: কসমোলজি**

**মহাবিশে^র সীমানার খোঁজে**

**এই মহাবিশে^র শেষ কোথায়? প্রশ্নটি শুধু কিশোর মনে নয়, জাগে বড়দের মনেও। যেখানে মহাবিশে^র শেষ, তার পরেই বা কী আছে? আমরা তো জানি, মহাবিশ^ প্রসারিত হচ্ছে। মানে বড় হচ্ছে। কিন্তু কোথায় প্রসারিত হচ্ছে? সেখানে আগে থেকে কী ছিল? কী আছে আমাদের চেনা-জানা মহাবিশে^র বাইরে?**

**এর উত্তর যদি দেওয়াই হয়, তাহলে মনে হবে মহাবিশে^র বুঝি কোনো একটি প্রান্ত আছে। কথাটি বেশ সহজে বলে ফেলা গেলেও তা মোটেই অত সোজা বিষয় নয়। যেমন উপরের প্রশ্নগুলোর আরেকটি রূপ হলো এমন, ‘আমরা কি এমন কোথাও যেতে পারি, যেখান থেকে মহাবিশে^র বাইরের অবস্থা দেখা যায়?’ যেভাবে আমরা জানালা দিয়ে উঁকি দিলেই বাইরের পরিবেশ দেখতে পাই, সেভাবে কি মহাবিশে^র বাইরের রূপ দেখতে পারি? খুব সম্ভবত, না।**

**একটি কারণ হলো মহাজাগতিক নীতি (পড়ংসড়ষড়মরপধষ ঢ়ৎরহপরঢ়ষব)। নীতিটি অনুসারে, আমরা মহাবিশে^র যেদিকেই তাকাই, একই রূপ দেখতে পাই। যে কোনো দিক থেকে মহাবিশ^কে একই রকম দেখায়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন আইসোট্রপিক মহাবিশ^। এই নীতি আবার পদার্থবিদ্যার আরেকটি সূত্রেরই একটি রূপ। পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো সর্বত্র একইভাবে কাজ করে। হ্যাঁ, অল্প জায়গা বিবেচনা করলে একটু ভিন্নতা চোখে পড়বে বটে। যে কোনো দিকে তাকালেই তো শুক্র, বৃহস্পতি চোখে পড়বে না। কিন্তু বড় মাপকাঠিতে তাকালেই মহাবিশ^ সব দিকে একই রকম হয়ে যাবে। যে কোনো দিকে দেখা যাবে সমান সংখ্যক ও একই রকমের প্রায় সমান সংখ্যক ছায়াপথ।**

**উপরের নীতির একটি ব্যাখ্যা হলো, মহাবিশে^র কোনো প্রান্ত নেই। এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে গেলে আমরা মহাবিশে^র বাইরে উঁকি দিতে পারব। দেখতে পারব, কী আছে বাইরে।**

**প্রান্তহীন এই মহাবিশে^র ধারণা সহজে বলার জন্যে অনেক সময় বেলুনের উদাহরণ দেওয়া হয়। ধরা যাক, বেলুনের পৃষ্ঠে একটি পিঁপড়া হাঁটছে। এটি যে কোনো দিকে হাঁটতে পারে ইচ্ছে মতো। কিন্তু বেলুনের পৃষ্ঠে বেচারা পিঁপড়া কোনো প্রান্ত খুঁজে পাবে না। বেলুনের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্দিষ্ট হলেও তার কোনো সীমানা নেই। পৃষ্ঠে কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রও নেই। ফলে বিশেষ কোনোও বিন্দুরও অস্তিত্ব নেই। তবে বেলুনের পৃষ্ঠ দ্বিমাত্রিক। আর মহাবিশ^ হলো তার ত্রিমাত্রিক সংস্করণ।**

**কিন্তু মহাবিশ^ প্রসারিতও হচ্ছে আবার কেন্দ্রও নেই তা কী করে সম্ভব? আবার ফিরে যাওয়া যাক, বেলুনের কাছে। ধরা যাক, বেলুনের পৃষ্ঠে অনেকগুলো বিন্দু আছে। এখন ফুঁ দিয়ে বেলুনকে আরও বড় করা হলো। ফলে পিঁপড়ারা দেখবে বেলুনের পৃষ্ঠের বিন্দুগুলো দূরে চলে যাচ্ছে। পিঁপড়া থেকে কোনো বিন্দু যত দূরে থাকবে তা তত দূরে সরে যাবে। কিন্তু পিঁপড়াটি যেখানেই থাকুক, দেখবে ঐ একই ঘটনাই।**

**তবে বেলুনের সাথে মহাবিশে^র পার্থক্য আছে। বেলুনকে ফোলানো হলে তা প্রসারিত হয় ত্রিমাত্রিক স্থানে। এটা আমাদের মহাবিশে^র বেলায় খাটে না। মহাবিশে^র সংজ্ঞা অনুসারেই বাইরে কিছু থাকতে পারে না। বেলুনের বাইরে তো আরেকটি জগৎ আছে। কিন্তু সব কিছু নিয়েই তো মহাবিশ^। ‘বাইর’ বলতে কিছু নেই। স্টিফেন হকিং এর মতে এটা অনেকটা এই প্রশ্নের মতো যে, ‘উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে?’**

**অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্পিদার্থবিদ ড. ক্যাটি ম্যাক এর মতে, ‘মহাবিশ^ প্রসারিত হচ্ছে’ এভাবে না বলে ‘ঘনত্ব কমছে’ বলা ভাল। মানে, মহাবিশ^র যত বড় হচ্ছে, পদার্থ তত কমছে।**

**আমরা সাধারণত প্রসারণশীল মহাবিশ^ বলতে বুঝি, ছায়াপথরা একে অপর থেকে দূরে সরছে। আসলে কিন্তু ঠিক সেটা ঘটছে না। প্রসারণ মানে ‘ছায়াপথরা স্থান ভেদ করে চলছে’ তা নয়। আসলে স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে। একটি পুকুর হঠাৎ করে ফুলে উঠলে তার মাছগুলো চলাচল না করেও যেভাবে দূরে সরে যাবে ঠিক তেমনি। ফলে মহাবিশে^র যে কোনো স্থানে গেলেই ঐ একই দৃশ্য দেখা যাবে। যেন বাকি সব কিছু দূরে সরছে।**

**আবার স্থানের প্রসারণের সাথে ছায়াপথরা দূরে সরছে প্রচ- গতিতে। সে গতি কখনও আবার আলোর বেগকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু আইস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত কথা হলো আলোর চেয়ে বেশি বেগ সম্ভব নয়। তবে এখানেও নীতিটির বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে না। কারণ নির্দিষ্ট কোনো বস্তু নির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব আলোর চেয়ে বেশি বেগে পাড়ি দিচ্ছে না। স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে। তার সাথে চলছে বস্তুগুলো।**

**সীমানা একটা আছে বটে!**

**মহাবিশে^র বয়স এখন ১৩৭০ কোটি বছর। কোনো বস্তু দেখতে হলে সেখান থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় ব্যয় হতে হবে। ওদিকে আলোর বেগ মহাবিশে^র সবোচ্চ বেগ হলেও তা অসীম নয়। যদিও সেটা সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। কিন্তু ১৩৭০ কোটি বছর ধরে প্রসারণশীল মহাবিশে^র পুরোটা আমাদেরকে দেখানোর মতো বড় নয় আলোর বেগ। জন্মের পর থেকে আমাদের কাছে থেকে মহাবিশে^র যত দূরের পর্যন্ত আলো এসে পৌঁছতে পেরেছে তার পুরোটার নাম পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ^ (ড়নংবৎাধনষব ঁহরাবৎংব)। হিসাব করে দেখা যায়, এই পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ^ ৯,২০০ কোটি আলোকবর্ষ (আলো এক বছরে যত দূর যায়) চওড়া।**

**তার মানে এই পরিসরের বাইরের কিছু আমরা কখনও দেখব না। কারণ, ক্রমেই দ্রুততর বেগে মহাবিশে^র দূরের অঞ্চলগুলো চলে যাচ্ছে আরও আরও দূরে। আগেই বলেছি, যে অঞ্চল যত দূরে আছে, সেটি তত জোরে সরে যাচ্ছে। আলো যে বেগে আসছে, ঐ অঞ্চল তার চেয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে। ফলে ৯,২০০ কোটি আলোকবর্ষের বাইরের কোনো কিছু আমরা কখনই দেখব না।**

**প্রসারণ আবার সব সময় একই হারে হয়নি। জন্মের খুব পরপর হঠাৎ করে মহাবিশ^ অনেক বড় হয়ে যায়। এ ঘটনার নাম স্ফীতি (রহভধষঃরড়হ)। সেই সময় মহাবিশ^ কিছুক্ষণের জন্যে বর্তমানের চেয়েও দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল। স্ফীতিকে সঠিক ধরে নিলে প্রকৃত মহাবিশে^র আকার পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশে^র আকারের ১০২৩ গুণ হয়। এক এর পরে ২৩ টি শূন্য দিলে যা হয় সংখ্যাটি তত। ফলে মহাবিশে^র একটি সীমানা সত্যিই আছে। সমস্যা হলো মর্ত্যরে মানুষ সেটা কখনও দেখতে পারবে না।**

**সূত্র: অ্যান্ড্রু লিডল/ ইন্ট্রুডাকশন টু মডার্ন অ্যাস্ট্রোনমি, লাইভ সায়েন্স ডট কম।**

**আলোর বেগের হার যেখানে**

**আইন্সটাইনের আপেক্ষিক তত্ব বলছে আলোর বেগ (সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল) ই সর্বোচ্চ, কোন কিছুই এই বেগ অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক গ্যালাক্সিরা আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে দূরে প্রসারিত হচ্ছে। তাহলে? চলুন দেখা যাক।**

**আলোর বেগের কাছাকাছি যেতে হলে প্রয়োজন অনেক বেশি এনার্জি। মনুষ্যবাহী মহাকাশযানের সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড হচ্ছে ঘন্টায় প্রায় ৪০ হাজার কি.মি.। এটা হল অ্যাপোলো-১০ এর গতি।**

**মহাবিশ্বের সব শক্তি ব্যবহার করে ফেললেও আলোর সমান বেগ অর্জন সম্ভব নয়। আমরা জানি, বিগ ব্যাঙের পর থেকেই ডার্ক এনার্জির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। ছায়াপথসমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেগুলো ছাড়া যারা নিজেদের মধ্যকার মহাকর্ষীয় টানে আবদ্ধ। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ও প্রতিবেশি অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি নিজেদের থেকে দূরে না সরে পারস্পরিক মহাকর্ষীয় ভালোবাসায় দিন দিন কাছে আসছে।**

**আমাদের থেকে যে গ্যালাক্সি যত দূরে দেখা যায় তারা তত বেশি বেগে দূরে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে এটা সম্ভব হয়ে যাচ্ছে যে তাদের কেউ কেউ অনেক দূরে হওয়ায় বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর বেগকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থায় সেই সব গ্যালাক্সি থেকে আলো কখোনই আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছবে না।**

**এ অবস্থায় ঐ গ্যালাক্সি থেকে আসা পৃথিবীতে পৌঁছানো সর্বশেষ ফোটনটি দেখা যাবার পরই গ্যালাক্সিটি দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাবে।**

**এখানে এখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আলোর পরম বেগ বিষয়ক আইন্সটাইনের আপেক্ষিক তত্ব লংঘন হচ্ছে। কিন্তু না। প্রকৃতপক্ষে গ্যালাক্সিরা নিজেরা খুব বেশি জায়গা (ঝঢ়ধপব) অতিক্রম করছে না। বরং ঝঢ়ধপব বা স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে যার কারণে সাথে সাথে গ্যালাক্সিরাও প্রসারিত হচ্ছে।**

**এখানে মাথায় রাখতে হবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ মানে মহাবিশ্বের আয়তনের প্রসারন। অর্থ্যাৎ ঝঢ়ধপব বা স্থান প্রসারিত হচ্ছে। অতএব গ্যালাক্সিরা নিজেরা দূরে সরছে না বরং তারা যেই ‘স্থান’-এ আছে সেটাই প্রসারিত হচ্ছে।**

**মনে করুন একটি পুকুরের কেন্দ্র থেকে সব দিকেই মাছ আছে। এখন কোন এক শক্তির বলে (মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে যেটা ডার্ক এনার্জি) পুকুর প্রসারিত হয়ে পরিধি কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত দূরে চলে যাচ্ছে। এই প্রসারণ পানির প্রবাহজনিত বেগ নয়। এখন এর প্রভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছেরাও নিজেদের থেকে দূরে সরে যাবে।**

**অথবা ধরুণ, একটি ফূটবল অজানা কারণে আপনাতেই বড় হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এর পরিধিতে আগে থেকেই থাকা পিঁপড়ারাও নিজেদের থেকে দূরে সরবে।**

**মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে পানি বা ফুটবলের স্থলে প্রসারিত হচ্ছে ফাঁকা স্থান যা প্রসারিত হতে হতে এর ভেতরকার সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।**

**আলোর বেগ যেহেতু এই প্রসারনশীল মহাবিশ্বের একটি বৈশিষ্ট্য তাই সে মহাবিশ্বের কোন বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হলেও মহাবিশ্বের নিজের জন্য প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ, মহাবিশ্ব নিজে আলোর চেয়ে বেশি বেগ পেতে পারে।**

**আরো তিন ট্রিলিয়ন বছর পর পৃথিবীর দিগন্ত থেকে সব গ্যালাক্সির দৃশ্য মুছে যাবে। তখন পৃথিবীর কোন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের কস্মোলজিস্ট জানবেনই না যে মহাবিশ্ব এত বিশাল।**

**সূত্রঃ ইউনিভার্স টুডে, ইংরেজি উইকিপিডিয়া (লিস্ট অব ভেহিকেল স্পিড রেকর্ড)**

**মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথায়?**

**মহাবিশ্বের কোন কেন্দ্র নেই!**

**কসমোলজির আদর্শ থিওরি অনুযায়ী ১৪ শত কোটি বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু। তার পর থেকেই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু তবু প্রসারণের নেই কোন কেন্দ্র। সব দিকে একই রকম দেখতে। বিগ ব্যাঙকে সাধারণ কোন বিস্ফোরণ মনে করা ঠিক হবে না। মহাবিশ্ব কোন কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ছে না। বরং, সমগ্র মহাবিশ্বই প্রসারিত হচ্ছে। আমরা এখন পর্যন্ত যা জানি, মহাবিশ্ব সব দিকেই সমানভাবে প্রসারিত হচ্ছে।**

**১৯২৯ সালে এডুইন হাবল বলেন, তিনি আমাদের থেকে বিভিন্ন দূরত্বের গ্যালাক্সিদের বেগ মেপেছেন, আর তারা যতই দূরে যাছে ততই তাদের বেগ বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে মনে হতে পারে, আমরা তাহলে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব যদি হাবলের সূত্রানুযায়ী সুষমভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহলে যে কোন জায়গাকেই এই রকম কেন্দ্র মনে হবে।**

**আমরা যদি একটি গ্যালাক্সিকে (নাম দিলাম খ) প্রতি সেকেন্ডে ১০, ০০০ কি.মি. বেগে দূরে সরে যেতে দেখি তাহলে গ্যালাক্সি খ এর একজন এলিয়েন আমাদের গ্যালাক্সি 'ক' কে একই বেগে বিপরীত দিকে যেতে দেখবে। যদি 'খ' গ্যালাক্সির দিকেই আরেকটি গ্যালাক্সি 'গ' থাকে, তাকে আমরা সেকেন্ডে ২০, ০০০ কি.মি. বেগে সরে যেতে দেখবো। 'খ' গ্যালাক্সির এলিয়েন 'গ' কে সেকেন্ডে ১০, ০০০ কি.মি বেগে সরতে দেখবে।**

**কোন গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সির বেগ কেমন দেখাবে তার সারণী দেখুন।**

**ক খ গ**

**ক থেকে ০ শস/ং ১০,০০০ শস/ং ২০,০০০ শস/ং**

**খ থেকে -১০,০০০ শস/ং ০ শস/ং ১০,০০০ শস/ং**

**তাহলে, 'খ' গ্যালাক্সিতে থাকা এলিয়েনও নিজেকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র মনে করবে।**

**বেলুনের উদাহরণঃ**

**মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বোঝার জন্য স্থানকে একটি সম্প্রসারণশীল বেলুনের সাথে তুলনা করা হয়। আর্থার এডিংটন ১৯৩৩ সালে তাঁর বই দি এক্সপানডিং ইউনিভার্স (ঞযব ঊীঢ়ধহফরহম টহরাবৎংব) বইয়ে এই উপমা দেন। ফ্রেড হয়েল তাঁর জনপ্রিয় বই দি নেচার অব দি ইউনিভার্স (ঞযব ঘধঃঁৎব ড়ভ ঃযব টহরাবৎংব) বইয়ের ১৯৬০ এর সংস্করণেও একই উপমা প্রয়োগ করেন। হয়েল লেখেন, ‘আমার গণিত শাস্রের বাইরের বন্ধুরা আমাকে প্রায়ই বলে, মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ তারা বুঝতে পারছে না। গণিতের অত শত হিসেব বাদ দিয়ে আমি বেলুনের উপমা দেই যার পৃষ্ঠে আছে অনেকগুলো বিন্দু। বেলুনটা যদি ফেটে যায়, তবে এই বিন্দুগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরতে থাকবে। ঠিক এভাবেই গ্যালাক্সিরাও দূরে সরে।**

**বেলুনের উপমাটা আসলেই দারুণ, কিন্তু একে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। নইলে এটা আরো বিভ্রান্তির জন্ম দেবে। হয়েল বলেন, "অনেকভাবে এই উপমা ভুল দিকে নিয়ে যেতে পারে"। মনে রাখতে হবে, ত্রিমাত্রিক (ঞযৎবব উরসবহংরড়হধষ) স্থানকে (ঝঢ়ধপব) বেলুনের দ্বি-মাত্রিক পৃষ্ঠের সাথে তুলনা করতে হবে। এখানে পৃষ্ট সুষম (ঐড়সড়মবহড়ঁং) এবং কোন বিন্দুকে কেন্দ্র বিবেচনা করা যাবে না। বেলুনের নিজের কেন্দ্রের অবস্থান পৃষ্ঠে নয়, তাই একে মহাবিশ্বের কেন্দ্রও মনে করা যাবে না। এবার আপনি বেলুনের রেডিয়াল ডিরেকশনকে সময় মনে করতে পারেন।**

**হয়েলের প্রস্তাবনা ছিল এ রকম। কিন্তু এটাও কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে।**

**পৃষ্ঠের বিন্দুগুলোকে মহাবিশ্বের অংশ মনে না করলেই আরো ভালো হয়। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে গাউস আবিষ্কার করেন, স্থানের বৈশিষ্ট্য যেমন বক্রতাকে স্বকীয় রাশিমালা দ্বারাই প্রকাশ করা যায় যে রাশিগুলো কোথায় বক্রতা ঘটছে তা বিবেচনা ছাড়াই পরিমাপ করা যায়। তাহলে, 'স্থান' এর বাইরে অন্য কোন মাত্রার (উরসবহংরড়হ) উপস্থিতি না থাকলেও স্থান বাঁকতে পারে। তিনটা পাহাড়ের মাথার মধ্যবর্তী বিশাল ত্রিভুজের কোণ (অহমষব) মাপার মাধ্যমে গাউস 'স্থান' (ঝঢ়ধপব) এর বক্রতাও মাপার চেষ্টা করেছিলেন।**

**বেলুনের উপমা ভাববার সময় মাথায় রাখতে হবে-**

**\* বেলুনের দ্বি-মাত্রিক পৃষ্ঠ ত্রিমাত্রিক স্থানের অনুরূপ।**

**\* যে ত্রিমাত্রিক স্থানে বেলুন আবদ্ধ আছে তা অন্য কোন উচ্চ-মাত্রিক ফিজিকেল (চযুংরপধষ) স্থানের অনুরূপ নয়।**

**\* 'বেলুনের কেন্দ্র' ফিজিকেল কোন অর্থ বহন করবে না।**

**\* মহাবিশ্বের আকার সসীম হতে পারে যা বেলুনের পৃষ্ঠের মতই প্রসারিত হচ্ছে, আবার অসীমও হতে পারে।**

**\* প্রসারণশীল বেলুনের মতই গ্যালাক্সিরা প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু গ্যালাক্সি নিজে প্রসারিত হচ্ছে না। কারণ তার নিজস্ব অভিকর্ষ।**

**সূত্র: এমআইটি; ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, রিভঅরসাইড**

**মহাবিশ্বের বয়স কত?**

**মহাবিশ্বের বয়স কত- এই প্রশ্নটি অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। আসলে মহাবিশ্বের বয়স গণনা শুরু হয়েছে বিগ ব্যাঙের পর থেকে- যখন সময় গণনা শুরু। তার আগে সময়েরই অস্তিত্ব ছিল না, অন্তত আমাদের কাছে পরিমাপ করার কোন হাতিয়ার নেই।**

**চিত্র: মহাবিশ্বের বয়সের নকশা**

**মহাবিশ্বের বয়সের ব্যাপারে সবচেয়ে সুসঙ্গত তথ্য হচ্ছে ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বছর বা প্রায় ১৪ বিলিয়ন তথা ১৪০০ কোটি বছর। তো কিভাবে মাপা হল মহাবিশ্বের বয়স? এর উপায় আছে দুটি। দুটোরই কৃতিত্ব হাবলের।**

**প্রথম উপায় হচ্ছে ছায়াপথসমূহের (এধষধীু) বেগ ও দূরত্ব পরিমাপের মাধ্যমে। যেহেতু ছায়াপাথসমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ছাড়া), তাহলে আমরা বলতেই পারি, অতীতের কোন এক সময় এরা সবাই যুক্ত ছিল।**

**বর্তমানে গ্যালাক্সিদের বেগ, পারস্পরিক দূরত্ব ও এর সাথে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হার কাজে লাগিয়ে আমরা বের করতে পারি, এই অবস্থানে আসতে তাদের কত সময় লেগেছে। আর এই সময়টাই তো মহাবিশ্বের বয়স! আর এভাবে উত্তরটা পাওয়া গেছে প্রায় ১৪ বিলিয়ন বছর।**

**মহাবিশ্বের বয়স বের করার আরেকটি উপায় হল, সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রপুঞ্জগুলোর (ংঃধৎ পষঁংঃবৎং) বয়স বের করা। কারণ, মহাবিশ্ব এতে অবস্থিত কোন জ্যোতিষ্কের চেয়ে কম বয়সী হতে পারে না। পারে কি?**

**আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়েকে প্রদক্ষিণরত বটিকাকার (এষড়নঁষধৎ) নক্ষত্রপুঞ্জগুলো এখন পর্যন্ত আমাদের খুঁজে পাওয়া প্রাচীনতম বস্তু। এসব নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত তারকাগুলোর (ঝঃধৎ) ব্যাপক বিশ্লেষণে তাদের বয়স পাওয়া গেছে প্রায় ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বছর।**

**এই দুই মেথডের মিল আমাদেরকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী করেছে যে আমরা তাহলে মনে হয় মহাবিশ্বের সঠিক বয়স জেনে ফেলেছি!**

**সূত্রঃ হাবল সাইট, স্পেইস ডট কম**

**মহাবিশ্বের প্রসারণ নিয়ে ধূ¤্রজাল**

**২০১১ সাল। তিন জন পদার্থবিদ এ জন্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন যে তারা আবিষ্কার করলেন, মহাবিশ্ব শুধু প্রসারিতই হচ্ছে না, প্রসারণের বেগও প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।**

**এই আবিষ্কারের ফলেই রহস্যময় ডার্ক এনার্জির উপস্থিতির ব্যাপারে সবাই একমত হলেন। ধারণা করা হয়, এই ডার্ক এনার্জির প্রভাবেই মহাকর্ষের আকর্ষণ এড়িয়ে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই আবিষ্কার কসমোলজির স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে আমূল বদলে দেয়। কিন্তু বর্তমানে পদার্থবিদরা বলছেন, এই আবিষ্কার সম্ভবত ভুল ছিল। দাবির পক্ষে তাদের কাছে আছে আরো বেশি পরিমাণ উপাত্ত।**

**২০১১ সালের নোবেল পুরস্কার ভাগাভাগি করে নেন তিন জন পদার্থবিজ্ঞানী। এরা হলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সল পার্লমাটার, জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাম রেইস ও অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রায়ন পি. শেমিডিট।**

**১৯০০ এর দশকে এই তিন বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন টাইপ ওয়ানএ সুপারনোভা (ঞুঢ়ব ১ধ ংঁঢ়বৎহড়াধব) নিয়ে। শ্বেত দানব (যিরঃব ফধিৎভ) নক্ষত্রের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে এ ধরণের সুপারনোভাদের বিস্ফোরণের মাধ্যমে। শ্বেত দানব নক্ষত্র হল মহাবিশ্বের অন্যতম ঘন বস্তু। নিউট্রন নক্ষত্র বা ব্ল্যাক হোলরাই শুধু এদের চেয়ে বেশি ঘন হতে পারে।**

**একটি আদর্শ শ্বেত দানব নক্ষত্র দেখতে পৃথিবীর চেয়ে সামান্য বড় হতে পারে। কিন্তু এর ভর কিন্তু হতে পারে আমাদের সূর্যের প্রায় সমান। উল্লেখ্য সৌরজগতের ৯৯.৮৬ ভাগ ভরই সূর্যের একার কাছে। ১৩ লক্ষ পৃথিবীকে আপনি সূর্যের মধ্যে জায়গা করে দিতে পারবেন।**

**এখন একটু ভাবনু যে কী হতে পারে যখন এত তীব্র ঘন বস্তু যখন নিজের মহাকর্ষের চাপে গুটিয়ে যাবে। এদের দীপ্তি (নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতা) হতে পারে আামদের সূর্যের চেয়ে পাঁচ শ কোটি গুণ পর্যন্ত।**

**সব ধরণের টাইপওয়ান সুপারনোভাই বিস্ফোরণের সময় প্রায় একই রকম উজ্জ্বলতা ছড়ায়। ফলে এদের আলোর বিকিরণ পরিমাপ করে পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব বের করা সম্ভব। আবার রং এর পার্থক্য পরিমাপ করে এটাও জানা যায় যে এরা কত দ্রুত গতিশীল।**

**পার্লমাটার, রেইস ও শেমিডিটি টাইপওয়ান সুপারনোভার পরিচিত সব উপাত্ত বিশ্লেষণ করে হতবাক হয়ে যান। হাবল স্পেস টেলিস্কোপসহ পৃথিবীর আরো কিছু টেলিস্কোপ দিয়ে এই উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল। দূরের সুপারনোভাদেরকে কাছেরগুলোর সাধে তুলনা করে দেখা গেল ওরা অনেক বেশি অনুজ্জ্বল, প্রায় ২৫ শতাংশের মতো। এরা আসলে অনেক বেশি দূরে আছে। ফলে মহাবিশ্ব ক্রমশ দ্রুততর বেগে প্রসারিত হচ্ছে। এই আবিষ্কার এতটাই মৌলিক যে এটা কসমোলজির একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।**

**আরেকটি উৎস থেকেও এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে। বিগ ব্যাং এর পরে যে কসমিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ ঘটেছিল তাও মহাবিশ্বের ক্রমশ দ্রুততর গতিকে সমর্থন করছে।**

**এ বছরের শুরুতে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে মহাবিশ্ব আগের ধারণার চেয়ে ৮ শতাংশ দ্রুত বেগে প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু যে ডার্ক এনার্জিকে এই তীব্র প্রসারণের নায়ক মনে করা হচ্ছে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হচ্ছে না।**

**কিন্তু এখন এক দল আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ বলছেন ডার্ক এনার্জি নিয়ে চিন্তা করাই নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবত এর কোনো অস্তিত্বই নেই। তাঁদের দাবির সপক্ষে আছে আরো বেশি পরিমাণ টাইপওয়ান সুপারনোভার তথ্য।**

**তাঁরা বলছেন, যে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে আগের বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়েছিল সেটি ১৯৩০ সালে পুরানো পদ্ধতি। তাঁদের মতে বর্তমানে হাতে থাকা বিপুল পরমিাণ সুপারনোভার তথ্যের ক্ষেত্রে আগের পুরানো নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তাঁরা আরো বলছেন, কসমিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ যে প্রমাণ দিয়েছিল সেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না।**

**গবেষণা দলের প্রধান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববদ্যিালয়ের সুবির সরকার বলেছেন,**

**'আমরা ৭৪০টি টাইপওয়ান সুপারনোভা নিয়ে কাজ করেছি, যা আগের দশ গুণের চেয়ে বেশি। আমাদের উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের প্রসারণ দ্রুততর বেগে নয়, বরং হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি বেগে। এটা সত্য হলে আমাদের ডার্ক এনার্জির কোনো প্রয়োজন পড়বে না।'**

**দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কোন ধ্রুব বেগে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা পায় কি না। আপাতত অপেক্ষা ছাড়া কিছ্ইু করার নেই।**

**সূত্র:**

**১. সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম, ফিজ ডট অরগ**

**মহাবিশ্বে কতগুলো পরমাণু আছে?**

**মহাবিশ্ব অনেক বিশাল- এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কত বড়? পুরো মহাবিশ্ব যে ঠিক কতটা বড় সেটা বলার সাধ্য আপাতত কারো নেই।তবে আমরা আমাদের পরিচিত বা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের বিশালতা সম্পর্কে একটি ধারণা সহজেই পেতে পারি। এর সাইজ হল মোটামুটি ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ, যেখানে এক বিলিয়ন হল ১০০ কোটির সমান, আর এক আলোকবর্ষ হল আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্ব। জানো নিশ্চয়, আলো এক সেকেন্ডেই ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে।মনে রাখতে হবে, আলোকবর্ষ কিন্তু দূরত্বের একক, সময়ের নয়।**

**মনে হওয়া উচিৎ, এই বিশাল পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব পরমাণুয় ঠাঁসা। সেটা সত্যি হলেও স্বাভাবিকভাবে যা মনে হবে তার তুলনায় কম। মহাবিশ্বে আমাদের মিল্কিওয়ের মতো বিভিন্ন ছায়াপথের আনুমানিক সংখ্যা হল ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটির চেয়ে বেশি। প্রতিটি ছায়াপথে তারকার গড় সংখ্যা হল প্রায় একই পরিমাণ।ফলে মোট তারকার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০২২ বা এক এর পরে ২২ টি শূন্য দিলে যা হয় তার চেয়েও বেশি। আরেকটি হিসাবে তাই এদের সংখ্যা ধরা হয় ১.২দ্ধ১০২৩ থেকে ৩দ্ধ১০২৩ এর মধ্যে। এরা হল আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে যে পরিমাণ তারকা দেখতে পারি শুধু তার সংখ্যা। এই তারকাগুলো যদি এক একটি লবণের কণা হয়, তবে সবগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দিলে আট মাইল চওড়া একটি গোলক পাওয়া যাবে।**

**এই সংখ্যা দেখে যদি চমকে যাও, তবে আরো বড় চমকের জন্যে প্রস্তুত হও। হিসাব করে দেখা গেছে যে আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে পরমাণুর সংখ্যা হল ১০৭৮ থেকে ১০৮২ এর মধ্যে। ১ এর পরে ৭৮ থেকে ৮২ টা শূন্য বসিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করতে পারো যে সংখ্যাটা কত বড় হয়।**

**গড়ে প্রতিটি তারকার ভর হয় ১০৩৫ গ্রাম। ফলে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের মোট ভর হবে ১০৫৮ গ্রাম (তারকার সংখ্যা দিয়ে গুণ করে)। আমরা জানি, প্রতি এক গ্রাম পদার্থে ১০২৪ টি প্রোটন থাকে। এই সংখ্যা হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যার কাছাকাছি, কারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুতে একটিমাত্র প্রোটন থাকে। সংখ্যা দুটি গুণ আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা পাচ্ছি ১০৮২।**

**৩০ কোটি আলোকবর্ষের মতো দূরত্ব বিবেচনা করলে হিসাব করলে এই পরমাণুরা সুষমভাবে বন্টিত আছে। অর্থ্যাৎ, সব জায়গায় প্রায় সমান পরিমাণ পরমাণু আছে। তবে ছোট অঞ্চল বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ পরমাণুই আছে বিভিন্ন তারকার দখলে। তারকারা আছে আবার গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে, তারা আবার ছায়াপথ গুচ্ছে, তারা আবার সুপারক্লাস্টার বা আরো বড় গুচ্ছে সাজানো আছে।**

**সূত্র: ইউনিভাস টুডে, আ ব্রিফার হিস্টরি অব টাইম- স্টিফেন হকিং**

**ব্যর্থ তারকাদের গল্প**

**ব্যর্থ! ব্যর্থই যদি হবে, তার নাম আবার তারকাই কেন হবে?**

**আসলে না বলে উপায় নেই। এত বড় যে গ্রহ বলা যায় না। আবার স্বাভাবিক তারকাদের মতো আলো তৈরি করতে পারে না এরা। নাম বাদামী বামন (নৎড়হি ফধিৎভ)। তবে ডাক নাম হয়ে গেছে ব্যর্থ তারকা।**

**গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল পুঞ্জ সংকুচিত হয়ে জন্ম হয় একেকটি তারকার। তারকার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে এর কেন্দ্রের নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আলো, তাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাদামী বামন তারকাদের ভর (গধংং) এত বেশি নয় যে অভিকর্ষীয় চাপ নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া সংঘটিত করতে পারবে। আর এই ব্যর্থতাই তাদের কপালে ব্যর্থ তারকার তিলক পরিয়ে দিয়েছে।**

**অন্যান্য প্রধান ক্রমের তারকাদের মতই জীবন শুরু হয় বাদামী এই তারাদের। প্রধান ক্রমের তথা গধরহ ঝবয়ঁবহপব নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে অভিকর্ষীয় চাপে বস্তুপি-টি ভেতরের দিকে সংকুচিত হতে থাকে যতক্ষণ না এটি হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরির কারখানায় পরিণত হয়। কিন্তু বাদামী বামনের কখোনই সেই ধাপে পৌঁছতে পারে না। হাইড্রোজেন ফিউশন শুরু হবার আগেই সে পৌঁছে যায় স্থিতিশীল অবস্থায়।**

**বিভিন্ন ভর ও তাপমাত্রার বাদামী বামনদের দেখা মেলে। এদের ভর বৃহস্পতির ১৩ থেকে ৯০ গুণ বা সূর্যের প্রায় এক দশমাংশ পর্যন্ত হতে পারে। আমরা জানি তারকাদেরকে তাদের বর্ণালীর ভিত্তিতে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। গ জাতের তারকারা হল সফল তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে শীতল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেশিরভাগ এম তারকারাই লোহিত বামন হলেও কিছু আছে বাদামী বামন।**

**পরিচিত বামনদের মধ্যে ণ ফধিৎভং হচ্ছে সবচেয়ে শীতল। এদের কোনটার তাপমাত্রা বাসার উনুনের সমান, কোনটা আবার মানবদেহের সমান উষ্ণ। ফলে, এরা সামান্য আলো ও শক্তি বিকিরণ করে। ফলে, এদেরকে শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত এদের আলোচনা শুধু বই পুস্তকেই সীমিত ছিল, দেখা যায়নি চাক্ষুষ। সম্ভবত, এ কারণেই এদেরকে আগে কালো বামন (ইষধপশ উধিৎভং) বলে ডাকা হত। কিন্তু, এখন এই নামে ডাকা হয় শ্বেত বামনদের চূড়ান্ত দশাকে যখন তারা সবটুকু তাপ বিকিরিত করে ফেলে।**

**এতই যখন সমালোচনা, তখন বেচারারদের কেন গ্রহ বলা হয় না?**

**এদের এত অল্প ভরের কারণের এদের পরিচয়কে গ্রহের সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলার সুযোগ আছে। উপরন্তু, দিন দিন গ্যাসীয় দৈত্য জাতের গ্রহদের সংখ্যা বাড়ছে। একই সাথে এই তারকাগুলোতে ফিউশনের অভাবের ফলে, অনেকে তাদেরকে গ্রহ বলার সাহস দেখাতে পারেন।**

**গ্রহদের সাথে অন্যতম পার্থক্যটি হচ্ছে নিজস্ব আলো থাকা। গ্রহদের কিন্তু নিজের আলো নেই। তাহলে, সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা বা ভোরে শুকতারাসহ কত গ্রহই তো আলো দেয়? আরে ভাই! ওগুলোতো চাঁদের মতই সূর্যের আলোই প্রতিফলিত করে। বাদামী বামনের অতিরিক্ত শীতল হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত লাল এবং অবলোহিত আলো (ওহভৎধৎবফ) বিকিরণ করে। শীতল হয়ে গেলে দেয় এক্সরে এবং অবলোহিত আলো।**

**এরপরেও, গ্রহ এবং বাদামী বামনদের মাঝখানের সীমানা রেখা খুবই চিকন। কিছু বাদামী বামন ঠা-া হয়ে গ্যাস দানব গ্রহদের মত বায়ুম-ল তৈরি করেছে। বাদামী বামনদের চারদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহ থাকতে পারে, আর গ্রহদের থাকে উপগ্রহ। এখন পর্যন্ত জানা বৃহত্তম গ্রহ ওয়াসপ-১৭বি (ডঅঝচ-১৭ন) হচ্ছে। এর আকার বৃহস্পিতির দ্বিগুণ হলেও ভর প্রায় অর্ধেক। অন্য দিকে, সবচেয়ে ভারী গ্রহ হচ্ছে ডেনিস পি (উঊঘওঝ-চ)। এর ভর বৃহস্পতির ২৮ গুণেরও বেশি। ফলে, এই গ্রহ হয়ে পড়েছে বিতর্কিত। অনেকে একে দাবী করছেন বাদামী বামন বলে। তাহলে, গ্রহ এবং বাদামী বামন নক্ষত্রদের উপযুক্ত সীমারেখা কী?**

**মহাকাশের বস্তুপি-দের সংজ্ঞা দেবার দায়িত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহাকাশবিজ্ঞান সমিতির (ওহঃবৎহধঃরড়হধষ অংঃৎড়হড়সরপধষ টহরড়হ)। তাদের মতে যে বস্তুপি- ডিউটেরিয়াম (হাইড্রোজেনের ২ ভর বিশিষ্ট আইসোটপ) জ্বালাতে পারে, তাকে তারকা বলা যাবে। আর বৃহস্পতি গ্রহের ১৩ গুণ পর্যন্ত ভর বিশিষ্ট বস্তুকে বলা হবে গ্রহ (এটা গ্রহের সংজ্ঞা নয়, সীমানা)।**

**সূত্রঃ স্পেস ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া**

**মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় নক্ষত্র**

**নাম ট্যাবির নক্ষত্র। এ রকম রহস্যময় কোনো নক্ষত্রের সাথে জ্যোতির্বিদদের আগে কোনো রকম পরিচয় ছিল না। নক্ষত্রটি সময় সময় অস্বাভাবিক হারে উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে। এর পেছনে কেউ দায়ী করছেন বড়ো কোন গ্রহকে, কেউ বলছেন এক ঝাঁক ধূমকেতুর কথা। কেউ আবার এক ধাপ সামনে গিয়ে দোষ চাপাচ্ছেন এলিয়েনদের হাতে। সত্যিকারের ঘটনা এখনো এক রহস্য। ইদানিং নিয়মিত খবর হচ্ছে নক্ষত্রটি।**

**এর পেছনে আঠার মতো লেগে থাকা এবং বহুলভাবে প্রচার ও পর্যবেক্ষণ শুরু করতে ভূমিকায় রাখায় জ্যোতির্বিদি তাবেথা বয়াজিয়ানের নাম অনুসারে একে ট্যাবির নক্ষত্র (ঞধননু’ং ঝঃধৎ) বলে ডাকা হচ্ছে। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নক্ষত্রটির অদ্ভুত আচরণ নিয়ে কথা বলেন টেড টক- এ। অপূর্ব সেই লেকচারে তিনি কী বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ জেনে নিলেই অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে। চলুন, শুনে আসি।**

**“অসাধারণ দাবীর পক্ষে অসাধারণ প্রমাণ থাকতে হয়। একজন জ্যোতির্বিদ হিসেবে সর্বশেষ উপায় হিসেবে এলিয়েন তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়া আমার কাজ ও দায়িত্ব। এখন আমি এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলতে চাই। গল্পটির বিষবস্তুর হল নাসার অভিযান, কিছু সাধারণ মানুষ এবং আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে রহস্যময় নক্ষত্র।**

**২০০৯ সালে নাসার কেপলার মিশনের মাধ্যমে ঘটনার শুরু। কেপলারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সৌরজগতের বাইরে গ্রহের খোঁজ করা। মহাকাশের একটি বিশেষ দিকে১ নজর রেখে এটি তা করতে থাকে। এবং এই বিশেষ দিকটিতে এটি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নক্ষত্রের উপর অবিরত নজর রাখে। প্রতি ৩০ মিনিটে সংগ্রহ করতে থাকে তথ্য। এটি খোঁজ করছিল অতিক্রমণ (ঃৎধহংরঃ) নামক ঘটনাটির। আমাদের চোখের সামনে একটি গ্রহ যখন একটি নক্ষত্রের উপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়, তখন তাকে আমরা বলি গ্রহটির অতিক্রমণ। এটি ঘটার সময় নক্ষত্রের সামান্য পরিমাণ আলো বাধাপ্রাপ্ত হয়।**

**চিত্রঃ গ্রহদের অতিক্রমণের সময়ের প্রতিক্রিয়া**

**অতএব, নাসা কেপলারের সবগুলো উপাত্ত থেকে অতিক্রমণ খুঁজে বের করার জন্যে আধুনিক কম্পিউটার তৈরি করে। প্রথমবার উপাত্ত প্রকাশ করা হলে ইয়েল ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদদের মাথায় একটি মজার চিন্তা ঘুরপাক খায়। কেমন হবে যদি কম্পিউটার কিছু জিনিস মিস করে ফেলে?**

**ফলে আমরা একটি দলগত প্রকল্প হাতে নিলাম। ‘প্ল্যানেট হান্টারস’ বা ‘গ্রহ শিকারি’ নামের এই প্রোজেক্টের সবাই মেতে উঠলেন উপাত্ত নিয়ে। নকশা খুঁজে বের করার ব্যাপারে মানব মস্তিষ্কের ক্ষমতা অসাধারণ। অনেক সময় এই ক্ষমতার কাছে হার মানে কম্পিউটারও । কিন্তু এই প্রকল্পটি চারদিক থেকে সন্দেহের শিকার হয়। আমার সহকর্মী ও প্ল্যানেট হান্টারস প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা ডেবরা ফিশার বলেন, ঐ সময় লোকেরা বলছিল, ‘আপনারা উন্মাদ। কম্পিউটার কোনো সঙ্কেত মিস করবে- এটা একেবারে অসম্ভব।‘ ফলে মানুষের সাথে যন্ত্রের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। একটি গ্রহ পেয়ে গেলেও তা হবে দারুণ ব্যাপার। চার বছর আগে আমি যখন এই দলে যোগ দেই, তত দিনে একের বেশি পাওয়া হয়ে গেছে। আর আজকে তিন লাখ বিজ্ঞানপ্রেমীর সহায়তায় আমরা ডজন ডজন গ্রহ খুঁজে পেয়েছি। এরই একটি হল আমাদের ছায়াপথের সবচেয়ে রহস্যময় নক্ষত্র।**

**একটি গ্রহ যখন কোনো নক্ষত্রকে অতিক্রমণ করে, তখন নক্ষত্রের কিছু আলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অতিক্রমণের দৈর্ঘ্য থেকে বস্তুটির সাইজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বৃহস্পতির কথাই ধরুন। গ্রহরা বৃহস্পতির চেয়ে খুব একটা বড়ো হয় না। বৃহস্পতি কোনো নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা এক শতাংশ কমাতে পারবে। অন্য দিকে, পৃথিবী বৃহস্পতির চেয়ে এগারো গুণ ছোট। এত ছোট সঙ্কেত উপাত্তের মধ্যে চোখে পড়ে না বললেই চলে।**

**আমাদের রহস্যের কাছে ফিরে আসি। কয়েক বছর ধরে উপাত্তের ভেতর গ্রহ শিকারীরা অতিক্রমণের খোঁজ করছিলেন। তারা একটি নক্ষত্র থেকে রহস্যময় সঙ্কেত দেখতে পেলেন। নক্ষত্রটির নাম কেআইসি ৮৪৬২৮৫২। ২০০৯ সালের মে মাসে তারা একে প্রথম দেখেন। বিভিন্ন ফোরামে শুরু হয় আলাপ- আলোচনা।**

**তারা বললেন, বৃহস্পতির মতো কোনো বস্তু নক্ষত্রের আলোতে এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। তারা আরো বললেন, বস্তুটি অবশ্যই বিশাল হবে। সাধারণত একটি অতিক্রমণ কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়, কিন্তু এটি প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকল।**

**তারা আরো বললেন, গ্রহদের অতিক্রমণের সময় যেমন দেখা যায় তার সাথে এর মিল নেই। এটা দেখে মনে হল যে নক্ষত্রের আলো যে জিনিসে বাধা পাচ্ছে সেটা গ্রহদের মতো গোল নয়। এরপর আরো ক’বার এটা ঘটল। এরপর চুপচাপ থাকল কয়েক বছর।**

**এরপর ২০১১ সালের মার্চে আবার আমরা এটা দেখলাম। এবার নক্ষত্রের আলো একেবারে ১৫ শতাংশ ঢাকা পড়ে গেল। গ্রহদের তুলনায় এই পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশি, গ্রহরাতো মাত্র এক শতাংশ ঢেকে রাখতে পারে। এছাড়াও ঘটানাটি অপ্রতিসম। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত আলো- আঁধারির খেলা দেখিয়ে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়।**

**এরপর ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না। এরপর আবার ঘটতে থাকলে অদ্ভুত সব কা-। নক্ষত্রের আলো বাধা পড়তে লাগল। এটা এবার স্থায়ী হল প্রায় একশো দিন। তত দিনে কেপলার মিশনের সমাপ্তির দিন এসে গেছে। এবারের আলোর বাধাগুলো বিভিন্ন রূপ নিল। কোনোটা খুব তীক্ষ্ণ, কোনোটা আবার বেশ চওড়া। এদের স্থায়িত্বও আলাদা আলাদা। কোনোটি এক বা দুই দিন টিকে থাকল, কোনোটা টিকে থাকল এক সপ্তাহেরও বেশি। সব মিলিয়ে এবারে নক্ষত্রের আলোর বাধার পরিমাণ দাঁড়াল ২০ শতাংশের বেশি। এর অর্থ হল, নক্ষত্রটির আলোকে যেই ঢেকে রাখছে তার ক্ষেত্রফল আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ১০০০ গুণ বড়ো হবে।**

**এটা বড়ো একটি ঘটনা। অনুসন্ধানী দল এটা দেখার পর বিজ্ঞানীদের দেখালে তারা এতে উৎসাহী না হয়ে পারলেন না। বিজ্ঞানীরা প্রথমে এটা দেখে ভাবলেন, ‘এ আর এমন কী, নিশ্চয় উপাত্তে কোনো গ-গোল আছে’। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে দেখার পরেও উপাত্তে ভুল পাওয়া গেল না। ফলে মেনে নিতে হল, সত্যিই মহাকাশের কোনো কিছু নক্ষত্রের আলোকে ছড়াতে দিচ্ছে না। ফলে এ অবস্থায় নক্ষত্রটি সম্পর্কে আমরা সাধ্যমতো জানার চেষ্টা করলাম, যাতে কোনো সমাধান পাওয়া যায় কি না তা দেখা যায়। অনুসন্ধানী দলও লেগে রইল একই কাজে।**

**কেউ বললেন, এমনতো হতে পারে যে নক্ষত্রটি খুব নতুন এবং এটি যে ঘূর্ণায়মান মেঘ থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা এখনো এর চারপাশে বিদ্যমান আছে। অন্য কেউ বলল, নক্ষত্রটি থেকে ইতোমধ্যেই গ্রহের জন্ম হয়েছে এবং এরকম দুটি গ্রহের সংঘর্ষ হয়েছে, যেমনিভাবে পৃথিবী ও চাঁদ সৃষ্টির সময় সংঘর্ষ হয়েছিল। এই দুটি তত্ত্বই উপাত্তের কিছু অংশের ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু সমস্যা হল, নক্ষত্রটি যে নতুন- এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। নক্ষত্রটি নতুন হলে এর আলোর উত্তাপ পাওয়া যেকোনো বস্তু জ্বলে উঠত, আর যদি গ্রহদের সংঘর্ষ হত, তবে অনেক ধূলিকণা দেখা যেত।**

**এর ফলে আরেকজন বললেন, হতে পারে যে অনেকগুলো ধূমকেতুর সমাবেশ খুব বেশি বাঁকা কক্ষপথে নক্ষত্রটির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে যায়। এই তত্ত্বটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। এক্ষেত্রে আমাদের চোখের সামনে শত শত ধূমকেতু থাকতে হবে। এবং এরা হল শুধু তারাই যারা আমাদের ও নক্ষত্রটির মাঝে এসে পড়বে। ফলে প্রকৃত সংখ্যা হবে অযুত অযুত ধূমকেতু। তবে সবগুলো ধারণার মধ্যেই এটিই সেরা। ফলে আমরা এটা মেনে নিয়ে আমাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করলাম।**

**ঘটনা এখানেই শেষ নয়। আমি যখন গবেষণাপত্রটি লিখছিলাম সেই সময়েই আমার দেখা হল সহকর্মী জেসন রাইটের সাথে। সেও কেপলারের উপাত্ত নিয়ে একটি গবেষণাপত্র লিখছিল। ওর বক্তব্য হল, কেপলারের সূক্ষ্ম নজরের মাধ্যমে নক্ষত্রটির চারপাশে এলিয়েনদের স্থাপনা পাওয়া যাবে। কিন্তু পাওয়া গেল না। আমি তাকে আমাদের অনুসন্ধানী দলের পাওয়া অদ্ভুত তথ্যগুলো দেখালে ও বলল, ‘উফ, ট্যাবি। আমাকে আবার নতুন করে লিখতে হবে’।**

**তবে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা উৎসাহী হয়ে পড়লাম। আমরা পথ খুঁজতে লাগলাম কীভাবে এলিয়েন ব্যাখ্যা বাদ দেওয়া যায়। ফলে আমরা এসইটিআই (ঝবধৎপয ভড়ৎ ঊীঃৎধঃবৎৎবংঃৎরধষ ওহঃবষষরমবহপব) এর আমাদের একজন সহকর্মীকে এর দিকে মনোযোগ দিতে রাজি করালাম। গ্রিন ব্যাংক পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নক্ষত্রটিকে দেখার প্রস্তাব পেশ করলাম আমরা।**

**কয়েক মাস পর এই কথা চলে গেল প্রেসের কানে। শুধু এই একটি নক্ষত্র নিয়ে দশ হাজার নিবন্ধ লেখা হয়ে গেল।**

**এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, ট্যাবি, তাহলে কি এর পেছনে সত্যিই এলিয়েন দায়ী? আচ্ছা, এমন একটি সভ্যতার কথা কল্পনা করুন যারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। এই ক্ষেত্রে এরা নিজেদের গ্রহের সব শক্তি ব্যবহার করে শেষ করে ফেলবে। তাহলে এখন এরা শক্তি পাবে কোথায়? আমাদের সূর্যের মতো তাদের গ্রহও কিন্তু একটি নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। এখন তারা যদি এই নক্ষত্র থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে তবে শক্তির চাহিদা মিটে যায়। অতএব তারা বিশাল স্থাপনা তৈরি করবে। দৈত্যাকার সোলার প্যানেলের সাইজের এই বিশাল কাঠামোগুলোকে বলা হয় ডাইসন গোলক (উুংড়হ ঝঢ়যবৎব)।**

**চিত্রঃ ছবিতে শিল্পীদের উর্বর কল্পনায় ডাইসন বলয়ের নানান রকম চিত্র দেখা যাচ্ছে।**

**ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা যায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হল ১ মিলিয়নের (১০ লাখ) চার ভাগের এক ভাগ। আর সবচেয়ে সহজ হিসাব অনুসারে এই ডাইসন বলয়দের সাইজ এর ১০০ গুণ। এটা বেশ বড়ো বটে। এখন মনে করুন এমন কিছু একটা একটি নক্ষত্রকে ঘিরে আছে। এমন জিনিসের পক্ষে উপাত্তের মধ্যে ব্যতিক্রম ও অস্বাভাবিক কিছু নিয়ে আসা খুবই সম্ভব।**

**কিন্তু আবার মাথায় রাখতে হবে যে এলিয়েনদের এই বিশাল স্থাপনাকেও কিন্তু পদার্থবিদ্যার সূত্র মানতে হবে। যে কোনো কিছুই অনেক বেশি শক্তি ব্যবহার করতে চাইবে তাকে ফলশ্রুতিতে অনেক বেশি তাপ সৃষ্টি মেনে নিতেই হবে। কিন্তু এমন কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তবে আবার হতেই পারে যে বিকিরণ পৃথিবীর দিকে ঘটছে না।**

**আরেকটি ধারণাও আছে, আর এটি খুব প্রিয়ও বটে! আমরা হয়ত মহাকাশের একটি মহাযুদ্ধের সাক্ষী হয়েছি, যেখানে একটি গ্রহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অনেক ধূলিকণার সৃষ্টি হবার কথা। তবে আমরা যদি এলিয়েনদের অস্তিত্ব স্বীকার করেই নেই, তাহলে এটাই বা মেনে নিতে বাধা কোথায় যে তারা সব ধূলিকণা সাফ করে ফেলেছে!**

**চিত্রঃ নক্ষত্রের এলাকায় কোন মহাযুদ্ধ চলছে নাতো!**

**হুম! কল্পনার ঘোড়া বেশ দ্রুতবেগেই চলছে!**

**আসলে আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, যাতে আমাদের অজানা কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাও থাকতে পারে, আবার থাকতে পারে অজানা কোনো প্রক্রিয়ায় এলিয়েনের হাতও। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে অবশ্য আমি প্রাকৃতিকই ব্যাখ্যার পক্ষেই থাকব। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। এলিয়েন পেলে আমিও কারো চেয়ে কোন অংশে কম খুশি হব না। বাস্তবতা এ দুটোর যেটাই হোক, তা যে মজার হবে তাতে একদম সন্দেহ নেই।**

**এখন সামনে কী হবে? আমাদেরকে এর প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। তবে আমাদের মতো পেশাদার জ্যোতির্বিদদের হাতে হাতিয়ার কমই আছে। অন্য দিকে, কেপলার আছে অন্য একটি মিশনে।**

**তবে খুশির খবর হল, স্বেচ্ছাসেবীদের দলগত অনুসন্ধান থেমে নেই। নিজস্ব ব্যাকইয়ার্ড টেলিস্কোপ দিয়ে শখের জ্যোতির্বিদরা একে পর্যবেক্ষণ করছেন। কী ঘটবে তা চিন্তা করে আমি খুব পুলকিত বোধ করছি।**

**সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, কম্পিউটার কখনোই এই নক্ষত্রটিকে খুঁজে পেত না। এটিতো এমন কিছু খুঁজছিলই না। আমরা যদি এমন আরেকটি নক্ষত্র খুঁজে পাই তবে কেমন হবে? আর না পেলেই বা কেমন হবে?**

**[দর্শকের হাত তালির মাধ্যমে শেষ হয় টেড টকের আলোচনা]**

**সামনে কী ঘটতে পারে তা জ্যোতির্বিদ তাবেথা বয়াজিয়ান খুব উৎসুক ছিলেন। আলোচনাটি ছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। এত দিনে সত্যিই দারুণ আর কিছু ঘটনা ঘটেছে।**

**আগস্টের ৩ তারিখে দুজন জ্যোতির্বিদ আরো কিছু প্রমাণ যোগ করে দেখিয়েছেন যে নক্ষত্রটি আসলেই বড়ো অদ্ভুত। নাসার কেপলার স্পেইস টেলিস্কোপ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত নিয়ে বেনজামিন মনটেট ও জোশুয়া সাইমন তাদের গবেষণাপত্রও প্রকাশ করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে নক্ষত্রটি অস্বাভাবিক হারে উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে।**

**এ বছরের শুরুতে লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ ব্রেডলি শেফারও একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এখানে তিনি অতীতের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান যে গত এক শতাব্দী ধরেই নক্ষত্রটিতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী অনুজ্জ্বলতা প্রদর্শন করেছে। তাঁর মতে এর অর্থ হল, এলিয়েনরা বিশাল কোনো স্থাপনা গড়ে তুলছে।**

**তখন তাঁর কথাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া হলেও এখন সেটার পক্ষেই প্রমাণ শক্ত হল। এখন দেখা যাচ্ছে যে ২০০৯ সালের পর থেকে নক্ষত্রটির উজ্জ্বলতা ১০০০ দিনের জন্যে প্রায় ৩৪ শতাংশ কমে গেছে। এই হার শেফারের সময়ের হারের প্রায় দ্বিগুণ।**

**ফলে রহস্য ঘনীভূতই হচ্ছে। দেখা যাক, সামনে কী ঘটে?**

**নোট-১:**

**নক্ষত্রটি কোথায় আছে?**

**রাতের আকাশের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা বুঝতে পারবেন এটি আকাশের কোন দিকে আছে। এর অবস্থান হল আকাশের সিগনাস বা বকম-লীতে। পুরো আকাশের সার্বিক অঞ্চলকে যে ৮৮টি তারাম-লীতে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল সিগনাস। বর্তমান সময়ে এই ম-লীটি খুব সহজেই দেখা যায়। সন্ধ্যা নামলেই চলে আসে প্রায় মাথার উপরে। সেপ্টেম্বর মাসে রাত নয়টার দিকে তারাম-লিটি মাথার উপর থাকে। অক্টোবর, নভেম্বর মাসের দিকে থাকে পশ্চিম আকাশে।**

**এর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র ডেনেব বা পুচ্ছ কাছাকাছি অবস্থিত অপর দুটি নক্ষত্র- শ্রবণা ও অভিজিতের সাথে মিলে একটি ত্রিভুজ গঠন করেছে, যার নাম সামার ট্রায়াঙ্গেল। ম-লীর চারটি প্রধান উজ্জ্বল তারাকে নর্দার্ন ক্রস বলেও ডাকা হয়।**

**ম-লীর দুটো উজ্জ্বল তারা- ডেনেব ও ডেল্টা সিগনির প্রায় মাঝে আমাদের রহস্যময় তারাটি অবস্থিত। তবে একে খালি চোখে দেখা যাবে না। সর্বোচ্চ +৬ আপাত উজ্জ্বলতার নক্ষত্রকে খালি চোখে দেখা যায়। এর আপাত উজ্জ্বলতা হল +১১.৭। উল্লেখ্য, আপাত উজ্জ্বলতার মান বেশি হলে বুঝতে হবে নক্ষত্রটি তত কম উজ্জ্বল। সূর্যের আপাত উজ্জ্বলতা হল নেগেটিভ ২৭, চাঁদের নেগেটিভ ১২, শুক্র গ্রহের নেগেটিভ ৪ ইত্যাদি। ফলে একখান ভালো মানের টেলিস্কোপ যোগাড় করতে পারলে নক্ষত্রটির পেছনে আপনিও নজরদারী চালাতে পারেন।**

**সূত্রঃ আর্থস্কাই ডট অরগ, টেড ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া (কেআইসি ৮৪৬২৮৫২)**

**মহাবিশে^র ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র**

**গ্রহদের তুলনায় নক্ষত্ররা কত বড় হতে পারে? তুলনাটাই হাস্যকর। কারণ, সাইজ এবং ভর-দুদিক থেকেই গ্রহরা তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট। সূর্যের কথাই ধরা যাক। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটি একাই সৌরজগতের ৯৯.৮৬ ভাগ ভর দখল করে আছে। এর নিজের ভর পৃথিবীর ভরের তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ। আর সাইজ? সেটাও বিম্মময়কর। এক পাশ থেকে অপর পাশের দূরত্ব, মানে ব্যাস হলো ৮৬৪,৪০০ মাইল। এটা পৃথিবীর ব্যাসের একশ নয় গুণ। মানে, একশ নয়টি পৃথিবীকে একটার পর একটা বসিয়ে রাখলে তবেই সূর্যের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত দূরত্বের সমান পূরণ হবে। আর যদি সূর্যের পেটের ভেতরে পৃথিবীকে বসিয়ে রাখতে মন চায়, তবে ১৩ লক্ষ পৃথিবীকে সেখানটায় ঠাঁই দেওয়া যাবে! সূর্য আর পৃথিবী দুটোই যথাক্রমে মোটামুটি গড় সাইজ ও ভরের নক্ষত্র ও গ্রহ। তাই এদের তুলনা থেকে গ্রহ ও নক্ষত্রের বিশাল পার্থক্যের একটি মাপকাঠি মেলে। অবশ্য জীবনের শেষ দিকে নক্ষত্রদের সাইজ ছোট হয়ে আসে। তবে ভর গ্রহদের তুলনায় অনেক অনেক বেশিই থাকে।**

**কিন্তু জগতে তো আর ব্যতিক্রমের অভাব নেই। নাহলে আর শনির চেয়ে সামান্য বড় নক্ষত্র আবিষ্কৃত হবে কেন। নক্ষত্রটি ছোটই শুধু নয়, এ পর্যন্ত আবিষ্কিৃত মহাবিশে^র সবচেয়ে ছোট নক্ষত্র। গত জুলাই মাসে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে এর আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়। তারাটি একটি জোড় পরিবারের সদস্য। ঘুরছে অন্য একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। সেটা অবশ্য অনেক বড়। গবেষকরা বলছেন, এটি এতই ছোট নক্ষত্র যে এর চেয়ে ছোট নক্ষত্র আর হতেই পারে না। নামটাও বেশ খটমটে। ইবিএলএম জে০৫৫৫-৫৭এবি। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৬০০ আলোকবর্ষ। ভর সূর্যের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ কম।**

**যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ^বিদ্যালয়ের গবেষক অ্যালেকজান্ডার বোটিচার বলেন, ’আমাদের আবিষ্কার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নক্ষত্ররা কতটা ছোটও হতে পারে। এটি যদি আর সামান্যটুকু কম ভর নিয়ে জন্ম নিত, তবে এর অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন ফিউশন (সংযোজন) বিক্রিয়া শুরুই হত না। সেক্ষেত্রে এটি হত একটি বাদামি তারা।’ বাদামি তারাদেরকে বলা হয় ব্যর্থ তারা। কারণ, এরা সাধারণ তারার মতো হাইড্রোজেন ফিউশন ঘটাতে পারে না। অথচ, এ বিক্রিয়াই হলো প্রায় সব তারাদের আলো দেওয়ার মাধ্যম। কিন্তু ইবিএলএম সে যাত্রায় অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে।**

**তবে নক্ষত্রের মর্যাদা পেলে কী হবে, এটি দারুণ অনুজ্জ্বল। আমাদের সূর্যের চেয়ে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার গুণ অনুজ্জ্বল। বড় একটি উজ্জ্বল ও বড় তারার সঙ্গী হিসেবে অনুজ্জ্বল তারাটিকে খুঁজে পাওয়াটাও ছিল বিস্ময়কর। গবেষণা দলের আরেক সদস্য অ্যামোরি ট্রিয়োডের মতে, এটা হলো অনেকটা একটা লাইটহাউসের পাশে একটি মোমবাতিকে খুঁজে পাওয়ার মতো। আসলে নক্ষত্র খুঁজতে গিয়ে পাওয়া যায়ওনি একে। গ্রহ খোঁজার অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো ট্রানজিট বা অতিক্রমন। কক্ষপথে চলতে চলতে একটি গ্রহ পৃথিবী থেকে দেখতে সঙ্গী নক্ষত্রের সামনে চলে আসে তখন কিছু আলো ঢাকা পড়ে নক্ষত্রের। গ্রহ জানান দেয় তার অস্তিত্ব। অনুজ্জ¦ল হওয়ার দরুণ, গ্রহ খোঁজার এই পদ্ধতিতেই ধরা পড়ল নক্ষত্রটি। এর আসল পরিচয় জানতেও তাই কিছুটা সময় লেগে গিয়েছিল। এবং সেটা জানা গিয়েছিল কেবল এর ভর পরিমাপ করতে পারার পরই।**

**এটি আকারে বৃহস্পতির চেয়েও ছোট। ব্যাসার্ধ বৃহস্পতির প্রায় ৮৪ ভাগ। তবে সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ শনির চেয়ে খানিকটা বড়। ভর কিন্তু বৃহস্পতির চেয়ে বেশি। প্রায় ৮৫ গুণ। তা না হলে যে এটি নক্ষত্রই হত না!**

**তবে এ ধরনের নক্ষত্ররা এক দিক থেকে খুব ভালো। এর মতো ছোট, অনুজ্জ্বল ও কম উত্তপ্ত নক্ষত্রদের চারপাশে প্রদক্ষিণরত থাকতে পারে বাসযোগ্য গ্রহ। কারণ, এ অবস্থায় পানির উপ¯ি’তির সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।**

**সূত্র: ক্যালটেক ডট এজু, পপুলার মেকানিক্স**

**আমার ল্যাপটপ অন কেন?**

**প্রশ্নটার উত্তর সোজাসুজি চিন্তা না করে চলুন, খেলার মাঠ থেকে একটা চার বছরের বাচ্চাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে আসি। কেন? কারণ, এখন প্রশ্নটার উত্তর দেবার সময় যখনই আমি মনে করব উত্তর যথেষ্ট হয়েছে, তখনই ও আবার প্রশ্ন করবে, 'কেন?'**

**চার বছরের বাচ্চারা এমনইতো করবে। এর ফলে আমরা প্রশ্নটার সঠিক উত্তর পাবো আশা করি। তার নাম দিলাম বল্টু। সবাই ওকে হাই বলুন!**

**অতএব, প্রশ্নটার উত্তরে প্রথমেই বললাম, 'কারণ, আমি ল্যাপটপটা চালু করেছি।'**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ ভালো প্রশ্ন করেছো, বল্টু। আমি এটা চালু করেছি যাতে আমি লেখাটা লিখতে পারি। আর আসলে সত্য কথা হল, আমার ল্যাপটপ সব সময় চালুই থাকে। আমি একে কখনো শাট ডাউন দেই না।**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ কারণ আধুনিক ল্যাপটপগুলোকে বন্ধ করতে হয় না। আর আমি এমনিতেই বন্ধ করি না, এটা আমার অলসতা এবং ল্যাপটপের প্রতি ভালোবাসা।**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ আমি আসলে একটু খামখেয়ালী মানুষ, এলোমেলোভাবে চলিতো। কোনো কিছু গোছগাছ করে রাখি না।**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ কারণ আমি এখনো বড়োদের মতো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইনি।**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ আমার বয়স এখনো খুব বেশি হয়নি, ২৫ ও ক্রস করেনি।**

**আরে! হচ্ছেটা কী? আমরাতো প্রশ্নটা থেকে সরে যাচ্ছি। এমনতো হবার কথা ছিল না। বল্টু ঠিকভাবে প্রশ্ন করছে না। দেখো, বল্টু, তোমাকে শুধু 'কেন?' 'কেন?' করার জন্যে নিয়ে আসিনি। তোমাকে সঠিক প্রশ্ন করে ব্যাপারটার গভীরে যেতে হবে।**

**বল্টুঃ কেন?**

**আমিঃ কারণ আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে তোমাকে আনিনি। আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি পাঠকদেরকে জানাতে হবে।**

**বল্টুঃ কেন?**

**না, হচ্ছে না। বল্টুকে দিয়ে হবে না। বল্টুকে মায়ের কোলে রেখে এসে আমরা বরং ছয় বছরের আরেকটি বল্টু নিয়ে আসি। চার বছরের বাচ্চারা কেমন হয়, ভুলে বসে আছি। আবার শুরু করি।**

**আমিঃ ল্যাপটপ চালু আছে কারণ এতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।**

**বল্টুঃ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কেন?**

**আমিঃ কারণ এটা পাওয়ার কর্ডের সাথে যুক্ত আছে, যেটি আবার ওয়াল সকেটের সাথে যুক্ত।**

**বল্টুঃ ওয়ালের সকেটে বিদ্যুৎ এল কীভাবে?**

**আমিঃ কারণ এটা ঢাকা শহরের ইলেকট্রিক গ্রিডের সাথে যুক্ত আছে।**

**বল্টুঃ ঢাকা শহরের গ্রিডে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে?**

**হুম! ছয় বছরের বল্টুকে দিয়ে কাজ হচ্ছে। এবার তাহলে আমাদেরকে জেনে আসতে হবে মানুষ কীভাবে ইতিহাসের পরিক্রমায় বিদ্যুৎ শক্তিকে হাত করতে পারল। এই ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে।**

**১। অনেক অনেক প্রাচীন যুগে শক্তির ব্যবহার- যখন হাত দিয়ে কষ্ট করে সব কাজ করাব হত।**

**প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা আসলেই জানত না যে কীভাবে খুব সহজে কোনো কাজ করে ফেলা যায়।**

**২। কিছুটা প্রাচীন যুগ- যখন মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করা শিখল।**

**একটা সময় এসে মানুষ বুঝতে পারল যে তারা প্রকৃতির কিছু শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজেদের কষ্ট অনেক কমিয়ে আনতে পারে। এর অন্যতম আদিম উদাহরণ হল আগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন। এটা ঘটেছিল ১ লাখ ২৫ হাজার বছর থেকে ৪ লাখ বছর আগে (একেকজন একেক উত্তর দেবে এর)।**

**ইদানিং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ৫ হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ বায়ুকল, বাঁধ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তি থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে স্টিম ইঞ্জিনের মতো অতি আধুনিক (তুলনামূলক) প্রযুক্তির সাহায্যে নৌযান ও লোকোমোটিভ চালনা শুরু হয়।**

**এগুলো হল প্রাকৃতিক শক্তির সরাসরি ব্যবহার। এদের অসুবিধা ছিল, এদেরকে ব্যবহার করতে হত এর উৎপাদনের স্থান এবং সময়েই। যেমন আগের দিনের বায়ুকল ঘুরত এবং এই ঘূর্ণন বলকে দিয়ে পানি ওঠানো বা শস্য মাড়াইয়ের কাজে লাগানো হত। এমন জিনিসের ব্যবহার কিন্তু আজো ফুরিয়ে যায়নি। একবার ব্ল্যাকআউটের কথাই চিন্তা করুন। আপনার চুলা ও এর উত্তাপ, টয়লেট (যেখানে ফ্ল্যাশ করার জন্যে কাজে লাগে অভিকর্ষ), কাঠের আগুন বা মোমবাতি বা গাড়ি- সবকিছুই প্রকৃতি থেকে সরাসরি শক্তি নিচ্ছে, মাঝে আর কিছু নেই।**

**৩। আধুনিক যুগে শক্তি উৎপাদন- বড়ো মাপে এবং পরোক্ষভাবে।**

**১০০ আগে বছর মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শিখলে বিশ্বে এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ইলেকট্রিক গ্রিডের মাধ্যমে শক্তির সরবরাহ ছড়িয়ে পড়ল দূর দূরান্তে। মানুষের ইতিহাসে হয়ত এটাই সবচেয়ে বড়ো একক মাইলফলক।**

**শিল্পের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত করা, একে বিদ্যুতে পরিণত করা, দূরে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পরে আবার সুবিধামতো যে কোনো শক্তিতে রূপান্তর করা সহজ হয়ে গেল। দেশের এক প্রান্তের উত্তপ্ত কয়লা আরেক প্রান্তের হিমাগারকে শীতল রাখছে। আধুনিক উইন্ডমিল শুধু পানি তুলতে বা শস্য ভাঙতেই কাজে লাগছে না, এ থেকে বিদ্যুতও পাওয়া যাচ্ছে, যা দিয়ে করা যাচ্ছে প্রায় সব কিছু।**

**আমার যে ল্যাপটপ চলছে, হতে পারে এর বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া গেছে কয়লা পুড়িয়ে, পরমাণু ভেঙে অথবা বাতাস বা নদীর পানির প্রবাহ থেকে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এ শক্তিগুলো সবাই আমার কাছে এসে এক হয়ে যায়- আমি যখনই প্লাগ যুক্ত করি, পাই বিদ্যুৎ।**

**এই দিক থেকে বলা যায় যে, দামের জগতে টাকার যে ভূমিকা, শক্তির জগতে বিদ্যুতের ভূমিকা তাই।**

**অতএব, এ কারণেই ঢাকাসহ বিশ্বের বড়ো বড়ো প্রায় সব শহরেই ইলেকট্রিক গ্রিড আছে।**

**বল্টুঃ ইলেকট্রিক গ্রিডে বিদ্যুৎ আছে কেন?**

**আমিঃ কারণ ওটা পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে যুক্ত আছে, যা গ্রিডে বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছে।**

**বল্টুঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎ বানায় কীভাবে?**

**হুম, এখন শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি আউড়াতে হবে। এটি হল যে, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, বরং এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায়। এর অর্থ হল, মানুষ শক্তি তৈরি করতে পারে না, তারা শক্তির প্রচলিত রূপকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারে। অতএব, বিদ্যুৎ তৈরির একমাত্র উপায় হল শক্তির প্রচলিত কোনো উৎসকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা।**

**সাধারণত যে কয়ভাবে পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করে তা হলঃ**

**১। এক ধরনের নবায়নযোগ্য এনার্জি প্ল্যান্ট (জলবিদ্যুৎ (ঐুফৎড়বষবপঃৎরপ), বায়ু বা সৌর)। এ থেকে বিদ্যুতের সামান্য অংশই পাওয়া যায়। আমেরিকায় ১১% বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এটি থেকে।**

**২। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। এ থেকে পুরো বিশ্বের ২.৮ % বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। অবশ্য আমেরিকায় এর ব্যবহার তুলনামূলক অনেক বেশি- ২১%।**

**৩। বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় ৮০% ই পাওয়া যায় ফসিল ফিউল বা জীবাশ্ম জ্বালানি- কয়লা, গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি থেকে।**

**এ কারণে, গাণিতিক সম্ভাবনার কথা বললে আমি বলব যে, আমার ল্যাপটপ চালু আছে হয়ত কোনো জীবাশ জ্বালানির কারণে। আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা। আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, হয়ত ফসিল ফিউল প্ল্যান্টের কল্যাণেই চলছে আপনার ল্যাপটপ।**

**বল্টুঃ জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফিউল প্ল্যান্ট কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করে?**

**এটা করা হয় জীবাশ্ম জ্বালনি পুড়িয়ে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অবশ্য কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাসই শুধু কাজে লাগানো হয়। তেল দরকার হয় পরিবহনের কাজে। পাওয়ার প্ল্যান্টে কয়লা বা গ্যাস পুড়িয়ে বিপুল পরিমাণ পানিকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর ফুটন্ত বাষ্পকে পাঠানো হয় টারবাইনে (বড়ো প্রপেলার), যার ফলে এটি ঘুরতে থাকে। টারবাইনটি তামার তার দ্বারা প্যাঁচানো থাকে এবং একে ঘিরে থাকে চুম্বক। টারবাইন ঘোরার সময় তামার কু-লীও ঘুরতে থাকে। এর ফলে বিদ্যুতের স্রোত তার বেয়ে প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসে। পোঁছে যায় শহরের ইলেকট্রিক গ্রিডে।**

**অতএব, কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার ল্যাপটপ চালু করা হয়েছে।**

**বল্টুঃ তুমি না বললে, শক্তি তৈরি করা যায় না, শুধু রূপান্তর করা যায়- তাহলে কয়লাকে পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া গেল তা কোথেকে এল?**

**বাবুটাতো ভালোই ভোগান্তি দিচ্ছে। ফলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, জীবাশ্ম জ্বালানি (ঋড়ংংরষ ভঁবষ) আসলে কী?**

**জীবাশ্ম জ্বালানি হল ত্রিশ থেকে ছত্রিশ বছর আগের কার্বোনিফেরাস যুগের গাছের ধ্বংসাবশেষ, যে সময় ডাইনোসরদেরও অস্তিত্ব ছিল না। অধিকাংশ গাছই মারা যাবার পরপরই পচে ও ক্ষয় হয়ে গিয়ে এদের ভেতরের শক্তি নির্গত করে দেয়। কার্বোনিফেরাস যুগের অধিকাংশ গাছ, শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জীব জলাশয়ে বা সমুদ্রে মারা গিয়েছিল। এরপর এরা তলায় পৌঁছে গিয়ে বালু, কাদা ও অন্যান্য জিনিসের নিচে চাপা পড়ে যায়। এ সময়জুড়ে এরা নিজেদের সাথে বহন করতে থাকে শক্তি। বছরের পর বছর ধরে এই মৃত জিনিসের উপর আরো বেশি বেশি কাদা, বালি, পাথর ইত্যাদি জমতে জমতে তীব্র চাপে এরা গ্যাস, কয়লা ও তেলে পরিণত হয়। যেই শক্তি নিয়ে সেই গাছগুলো মারা গিয়েছিল তা আজো বিদ্যমান রয়েছে- শুধু এর রূপ এখন জীবাশ্ম জ্বালানি রূপে রাসায়নিক শক্তি।**

**অতএব, সবকিছুর মূলে আছে সেই সময়ের সেই গাছগুলো যা থেকে চলছে বর্তমানের পাওয়ার প্ল্যান্ট।**

**বল্টুঃ কিন্তু শক্তি বা এনার্জি আসল কোথা থেকে? সেই প্রাচীন গাছগুলোই বা শক্তি পেলো কোথায়?**

**ঠিক যেভাবে বর্তমানে গাছে শক্তি প্রবেশ করে- সালোকসংশ্লেষণ। ব্যাপারটা খুবই সহজ।**

**সূর্যের আলো গাছের মধ্যে প্রবেশ করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ভেঙে ফেলে। এর ফলে কার্বন ভেতরে থেকে গিয়ে পদার্থ তৈরি করে এবং অক্সিজেন উপজাত আকারে বেরিয়ে আসে। অণুর এই ভাঙনের সময় গাছ সূর্য থেকে রাসায়নিক শক্তি গ্রহণ করে। এটা গাছের মধ্যেই থেকে যায়। আমরা গাছের গুড়ি পোড়ানোর সময় এই প্রক্রিয়াকেই উল্টো দিকে পরিচালিত করে দেই মাত্র। অক্সিজেন ও কার্বন জায়গা বদল করে। ভেতরের সঞ্চিত সৌরশক্তি আগুনের আকারে বের হয়ে পড়ে। আগুন হল সূর্যের আলো ও উত্তাপ, যা কাঠ থেকে নির্গত হবার আগে বহু দিন যাবত এর মধ্যে সঞ্চিত ছিল।**

**জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর সময় ঠিক এটিই ঘটে। তবে গাছের বদলে জীবাশ্ম জ্বালানিতে সঞ্চিত সৌরশক্তির বয়স ৩০ কোটি বছর হয়ে গেছে। ফলে এ থেকে প্রাপ্ত শক্তিও ত্রিশ কোটি বছরের পুরনো।**

**অতএব, আমার ল্যাপটপ চলছে ত্রিশ কোটি বছরের পুরনো সৌরশক্তি দিয়ে।**

**বল্টুঃ আচ্ছা বুঝলাম, প্রাচীন সূর্য থেকে এই শক্তি এসেছে। কিন্তু সেই শক্তিটা আসল কোথা থেকে?**

**সূর্যের শক্তি আসলে এর কেন্দ্রে চলমান ফিউসান বিক্রিয়ার ফসল। এ পক্রিয়ায় তীব্র চাপের প্রভাবে পরমাণু জোড়া লেগে একটি একক পরমাণু গঠিত হয়। পরিণামে বিমুক্ত হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি। এটা হল নিউক্লিয়ার ফিসান (ভাঙন) বিক্রিয়ার বিপরীত, যেখানে বড়ো পরিমাণু ভেঙে যায় (নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এভাবে কাজ করে)।**

**জিনিসটা ঘটে এভাবেঃ**

**অতএব, নিউক্লিয়ার ফিউসান বিক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তির ফলে সূর্যের কেন্দ্রম-ল থেকে ফোটন (আলোক কণা) বেরিয়ে আসে। এই ফোটন সূর্যের পৃষ্ঠে পৌঁছতে এক লক্ষ বছর লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তারপর পৃথিবীতে আসতে আর মাত্র আট মিনিট লাগে। এর পরেই গাছ সেটা পায়।**

**বল্টুঃ আচ্ছা, সেই শক্তি- মানে নিউক্লিয়ার ফিউসান- ওটা এল কোথা থেকে?**

**সূর্যের কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হবার কারণ হচ্ছে এর তীব্র মহাকর্ষ চাপ।**

**বল্টুঃ মহাকর্ষটা আবার কী?**

**বল্টু, তুমি এখনো অনেক ছোট। মহাকর্ষ হল বক্র স্থান- কাল। এ বক্রতা তৈরি হয় বস্তুর উপস্থিতিতে। আর সূর্যের মতো বিশাল বস্তুর ক্ষেত্রে এই বক্রতার পরিমাণও বিশাল।**

**অতএব, ল্যাপটপের পাওয়ার সরবরাহের পেছনে একটি সত্যিকারের উৎস আছে। এটা হল সূর্যের দ্বারা সৃষ্ট স্থান- কালের তীব্র বক্রতা। এর কারণে শুরু হয় নিউক্লিয়ার ফিউসান এবং তার এক লক্ষ বছর পরে গাছ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সেই শক্তি গ্রহণ করে। সেই শক্তি এরপর মৃত গাছের মধ্যে অবস্থান করে ধীরে ধীরে কয়লার মতো জীবাশ্মে পরিণত হয়। এই কয়লা ৩০ কোটি বছর পরে কোল মাইনাররা বের করে আনে, বয়ে নিয়ে আসা হয় পাওয়ার প্ল্যান্টে। একে পুড়িয়ে প্রাচীন সূর্যের মতোই আলো ও উত্তাপ পাওয়া যায়। এই উত্তাপ কাজে লাগিয়ে পানিকে গরম করা হয়, যা তখন স্টিম বা বাষ্পে পরিণত হয়। এটি জেনারেটরের ভেতরে থাকা টারবাইনকে ঘোরায়। এর ফলে শক্তি বের হয়ে বিদ্যুৎ আকারে চলে আসে ইলেকট্রিক গ্রিডে। এটাই পরে লাইন বেয়ে চলে আসে আমার বাসার ওয়ালে। পাওয়ার কর্ড ল্যাপটপে লাগানোর সাথে সাথে এটি চালু হবার শক্তি পায়।**

**তবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সূর্যের প্রাচীন মহাকর্ষের এই প্রভাব নন-ইলেকট্রিক এনার্জির ক্ষেত্রেও বলা চলে। গাড়ির হুডের নিচেও অবস্থান করছে একটি মিনি পাওয়ার প্ল্যান্ট। এটি তেল থেকে আসা গ্যাসোলিন পুড়িয়ে প্রাচীন সেই শক্তিতে ফিরিয়ে আনছে। এমনকি একটি মোমবাতি বা শক্তির যে কোনো রূপের ক্ষেত্রেই এটি ঘটছে।**

**একই ঘটনা চলছে আমাদের দেহেও। আমি এটি লিখতে পারছি কেন? কারণ আমার বডিতে আমার খাওয়া খাবারের শক্তি আছে। এই শক্তি আগে ছিল উদ্ভিদ বা প্রাণীতে, যার ফলে আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি সেই সালোকসংশ্লেষণে। তবে এই ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ নতুন। এর অর্থ হল, আমার আঙ্গুলের পাওয়া সূর্যের আলো খুব নতুন, সূর্যের কেন্দ্র থেকে আসতে সময়টুকুর কথা বাদ দিলে। যে মহাকর্ষের ফলে সেই ফিউসান শুরু হয়েছিল, তা কিন্তু এক লক্ষ বছরেরই পুরনো।**

**তো, বল্টু, বুঝলেতো?**

**বল্টুঃ বুঝলাম। কিন্তু দাঁড়াও, বস্তুর কারণে স্থান- কালে টোল পড়ে কেন?**

**এই রে, সেরেছে! এই ছোকরার হাত থেকে কীভাবে বাঁচি! ঐ চার বছরের বাচ্চাইতো ভালো ছিল।**

**সূত্র: ওয়েইট বাট হোয়াই ডট কম অবলম্বনে**

**শেষ হয়ে যাচ্ছে সূর্য?**

**এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না। প্রতি মুহূর্তে সত্যিই কমছে সূর্যের ভর। তাও অল্পস্বল্প করে নয়। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে প্রায় ৫৮ লক্ষ টন পদার্থ। কীভাবে ঘটছে এই আশ্চর্য ঘটনা? আর এর ফলে কি তাহলে গ্রহদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে না? চলুন জেনে নিই।**

**সূর্য ভর হারাচ্ছে মূলত দুটি উপায়ে। প্রথমটি হল ফিউশন। আমরা জানি, পৃথিবীতে বসে আমরা যে আলো ও তাপ পাই তা আসে সূর্য থেকে। সূর্যে আছে প্রায় ৭৩ শতাংশ হাইড্রোজেন ও ২৫ শতাংশ হিলিয়াম। এই হাইড্রোজেন ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অনবরত হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমেই তৈরি হয় আলো। পাশাপাশি অবশ্য নির্গত হয় কিছু নিউট্রিনোও। প্রতি বার হিলিয়াম তৈরির সময় একটি করে নতুন হাইড্রোজেনও তৈরি হয়, যা বিক্রিয়াটিকে অবিরত চালিয়ে নেয়। প্রতি মূহূর্তে সূর্য কী পরিমাণ ভর হারাচ্ছে তা আমরা সূর্যের দীপ্তি (ষঁসরহড়ংরঃু) থেকে সহজেই বের করতে পারি। একটি নক্ষত্র প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করে, তাকেই বলা হয় এর দীপ্তি।**

**হিসাবটি করার জন্যে আমাদের কাজে আসবে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সূত্রটি। ঊ=সপ২। সূত্রটি আমাদের বলছে, ভর ও শক্তি আসলে একই জিনিসের ভিন্ন রূপ মাত্র। এখানে হল ঊ শক্তি, স হল ভর এবং প হল আলোর বেগ। যদিও সূর্য তাপ ও আলো আকারে শক্তি নির্গত করছে, সেই শক্তির উৎস কিন্তু পদার্থই। ফলে শক্তি নির্গত করা মানেই আসলে ভর হারানো।**

**তাহলে দেখা যাক, সূর্য এভাবে ঠিক কী পরিমাণ পদার্থ হারাচ্ছে। আমরা জানি সূর্যের দীপ্তি হল প্রতি সেকেন্ডে ৩.৮২ দ্ধ ১০২৬ জুল (৩৮২ লিখে ২৪ টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা হবে)। অন্য কথায় বলা যায় সূর্যের ক্ষমতা হল ৩.৮২ দ্ধ ১০২৬ ওয়াট। আবার, আলোর বেগ হল সেকেন্ডে ৩ দ্ধ ১০৮ মিটার। অতএব প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ পদার্থ (স) খরচ হয়, সেটা জানতে হলে আমাদেরকে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ভাগ করে আমরা পাই:**

**৪.২৮৯ দ্ধ ১০৯ কেজি, যা প্রায় ৪৩ লক্ষ টনের সমপরিমাণ!**

**এক বছরে এই খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টন। নিশ্চয় ভাবছেন, এভাবে ভর হারাতে থাকলে কি অচিরেই সূর্যের সমস্ত পদার্থ শেষ হয়ে যাবে? না, কাজটি অত সহজ নয়। সূর্যের মোট ভর হল ২দ্ধ১০৩০ কেজি। সৌররজগতের সব পদার্থের প্রায় ৯৮.৮৬ ভাগই আছে সূর্যের একার কাছে। সূর্য যদি আজীবন ভর হারাতে থাকে, তবু এর সবটুকু ভর ফুরিয়ে যেতে সময় লাগবে প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি বছর। বাস্তবতা হল তার অনেক আগেই সূর্যের ফিউশন বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সূর্যের যাবতীয় হাইড্রোজেন জ্বালানি।**

**তবে সূর্য কিন্তু আরেকটি উপায়েও ভর হারাচ্ছে। এটি হল সৌর বায়ু (ংড়ষধৎ রিহফ)। আমরা জানি সূর্যের পৃৃষ্ঠ প্রচ- উত্তপ্ত। কেন্দ্রের তুলনায় পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনেক কম হলেও এই কম তাপমাত্রাই হল ৫৫০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় ইলেকট্রন ও প্রোটনরা ¯ি’র হয়ে বসে থাকতে পারে না। আয়নিত কণা হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তে। এটাই হল সৌর বায়ু। এই বায়ু যখন পৃথিবীর বহিঃ¯’ বায়ুম-লে পৌঁছে, তখনই তৈরি হয় অরোরা। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর আকাশে আমরা নীল আলোর যে নাচন দেখি, তা এই অরোরারই কাজ।**

**সৌর বায়ুর মাধ্যমে সব সময় অবশ্য সমান পরিমাণ পদার্থ নির্গত হয় না। তবে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জানি, সূর্য প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ১৫ লক্ষ টন পদার্থ হারিয়ে ফেলছে।**

**দুটো যোগ করে আমরা বলতে পারি, সূর্য প্রতি সেকেন্ডে পদার্থ হারাচ্ছে প্রায় ৫৮ লক্ষ টন। তার মানে প্রতি বছরে ১৭৪ ট্রিলিয়ন টন। অনেক বেশি মনে হচ্ছে, তাই না? আগেই কিন্তু আমরা ইংগিত পেয়েছি, এটুকু পদার্থও সূর্যের মোট ভরের তুলনায় কিছুই না। আসলে ৫০০ কোটি বছর পর সূর্য যখন ভর হারানো বন্ধ করবে, তখন পর্যন্ত এর মাত্র ০.০৩৪ শতাংশ ভর শেষ হবে। বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির ভর সূর্যের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। সে সময় পর্যন্ত সূর্য বৃহস্পতির ০. ০৮ শতাংশ ভর শেষ করতে সক্ষম হবে, যা প্রায় পৃথিবীর ভরের সমান।**

**আরেকটি প্রশ্ন হল, সূর্যের এই ভর হারানোর ফলে কি গ্রহদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে? সূর্যের আকর্ষণেইতো গ্রহরা এর চারদিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। উত্তর হল, হ্যাঁ, এর ফলে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহদের কক্ষপথে কিছুটা প্রভাব অবশ্যই পড়ছে। ভর হারোনর ফলে গ্রহদের ওপর এর মহাকর্ষের টান কমে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী সত্যিই সূর্য থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতি বছরে দূরত্ব বাড়ছে ১ দশমিক ৬ সেন্টিমিটার করে। এভাবে সরতে থাকলে ৫০০ কোটি বছর পরে পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৭ হাজার মাইল দূরে সরবে। এটা এমন কিছু নয়। তাই আপাতত ভয়েরও কিছু নেই।**

**সূত্র: সোলার সেন্টার ডট কম, ব্রায়ানকোবারলিন ডট কম, অ্যাস্ট্রোনমি ক্যাফে ও উইকপিডিয়া।**

**মিল্কিওয়ের নিকটতম গ্যালাক্সি**

**কেন্দ্রস্থলে সূর্য, অন্যান্য গ্রহ, কিছু বামন গ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সৌর পরিবারের বাস মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে ।। মহাবিশ্বে গ্যলাক্সি বা ছায়াপথের সংখ্যা বহু। এর সঠিক সংখ্যা আমরা জানি না। কারণ, সেই চাহিদা মেটাবার মত আমাদের এখনও নির্ভরযোগ্য কোন যন্ত্র (টেলিস্কোপ) নেই। তবে, অনুমিত ধারণা মতে এ সংখ্যা ১০০ বিলিয়ন থেকে ২০০ বিলিয়নের মধ্যে । সেই হিসেবে, আমাদের মিল্কিওয়ের রয়েছে অনেক অনেক প্রতিবেশি।**

**কিন্তু মিল্কিওয়ের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্যালাক্সি কোনটি?**

**অনেকেই উত্তরে বলবেন, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি অথবা, ম্যাজেলানিক ক্লাউড (গধমবষষধহরপ ঈষড়ঁফং)। কিন্তু, সত্যি কথা হল, মিল্কিওয়ের নিকটতম গ্যালাকটিক প্রতিবেশির বাস মিল্কিওয়ের ভেতরেই!**

**চমকে যাবেন না প্লিজ, ব্যাখ্যা করছি।**

**ক্যানিস ম্যাজর বামন (ঈধহরং গধলড়ৎ উধিৎভ) গ্যলাক্সির দূরত্ব মিল্কিওয়ের কেন্দ্র থেকে ৪২ হাজার আলোকবর্ষ। অন্য দিকে, আমাদের থেকে, মানে সৌর পরিবার থেকে এর অবস্থান আরো কাছে, মাত্র ২৫ হাজার আলোকবর্ষ। ফলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ! এই গ্যালাক্সিটি আমাদের মিল্কিওয়ের চেয়েও কাছের। কারণ, আমাদের থেকে মিল্কিওয়ের কেন্দ্রের দূরত্ব ৩০ হাজার আলোকবর্ষ।**

**ক্যানিস ম্যাজর বামন গ্যলাক্সির আবিষ্কার ২০০৩ সালে। মহাকাশবিদরা একে পেয়েছেন অবলোহিত (ওহভৎধৎবফ) ছবি বিশ্লেষণ করে। অবলোহিত ছবির কারিশমা হল, এটা গ্যাস ও ধূলিকণা ভেদ করে পর্যবেক্ষকের চোখে এসে ধরা দেয়।**

**ক্যানিস ম্যাজর বামন গ্যালাক্সিতে অনেকগুলো এম-শ্রেণীর বামন তারকার বাস। তারকাগুলো শীতল, লোহিত। এরা অবলোহিত বর্ণালীতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়ে অবলোহিত চিত্র তৈরি করে।**

**মিল্কিওয়ের আজকের এই বপু হয়েছে এই ক্যানিস ম্যাজরের কিয়দাংশ ভক্ষণ করে। মিল্কিওয়ে এখনও তাকে গ্রাস করে চলেছে। বামন ক্যানিস ম্যাজরের অনেকগুলো তারকা ইতোমধ্যেই মিল্কিওয়ের অংশ হয়ে গেছে। এর ফলে হয়েছে কি, মিল্কিওয়ের নিকটতম তারকার অবস্থান হয়েছে এর অভ্যন্তরেই!**

**বামন ক্যানিস ম্যাজরের আকার অতটা বড় নয়। এর তারকার সংখ্যা মাত্র ১ বিলিয়নের কাছকাছি। অন্য দিকে আমাদের মিল্কিওয়েতে তারকার সংখ্যা ২০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন।**

**নিকটতম গ্যালাক্সি হবার রেকর্ডটি আগে ছিল বামন স্যাগিটেরিয়াস নামক ডিম্বাকৃতির (ঊষষরঢ়ঃরপধষ) গ্যালাক্সিটির। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। এর দূরত্ব ছিল ৭৫ হাজার আলোকবর্ষ।**

**সাধারণভাবে প্রচলিত যে, অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের নিকটতম। আসলে এটা হচ্ছে সর্পিল (ঝঢ়রৎধষ) গ্যালাক্সিদের মধ্যে নিকটতম। এটা অবশ্য মিল্কিওয়ের সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু দূরত্বের দিক দিয়ে আমাদের গ্যলাক্সি থেকে এর অবস্থান ২০ নম্বরে। পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির দূরত্ব ২৫ লাখ আলোকবর্ষ।**

**লার্জ ও স্মল ম্যাজেলানিক ক্লাউড (খধৎমব ধহফ ঝসধষষ গধমবষষধহরপ ঈষড়ঁফং) এর দূরত্ব আমাদের থেকে যথাক্রমে ১ লক্ষ আশি হাজার ও দুই লক্ষ দশ হাজার আলোকবর্ষ। মনে করা হয়, এরা মিল্কিওয়েকে প্রদক্ষিণ করছে, তবে তা নাও হতে পারে।**

**এই সবগুলো গ্যালাক্সিই লোকাল গ্রুপ নামক ত্রিশের অধিক গ্যলাক্সিদলের সদস্য। এদের বিস্তৃতি মিল্কিওয়ে থেকে ৪০ লাখ আলোকবর্ষ পর্যন্ত।**

**সূত্রঃ ইংরেজি উইকিপিডিয়াঃ নিকটতম গ্যালাক্সিদের তালিকা, ইউনিভার্স টুডে, স্পেইস ডট কম**

**আন্তঃছায়াপথীয় সংঘর্ষে নতুন তারার জš§**

**মানুষের মতোই জš§-মৃত্যু ঘটে নক্ষত্রেরও। জš§স্থানকে বলা হয় নীহারিকা বা নেবুলা। নীহারিকার উপাদান হল গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘ। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিসহ সব গ্যালাক্সিতেই রয়েছে নীহারিকার উপ¯ি’তি। সাধারণত এক একটি নীহারিকা বহু আলোকবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। একটি নীহারিকাতে যে পরিমাণ গ্যাস থাকে, তা দিয়েই আমাদের সূর্যের মতো কয়েক হাজার নক্ষত্রের জš§ হতে পারে। নীহারিকার অধিকাংশ উপাদানই হচ্ছে বিভিন্ন হালকা গ্যাস। বিশেষ করে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের অণু। এ সমস্ত গ্যাস ও ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে যথেষ্ট পরিমাণ মহাকর্ষ তৈরি করতে পারলে নিজস্ব মহাকর্ষের চাপেই সঙ্কুচিত হতে থাকে।**

**সঙ্কুচিত হতে হতে গ্যাসগুলোর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সঙ্কোচনশীল গ্যাস বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে এক একটি আলাদা নক্ষত্র তৈরি হয়। এক সময় এ নক্ষত্রের তাপমাত্রা প্রায় ২ হাজার কেলভিনে পৌঁছায়। এ অবস্থায় হাইড্রোজেন অণু ভেঙ্গে গিয়ে মৌলটির পরমাণুতে পরিণত হয়। এর তাপমাত্রা এক সময় উঠে যায় ১০ হাজার কেলভিনে। সঙ্কুচিত হয়ে সূর্যের প্রায় ৩০ গুণ আয়তন লাভ করলে এই নব-সৃষ্ট তারকাকে বলে প্রোটো স্টার বা ভ্রুণ তারা (চৎড়ঃড়ংঃধৎ)। এবার এতে হাইড্রোজেন পরমাণু জোড়া লেগে লেগে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকে। এই নিউক্লীয় বিক্রিয়াটির নাম ফিউশন।**

**ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেই তারকায় একটি ভারসাম্য তৈরি হয়। নক্ষত্রের মহাকর্ষ একে গুটিয়ে আরও ছোট করে ফেলতে চায়। অন্য দিকে ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে এটি বাইরের দিকে প্রসারিত হতে চায়। বিপরীতমুখী এ দুই চাপ-ই ভারসাম্য তৈরি করে। ফিউশনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানি হাইড্রোজেনে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত চলতে থাকে এভাবেই। সাধারণত এটাই হল নক্ষত্রের জšে§র মূল প্রক্রিয়া। এর পরবর্তী জীবনে কী ঘটে, সেটা আপাতত আমরা আলোচনা করছি না।**

**তবে সম্প্রতি নক্ষত্র সৃষ্টির আরেকটি প্রকিয়ার কথা জানা গেল। এটা ঘটল বিভিন্ন ছায়াপথের মধ্যে সংঘর্ষে। আমাদের সৌর পরিবারের বসবাস মিল্কিওয়ে গ্যলাক্সিতে। এর একটি প্রতিবেশি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ হল লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউড। এর পাশেই আছে আরেকটি ছোট ছায়াপথ। নাম ছোট ম্যাজেলানিক ক্লাউড। সম্প্রতি বড় ছায়াপথের চারপাশে এক গুচ্ছ নতুন নক্ষত্রের একটি বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এদের জš§ হয়েছে দুটো ছায়াপথের সংঘর্ষে।**

**বড় ও ছোট ম্যাজেলানিক ক্লাউডকে ছায়াপথ বলা হলেও এরা আমাদের মিল্কিওয়েকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গ্রহরা যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, অনেকটা তেমন-ই। বড়টির দূরত্ব আমাদের থেকে এক লাখ ৬০ হাজার আলোকবর্ষ। আর ছোটটি আছে ২ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে, পৃথিবী থেকে আলোর বেগে রওনা দিলেও এতে পৌঁছতে সময় লাগবে ২ লাখ বছর!**

**বর্তমানে এরা একে অপর থেকে ৭৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে। কিন্তু ২০ কোটি বছর আগে এরা ছিল আরও অনেক কাছাকাছি। আবার এমনও হতে পারে যে ছোটটি বড়টির পেটের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি বড় ছায়াপথটির প্রান্তের দিকে ছয়টি নব তারা দেখা গেছে। আবিষ্কারটি করেছেন চিলির জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান মনি বিডিন ও তাঁর সহকর্মীরা। এ ছয়টি তারার মধ্যে মাত্র একটিকে পাওয়া গেছে নতুন তারার জš§স্থানের মধ্যে। বাকি পাঁচটির অবস্থান হল এমন জায়গায়, যেখানে শুধু পুরাতন তারকাদের উপ¯ি’তি আছে।**

**মনি বিডন বলেন, ’এটা খুবই বিস্ময়কর ঘটনা। অঞ্চলটিতে সাম্প্রতিককালে নতুন তারা তৈরি কোনো লক্ষণই ছিল না।’**

**হতে পারে, দুটো গ্যালাক্সির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এদের গ্যাস সঙ্কুচিত হয়ে নতুন তারা উদ্ভব ঘটেছে। নতুন এ তারাদের বয়স এক থেকে ৫ কোটি বছরের মধ্যে। সাধারণ নক্ষত্রের হিসাবে এ বয়স খুব সামান্য। মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন নক্ষত্রের বয়স মহাবিশ্বের বয়সেরই কাছাকাছি। মানে প্রায় ১৪ শ কোটি বছর। ফলে, নতুন এ তারাগুলোকে ছায়াপথ দুটোর সংঘাতের ফলাফল বলে ধরে নেওয়া খুবই যৌক্তিক। বিডিনের মতে এ অঞ্চলে আরও এমন নতুন তারা পাওয়া যেতে পারে। হতে পারে সেগুলো তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল।**

**সূত্রঃ নিউ সায়েন্টিস্ট, বিশ্ব ডট কম, অ্যাস্ট্রোনমি ডট কম।**

**আণবিক কৃষ্ণগহ্বর**

**কৃষ্ণগহ্বর। অতিমাত্রায় শক্তিশালী মহাকর্ষের এক ফলাফল। সাধারণত কৃষ্ণগহবরের উৎপত্তি ঘটতে পারে প্রাকৃতিক উপায়ে। কিন্তু মানুষ সব সময় প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। কৃত্রিম উপগ্রহ, দেহের কৃত্রিম অঙ্গাণু ইত্যাদি মানুষের এ অভিলাষেরই প্রতিফলন। তাই বলে কৃষ্ণগহ্বর? হ্যাঁ, সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এক্স-রে লেজার বিম ব্যবহার করে প্র¯‘ত করা হয়েছে ছোট্ট আণবীক্ষণীক কৃষ্ণগহ্বর। গত ৫ জুন নেচার সাময়িকীতে এ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।**

**কৃষ্ণগহ্বর হওয়ার মূল শর্ত হলো, ব¯‘র ভর বা শক্তিকে সংকুচিত করে এতটা ছোট বানিয়ে ফেলতে হবে যাতে এর মুক্তিবেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়। আর কৃষ্ণগহ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আশেপাশের অঞ্চল থেকে সর্পিল পথে পদার্থ টেনে নেয়। এ ধরনের রূপক একটি কাজই করা হয়েছে সাম্প্রতিক পরীক্ষায়।**

**পরমাণু দিয়ে গড়া আমাদের পরিচিত বিভিন্ন ব¯‘কে দেখতে শান্ত মনে হলেও আসলে পরমাণুর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে এক তুমুল গতিময় অবস্থা। ওপরে উল্লিখিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এক্স-রে লেজার বিম ব্যবহার করে আলোর উজ্জ্বল ও দ্র“তগামী ঝলক দিয়ে সেই গতিময় প্রক্রিয়ার পারমাণবিক স্তরের ছবি তোলা হয়েছে। এতে করে একটি পরমাণু থেকে অল্প কয়টি ছাড়া প্রায় সব ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। সৃষ্টি হয় একটি শূন্যতা। যেটি অণুর বাকি অংশ থেকে ইলেকট্রনকে ভেতরের দিকে টানতে থাকে। ঠিক যেভাবে কৃষ্ণগহ্বর পেঁচিয়ে ব¯‘কে নিজের দিকে টেনে নেয়। এটাই রূপক কৃষ্ণগহ্বর। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী সেবাশ্চিয়ান বুটেট বলেন, ’ব্যবহƒত এক্স-রে ঝলকের শক্তি এত বেশি যে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত সম্পূর্ণ সূর্যরশ্মিকে বুড়ো আঙ্গুলের নখাগ্রে নিয়ে এলে যতটা তেজস্বী হবে, এটা তার চেয়েও একশ গুণ শক্তিশালী।’ এতে করে ৩০ ফেমটোসেকেন্ডের (১ সেকেন্ডের এক লক্ষ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ) মধ্যে অণুটি ৫০ টির বেশি ইলেকট্রন হারায়। আশা করা হচ্ছে এ কৌশল ব্যবহার করে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার আল্ট্রা-হাই রেজুলেশনের ছবি তোলা যাবে। তৈরি করা যাবে উন্নত ঔষধ। এর আগে আলোর পরিবর্তে শব্দকে নিয়ে এ ধরনের রূপক কৃষ্ণগহ্বর বানানো হয়েছিল।**

**সূত্র: নেচার, আইএফএলসায়েন্স।**

**পালসার সংকেতের রহস্যভেদ**

**পালসার হল এক ধরনের নিউট্রন নক্ষত্র। যে সব ভারী নক্ষত্রের ভর জীবনের শেষ ধাপে ব্ল্যাক হোল তৈরি হবার মতো যথেষ্ট নয়, তারা পরিণদ হয় নিউট্রন নক্ষত্রে। এদের মধ্যে কোনো প্রোটন বা ইলেকট্রন থাকে না। থাকে শুধু নিউট্রন। আর সে জন্যেই এই নাম। ভর সূর্যের কয়েক গুণ। কিন্তু ঘনত্ব বেশি হবার কারণে আয়তনে হয় পৃথিবীর চেয়েও অনেক ছোট। ব্যাসার্ধ মাত্র ১০ কি.মি. এর কাছাকাছি।**

**এদেরই এক রূপ হল পালসার। শব্দটি আসলে পালসেটিং স্টার কথার সংক্ষেপ। পালসেট (চঁষংধঃব) কথার অর্থ হল স্পন্দিত হওয়া। এরা নিয়মিত বিরতিতে স্পন্দিত হয় বলেই নামটি পাওয়া। চুম্বকত্বও অনেক বেশি। এছাড়াও নির্গত করে শক্তিশালী তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ। নির্গত বেতার তরঙ্গ এদের চারপাশে ঘুরতে থাকে লাইটহাউসের আলোর মতো। এর ফলে, এরা খুব সময় মেপে, নিয়মিত বিরতিতে সাধারণত বেতার সংকেত প্রেরণ করতে থাকে।**

**বহু দিন ধরেই একটি রহস্য বিজ্ঞানীদেরকে খুব ভাবাচ্ছিল। পালসাররা কেন মহাশূন্যে বিভিন্ন ধরনের সংকেত পাঠায়? তবে সম্প্রতি এর কিছু উত্তর মিলেছে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। এতে কাজে এসেছে নাসার চন্দ্র এক্সরে অবজারভেটরির তোলা কিছু ছবি। এতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পালসার নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। এতে বোঝা গেল, পালসারের বিকিরণ পৃথিবী থেকে শুধু কিছু নির্দিষ্ট কোণেই দেখা যায়। এতেই পাওয়া গেছে সমাধানের সূত্র।**

**বহু দিন পর্যন্ত পালসারদেরকে শ্রেণীবিভাগ করা হত এদের নির্গত তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের দ্বারা। কিন্তু ২০০৮ সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, কিছু পালসার গামা রশ্মিও নির্গিত করতে পারে। এ আবিষ্কার সম্ভব হয় নাসার ফার্মি টেলিস্কোপের মাধ্যমে। বেতার রশ্মির মতোই গামা রশ্মিও আরেক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ। তবে বেতার রশ্মির তুলনায় এর শক্তি অনেক বেশি। গামা রশ্মির পালসারই বিজ্ঞানীদের প্রায় এক দশক ধরে ভাবাচ্ছিল।**

**পালসারের সংকেতের তারতম্যের সাথে জ্যামিতির খুব মিল রয়েছে। একটি পালসারকে কোন জায়গা থেকে এবং কেমন দেখা যাবে, সেটা নির্ভর করে এর ঘূর্ণন ও চুম্বক অক্ষ আমাদের দৃষ্টি রেখার সাথে কীভাবে অব¯ি’ত তার ওপর। পালসার গবেষণার একটি উপায় হল এক ধরনের নীহারিকা নিয়ে গবেষণা। এ নীহারিকাদের নাম পালসার উইন্ড নেবুলা। পালসারের পাশেই থাকে চার্জিত কণার ঘূর্ণি। এদের গতি আলোর কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে। এ কণাদের দ্বারা গঠিত নেবুলাকেই বলা হয় পালসার উইন্ড নেবুলা। অন্যান্য অনেক নেবুলার মতোই এ নেবেুলাও তৈরি হয় কোনো সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ থেকে।**

**চন্দ্র এক্সরে অবজারভেটরির মাধ্যমে এ নেবুলাদের খোঁজ-খবর নেওয়া সুযোগ হচ্ছে। পালসারদের মধ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন রকমের চুম্বকীয় কর্মকা-ের ব্যাখ্যা পেতে সহায়তা করে নেবুলাগুলো। এছাড়াও আমরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিকিরণই কেন পাই, মিলছের তার ব্যাখ্যাও।**

**গবেষণা দলের সদস্য ও স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ রজার রোমেনি বলেন, ’পালসার উইন্ড নেবুলা নিয়ে গবেষণা করে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর এটা অন্যতম সেরা।’ এই গ্যাসগুলোর ত্রিমাত্রিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ করে পালসারের কেন্দ্র থেকে নির্গত প্লাজমার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আগেই বলেছি, সাম্প্রতিক এ অগ্রগতির জন্যে দুটি ভিন্নধর্মী পালসার দেখা হয়েছে। এদের উইন্ড নেবুলাও ভিন্ন প্রকৃতির। একটির দূরত্ব (নাম গেমিংগা) আট শ আলোকবর্ষ, আরেকটির তিন হাজার তিন শ। গেমিংগার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দিকে তিনটি আলাদা লেজ পাওয়া গেছে। গবেষকদের মতে, এ লেজের অবস্থানের কারণেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন সংকেত পাচ্ছি। গেমিংগার ক্ষেত্রে পাচ্ছি বেতারের বদলে গামা সংকেত।**

**আবার অন্য পালসারটির ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে বেতার সংকেত। কারণ এর বেতার সংকেতের দিক পৃথিবীমুখী হয়ে আছে। যদিও হয়ত এতেও গামা রশ্মির বিকিরণ চলছে, তার দিক পৃথিবীর দিকে নয়। পালসার নিয়ে এখনও জানার অনেক কিছু বাকি। তবে নতুন এ আবিষ্কারের ফলে দুটো লাভ হয়েছে। এক, জানা গেছে যে পালসাররা কেন শুধু একটি নির্দিষ্ট রকমের বিকিরণই পাঠায়। দুই, কণা পদার্থবিদরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারছেন, যার পরীক্ষা পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে সম্ভব নয়।**

**সূত্র: সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম, নিউ সায়েন্টিস্ট, হার্ভাড ডট এজু, ইংরেজি উইকিপিডিয়া।**

**ডার্ক ফোটনের সন্ধানে**

**আধুনিক বিজ্ঞানের বড় বড় রহস্যগুলোর একটি ডার্ক ম্যাটার। সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব না হলেও এদের উপ¯ি’তির বিষয়টি পরিষ্কার। দৃশ্যমান ব¯‘দের চলাচল, মহাকর্ষীয় লেন্সিং (ভরের প্রভাবে আলোর গতিপথের বাঁক), মহাবিশ্বের বড় কাঠামোয় ভূমিকা ও মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার জন্যে দায়ী এ পদার্থ। মহাবিশ্বের মোট ভর-শক্তির চার ভাগের এক ভাগেরও বেশি এর পরিমাণ। সাধারণ পদার্থের সাথে এদের মিল নেই। এরা আলো বা কোনো ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালিই নির্গত করে না।**

**মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসহ বড় বড় কাঠামোর গঠন ব্যাখ্যা করতে হলে ডার্ক ম্যাটারের রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন। ডার্ক ম্যাটারের খোঁজ পেতে তাই মরিয়া হয়ে লড়ছেন বিজ্ঞানীরা। চলছে বহু পরীক্ষা-নিরিক্ষা। ডার্ক ম্যাটার রহস্যের সমাধান করার জন্যে কিছু গবেষক লেগেছেন একটি কণার পেছনে। নতুন এ কণার নাম ডার্ক ফোটন। এটি একটি প্রস্তাবিত কণিকা। ডার্ক ম্যাটার ও সাধারণ বস্তুর মধ্যে এক যোগসূত্র মনে করা হয়। সাধারণ ফোটনের (আলোর কণা) সাথে মিশ্রণের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এদের শনাক্ত করা যেতে পারে। আর একবার যদি শনাক্ত হয়েই যায়, তাহলে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই পাল্টে যাবে।**

**ডার্ক ম্যাটার তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত না করলেও সাধারণ ব¯‘র সাথে তো ঠিকই ক্রিয়া করে। তাহলে মহাকর্ষ ছাড়াও এমন অজানা একটি বল নিশ্চয় আছে, যার মাধ্যমে ঘটে এই প্রতিক্রিয়া। আমরা বর্তমানে জানি, মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বল আছে। মহাকর্ষ, তড়িৎচুম্বকীয় এবং দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় বল। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে, প্রতিটি বলের জন্যে রয়েছে একটি করে বলবাহী কণা। যেমন ফোটন হল তড়িৎচুম্বকীয় বলের বাহক। এখন, ডার্ক ম্যাটার সাধারণ পদার্থের সাথে যে বল দ্বারা ক্রিয়া করে, তার জন্যেই দায়ী করা হচ্ছে ডার্ক ফোটনকে। ধরুন, আপনার সামনে গ্রিক ভাষায় লেখা একটি চিঠি আছে। আপনি এটা পড়ার জন্যে চলে গেলেন গুগল ট্রান্সলেটের কাছে। জেনে নিলেন অর্থ। এখানে গুগল ট্রান্সলেটের আপনার ও চিঠির মাঝে বাহকের ভূমিকা পালন করল। ডার্ক ফোটনও সাধারণ ম্যাটার ও ডার্ক ম্যাটারের মাঝে এ কাজটাই করে। এমন ব্যখ্যাই দিলেন ইউরোপীয় নিউক্লীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান সার্নের মুখপাত্র সের্গেই নিনেকো।**

**ডার্ক ফোটন প্রকল্পে সমর্থন রয়েছে বহু বিজ্ঞানীর। কিন্তু সমস্যা হল, এখনও সম্ভব হয়নি পর্যবেক্ষণ। কিন্তু যে কোনো সময় সাফল্যের দেখা মিলতে পারে। সার্নের এক দল আন্তজার্তিক গবেষক এর সন্ধানে নেমেছেন। মনে রাখতে হবে, এই সার্নেই কিন্তু ভরের জন্যে দায়ী রহস্যময় কণা হিগস বোসন শনাক্ত হয়েছিল। এ অনুসন্ধান প্রকল্পের নাম এনএ৬৪। এটি মূলত দৃশ্যমান ডার্ক প্রতিক্রিয়ার সূত্র খুঁজবে। এ কাজে ব্যবহার হবে অতি পরিচিত শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি। নীতির বক্তব্য হল, একটি আবদ্ধ সিস্টেমের মোট শক্তি সব সময় একই থাকবে।**

**এখন বিষয় হল, গবেষকরা যদি একটি বিচ্ছিন্ন সিস্টেম (পরিবেশ) তৈরি করতে পারেন, তাহলে এর ভেতরে কতটুকু শক্তি আছে তা খুব সূক্ষ¥ভাবে মেপে ফেলা যাবে। একটি কণাত্বরক যন্ত্রে ইলেকট্রনের রশ্মির সাহায্যে ফোটন তৈরি করা হবে। এরপর খেয়াল করা হবে, শক্তির পরিমাণ বদলে গেল কি না। যদি বদলে যায়, তার মানে অদৃশ্য কিছু একটা কাজ করছে এখানে। হতে পারে সেটাই ডার্ক ফোটন। গবেষণা দলের বক্তব্য হল, ’ডিটেক্টরকে লক্ষ্য করে জানা শক্তির ইলেকট্রনের রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। আগত ইলেকট্রন ও পরমাণুর কেন্দ্রের মিথষ্ক্রিয়ায় তৈরি হয় দৃশ্যমান ফোটন। এ ফোটনদের শক্তি পরিমাপ করে ইলেকট্রনের সমান শক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু ডার্ক ফোটন নামে কিছু থাকলে তারা প্রাথমিক ইলেকট্রনের শক্তি থেকে কিছু অংশ দখল করে ফেলবে। ’**

**কতটুকু শক্তি চলে গেলে, সেটার ওপর ভিত্তি করে রহস্যময় ডার্ক ম্যাটারের সূত্র মিলে যেতে পারে। তবে এর মাধ্যমে কেবল তাদের লক্ষ্মণই পাওয়া যাবে, সরাসরি তাদেরকে নয়। যদিও সূত্রটি হবে খুবই শক্তিশালী। তবুও সরাসরি পর্যবেক্ষণের আগ পর্যন্ত ডার্ক ফোটন কল্পিত কণা হিসেবেই থাকবে। কিন্তু বড় এক রহস্যের সমাধানে এক ধাপ অগ্রগতি তো অন্তত হবে।**

**সূত্রঃ ইংরেজি উইকিপিডিয়া, সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম, ফিজ ডট অর্গ, স্পেস ডট কম।**

**দ্বিতীয় অধ্যায়: সৌরজগৎ**

**আমাদের সৌরজগত কত বড়?**

**পৃথিবীতে বসে থেকে আমরা সৌরজগতের কিয়দাংশই দেখতে পাই। আমরা কী কীইবা আর দেখি? দিনে সূর্যের প্রখর তেজ, রাতের আকাশের কোমল চাঁদ ও আরো কিছু গ্রহ। কিন্তু আমাদের সৌরজগতের চৌহদ্দি অত অল্প নয়। তাহলে, প্রশ্ন দাঁড়ায়, আমাদের সৌরজগত ঠিক কত বড়?**

**হিসাব দেবার আগে হিসাবের এককটা দেখে নেই। মহাকাশের দূরত্বগুলো এত বিশাল যে আমাদের এসআই একক (ঝও টহরঃ) মিটার তো দূরের কথা, কিলোমিটারও পাত্তা পায় না। মহাকাশবিদগণ তাই অ্যাস্ট্রোনোমিকেল ইউনিট (ধংঃৎড়হড়সরপধষ ঁহরঃ বা অট) নামে একটি একক ব্যবহার করেন। এই এককটার মান হচ্ছে পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব বা ১৫ কোটি কিলোমিটারের সমান।**

**বুধ গ্রহ (গবৎপঁৎু) সূর্য থেকে মাত্র .৩৯ এইউ (অট) দূরে। আর জুপিটার সূর্যের ৫.৫ এইউ দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। দূরতম গ্রহ নেপচুনের দূরত্ব সূর্য থেকে ৩০.২ এইউ, যা ৪৫০৩ মিলিয়ন কিলোমিটারের সমান। প্লুটোর দূরত্ব ৩৯.২ এইউ। প্লুটো এখন বামন গ্রহ হলেও সৌর পরিবার থেকে তো আর নির্মূল হয়নি!**

**দ্রুতবেগে ছোটা হাইওয়েগামী গাড়ি (ধরলাম বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১১৫ কিলোমিটার) নিয়ে সূর্য থেকে নেপচুনে যেতে প্রায় ৪৬ হাজার বছর লেগে যাবে।**

**কিন্তু আমাদের সৌরজগতের দৌড় এখানেই শেষ নয়। গ্রহদের চৌহদ্দি যেখানে শেষ, সৌরজগতের পরিধি তার চেয়েও বহু দূর অব্দি বিস্তৃত।**

**সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী বামন গ্রহ (ফধিৎভ ঢ়ষধহবঃ) হল এরিস (ঊৎরং)। এও কিন্তু সৌরজগতের একটি ক্ষুদ্র গ-ির মধ্যেই পড়ে আছে। আবার, সৌরজগতের ৩০ এইউ থেকে ৫০ এইউ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ সাড়ে ৭ বিলিয়ন অঞ্চল জুড়ে কুইপার বেল্ট (কঁরঢ়বৎ নবষঃ) বিস্তৃত। এই বেল্টের মধ্যে আছে প্লুটো, ইরিস, মেইকমেইক ও হোমিয়া বামন গ্রহরা।**

**চিত্র: কুইপার বেল্ট**

**সবে তো শুরু!**

**আরও দূরে, প্রায় ৫০-২০০ এইউ দূরত্বে দেখা মিলবে প্রান্ত সীমার। এটা হচ্ছে সেই সীমানা, যেখান পর্যন্ত সেকেন্ডে ৪০০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যায় সৌর বায়ু (ঝড়ষধৎ ডরহফ) এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয় আন্তঃতারকা পদার্থের সাথে। এই পদার্থগুলো আবার একীভূত হয়ে ধূমকেতুর মত লেজ তৈরি করে যার বিস্তৃতি হয় সূর্য থেকে ২৩০ এইউ পর্যন্ত।**

**কিন্তু, সৌরজগতের সত্যিকার বিশালতা বোঝা যাবে এর অভিকর্ষের পাল্লা থেকে অর্থাৎ যে দূরত্ব পর্যন্ত কোন বস্তু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে।**

**ওর্ট ক্লাউড সহ সৌরজগত**

**সৌরজগতের দূরবর্তী পরিসর হচ্ছে ওর্ট ক্লাউড পর্যন্ত। ওর্ট ক্লাউড হচ্ছে এক গুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিমেল (ওপু) গ্রহের সমষ্টি। এরা ১ লক্ষ এইউ দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই দূরত্ব ১.৮৭ আলোক বর্ষের সমান। যদিও আমরা ওর্ট ক্লাউডকে সরাসরি দেখি না, মনে করা হয় যেসব লং পিরিয়ড ধূমকেতু (ঈড়সবঃ) সৌরজগতের নিকটবর্তী অংশে চলে আসে, তাদের উৎপত্তি এখানে।**

**সূর্যের অভিকর্ষ নিজের বাড়ি পেরিয়ে ২ আলোক বর্ষব্যাপী বিস্তৃত। এই পাল্লা সূর্য থেকে এর নিকটতম তারকা প্রক্সিমা সেন্টোরির দূরত্বের প্রায় অর্ধেক। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই অঞ্চলের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তু সূর্যকে প্রদক্ষিণ (জবাড়ষঁঃরড়হ) করবে।**

**আগের সেই গাড়িটার কথা মনে আছে? ঐ গাড়িটার এই দূরত্ব পাড়ি দিতে প্রায় ২ কোটি বছর লাগবে! পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত সর্বাধিক বেগের নাসার মহাকাশযান নিউ হরাইজন (ঘবি ঐড়ৎরুড়হং) একই কাজ করতে ৩৭ হাজার বছর সময় নেবে। এর গতি সেকেন্ডে ১৬.২৬ কি.মি বা ঘণ্টায় ৫৮৫৩৬ কি.মি।**

**সূত্রঃ ইউনিভার্স টুডে, ইংরেজি উইকিপিডিয়া।**

**উšে§াচিত হলো সূর্যের লুকানো রহস্য**

**সূর্যের অভ্যন্তরভাগ লুকিয়ে আছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। আমরা দেখছি না সেখানে কী ঘটছে। সূর্যের দিেেক তাকালে আমরা যে স্তরটি দেখতে পাই তার নাম হলো ফটোস্ফিয়ার বা আলোকম-ল। সূর্যের মধ্যে আমরা যে কালো কালো দাগ দেখি, সেগুলো এই আলোকম-লেই অব¯ি’ত। কিন্তুর সূর্যের গভীরে লুকিয়ে আছে একটি বড় রহস্য। আমরা জানি, আমাদের পৃথিবীর মতোই সূর্যও নিজ অক্ষের সাপেক্ষে আবর্তন করে। তবে পৃথিবীর সাথে সূর্যের আবর্তনের একটি বড়সড় পার্থক্য আছে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে মেরু অঞ্চল হোক, আর বিষুব অঞ্চলই হোক, একবার আবর্তন সম্পন্ন হতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময়ই লাগে। কিন্তু সূর্য পৃথিবীর মতো কঠিন পদার্থে গড়া নয়। গঠিত অতি উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাস বা প্লাজমা দিয়ে। ফলে সৌরপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় আবর্তন বেগ আলাদা। যেমন বিষুব এলাকায় সূর্য নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে সময় নেয় প্রায় ২৫ দিন। কিন্তু মেরু এলাকায় সেটা সম্পন্ন হতে সময় লাগে ৩৮ দিন পর্যন্ত।**

**সূর্যের গভীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যটি হলো, এর অভ্যন্তরভাগ (কোর) কি পৃষ্ঠের সমান বেগে ঘুরে, নাকি আলাদা বেগো। আগে এটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্বিধা-বিভক্ত ছিলেন। কারো মতে কোর একই বেগে ঘুরছে, আবার কারো মতে পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের মতো ভেতরেও রয়েছে বেগের ভিন্নতা। কিন্তু এত দিন পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তরস জানা ছিল না। এ রহস্য উšে§াচনের জন্যে জ্যোতির্বিদরা ব্যবহার করছিলেন নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির (ইএসএ) সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরি (সোহো) উপাত্ত। এ উপাত্ত থেকে প্রথমবারের মতো সূর্যের কেন্দ্রম-লের (কোর) ঘূর্ণন বেগ নির্ভুলভাবে জানা গেল। গত ১ আগস্ট তারিখে এ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয় বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সাময়িকীতে। দেখা গেল, কেন্দ্রম-ল আর পৃষ্ঠ একই বেগে ঘুরছে না। বরং কোর ঘুরছে চার গুণ বেশি বেগে।**

**উপাত্ত থেকে একটি নিু কম্পাঙ্কের গ্র্যাভিটি তরঙ্গের (জি ওয়েভ) অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এই জি ওয়েভ কিন্তু মহাকর্ষ তরঙ্গ থেকে আলাদা। জি ওয়েভ হলো প্রবাহী পদার্থের চলাচলের একটি ফলাফল। প্রবাহীর গতির কোনো অংশে সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হলে উদ্ভব ঘটে এই জি ওয়েবের। এটা সমুদ্রের পানি, মেঘ কিংবা পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত পদার্থের অঞ্চলে ঘটতে পারে। এখন, দেখা যাচ্ছে সূর্যের কোরের ভিন্ন আবর্তনের জন্যেও দায়ী এই জি ওয়েভই।**

**গবেষণার সাথে জড়িত ফরাসি জ্যোতির্বিদ এরিক ফস্যা বলেন, ’আমরা ৪০ বছর ধরে সূর্যের জি ওয়েভের খোঁজ করছিলাম। কিন্তু এর আগে কখোনই পরিষ্কারভাবে একে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।’ সোহোর (ঝঙঐঙ) ১৬ বছরের উপাত্ত কাজে লাগিয়ে গবেষকরা জি-মোড নামের এক ধরনের জি ওয়েভ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এটাও জানা গেল যে, সুর্যের কোরকে নাড়িয়ে দিচ্ছে এ জি ওয়েভ। ফলাফল বলছে, সূর্যের কোর প্রতি সপ্তাহে একবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। যা সৌরপৃষ্ঠের ঘূর্ণনর প্রায় চার গুণ।**

**সোহো প্রকল্পের সাথে জড়িত নাসার বিজ্ঞানী বার্নাড ফ্লেক বলেন, ’এটা গত দশকে সোহোর সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর অবশ্যই সোহোর সর্বকালের অন্যতম সেরা আবিষ্কার।’**

**কিন্তু এই বেগ শুরুই বা হয়েছিল কী করে? গবেষণা দলের আরেক সদস্য রজার আলরিক বলেন, ’সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো ৪৬০ কোটি বছর আগে সূর্যের জšে§র সময়ই এই বেগের উৎপত্তি ঘটে থাকবে। এটা খুবই মজার বিষয় যে সম্ভবত সূর্যের জš§-মুহূর্তের একটি ঘটনার একটি রেশ আমরা জানতে পেরেছি।’**

**উল্লেখ্য, আজ থেকে সাড়ে পাঁচ শ কোটি বছর আগে আমাদের সৌরজগৎ ছিল বিপুল পরিমাণ ধূলি ও গ্যাসের মেঘ আকারে। মহাকর্ষের প্রভাবে এ গ্যাসীয় মেঘ সংকুচিত হতে হতে চ্যাপ্টা হয়ে চাকতি সদৃশ আকার লাভ করল। বিশাল এই চাকতি ক্রমান্বয়ে দ্র“ত থেকে দ্র“ততর ঘুরতে লাগল। ঠিক যে কারণে ঘুরন্ত লম্বা কোনো ব¯‘কে গুটিয়ে নিলে ঘূর্ণন বেগ বেড়ে যায়। চাকতিটির কেন্দ্রে জš§ হলো সূর্যের। আর মূল অংশ থেকে কতগুলো বড় বড় খ- ছিটকে বেরিয়ে কক্ষপথে অবস্থান নিল। এরাই পরে গ্রহ হলো। যাই হোক, মূল চাকতিতে সেই যে ঘূর্ণন শুরু হয়েছিল, সেটাই বলবৎ আছে আজ অবধি। সেটারই একটি অংশ অবদান রাখছে বর্তমান সূর্যের বর্তমান কোরে।**

**সূত্র: নাসা, সোলার সেন্টার, সায়েন্স অ্যালার্ট**

**কেপলার গ্রহের সূত্র কোথায় পেলেন?**

**একটানা কয়েক রাত রাতের আকাশের দিকে নজর রাখলে দারুণ একটি ব্যাপার আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন যে প্রতি রাতেই তারারা একটু একটু করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। একটি নিদিষ্ট রাতেতো সরে অবশ্যই। এর পাশাপাশি সাধারণত একটি তারা প্রতি রাতে আগের রাতের প্রায় চার মিনিট আগেই একই অবস্থানে চলে আসে। এক বছর পর একে ঠিক আগের সময়ে আগের জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু গ্রহরা এই নিয়ম মানে না। দূরের তারাদের তুলনায় কখনও এরা বেশি পশ্চিমে চলে যায়। কখনও আবার পরের রাতে দেখা যায় এরা আগের চেয়ে পূর্ব দিকে চলে এসেছে। প্রাচীন কালে গ্রহদের এই আচরণ ছিল ব্যাখ্যাতীত। এরি¯টটলীয় মতবাদ অনুসারে পৃথিবী ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে। এই ধারণার ভিত্তিতে গ্রহদের গতির ব্যাখ্যা দেবার জন্যে টলেমি প্রস্তাব করলেন দূরের তারাদের পাশাপাশি গ্রহরাও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তবে এরা আবার তার পাশাপাশি নিজেরা আবার একটি বৃত্তপথে ঘুরছে। এই পথের নাম ছিল মন্দবৃত্ত (বঢ়রপুপষব)।**

**কিন্তু এই মডেল সঠিক হলে কখনও কখনও চাঁদকে দ্বিগুণ কাছে দেখা যাবার কথা। তার মানে ভুল আছে এতে। কিন্তু ভুলটি ঠিক কোথায়? আর সঠিক মডেলটিই বা কী?**

**সেই গ্রিকদের আমলেই অ্যারিস্টার্কাসসহ অনেকে পৃথিবীর বদলে সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে চিন্তা করতেন। ১৫৪৩ সালে কোপার্নিকাস এই মতবাদকে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসেন। এর আগে ইসলামী জ্যোতির্বিদদের কেউ কেউও কাছাকাছি ধারণা প্রস্তাব করেন। যেমন আবু সাঈদ আল সিজ্জী বলেন, আকাশের তারাদের চলাচলের কারণ আসলে পৃথিবীর নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণন।**

**কিন্তু সঠিক জ্ঞান জানতে হলে চাই পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য। কাজটি নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন টাইকো ব্রাহে। এই মহান জ্যোতির্বিদ ১৫৪৬ সালে জš§গ্রহন করেন ডেনমার্কে। তাকেঁ আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম সক্ষম চিন্তাবিদ বলা হয়। রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি যে পর্যবেক্ষণগুলো জড় করলেন তা প্রচলিত তথ্যের চেয়ে ছিল পাঁচ গুণ সঠিক। তখনও কিন্তু টেলিস্কোপেরও প্রচলন ঘটেনি। টেলিস্কোপের সহায়তা ছাড়া কাজ করা উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যেও তিনিই সর্বশেষ। তবুও তারঁ পর্যবেক্ষণগুলো এক দিকে যেমন ছিল নির্ভুল, তেমনি পরিমাণেও ছিল বিশাল।**

**কোপার্নিকাসের মডেলের জ্যামিতিক সুবিধা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন যে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। গ্রহরা ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। তবে তিনি ভুল করে মনে করেন বসেন যে সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অথ্যাৎ, তিনি কোপার্নিকান মডেলের সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। কেপলারসহ অন্যান্য কোপার্নিকান জ্যোতির্বিদরা তাঁকে সৌরকেন্দ্রিক মডেল মেনে নেবার জন্যে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ভুল ধারণা মাথায় নিয়েই ১৬০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।**

**কেপলারের জš§ ১৫৭১ সালে। তাঁর দেশ হল জার্মানি। ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য সময় তিনি গণিতের শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সময় দেন। ১৬০০ সালের ফেব্র“য়ারিতে টাইকোর সাথে তাঁর দেখা হয়। এ সময়ই প্রেগ শহরে টাইকো দুইজন সহকারীকে নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণগুলো সংগ্রহ করছিলেন। পরের দুই মাস তিনি টাইকোর বাড়িতে বেড়ালেন। চিন্তা ভাবনা করলেন মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলো। প্রথম দিকে টাইকো নিজের উপাত্তগুলো খুব সযতেœ লুকিয়ে রাখতেন। কিন্তু কেপলারের তাত্ত্বিক জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট মুগ্ধ করে। ফলে কেপলার আগের চেয়ে বেশি তথ্য নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পেলেন।**

**তবে হঠাৎ করে টাইকোর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক আবার জোড়া লাগল। পরিবারকে নিয়ে ফিরে আসার জন্যে বাড়ি এসে বিভিন্ন কারণে আর সাথে সাথে ফিরতে পারলেন না। এটা হল জুন মাসের কথা। শেষ পর্যন্ত আগস্টে ফিরে এলেন টাইকো ব্রাহের কাছে। একত্রে কাজ শুরু হল পুরোদমে। ১৬০১ সালে অক্টোবরে আক¯িমকভাবে টাইকোর মৃত্যু হলে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার পড়ে কেপলারে ওপর।**

**দীর্ঘ দিন সাধনা করে ১৬০৯ সালে তিনি গ্রহের গতির প্রথম দুটি সূত্র এবং ১৬১৯ সালে তৃতীয় সূত্র প্রকাশ করেন। প্রথম সূত্র থেকেই জানা গেলে যে গ্রহরা সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘোরার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও আরো বহু দিন যাবত সূর্যকে পুরো মহাবিশ্বের কেন্দ্র ভাবা হত। আঠারো শতকে এসে ধারণা তৈরি হয় যে, না, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিরই কেন্দ্রই হয়ত মহাবিশ্বের কেšদ্র।**

**আর এখন? এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের কেন্দ্রই নেই। কেন নেই সেটা না হয় আমরা আরেক দিন জানব।**

**সূত্র: কিউরিয়াস অ্যাস্ট্রো, ইংরেজি উইকিপিডিয়া**

**গ্রহদের অদ্ভুত উল্টো গতি**

**প্রতি দিন রাতের আকাশের দিকে নজর রাখলে একটি বিশেষ জিনিস চোখে পড়বে। প্রত্যেক রাতের একই সময়ে আকাশের তারাগুলো আগের রাতের চেয়ে একটু পশ্চিমে চলে আসে। এটা হয় সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে। পৃথিবী প্রতিনিয়ত কক্ষপথে অবস্থান বদল করার কারণে একেক সময় সূর্যকে আকাশের একেক দিকে অব¯ি’ত মনে হয়। সূর্যের এ আপাত অবস্থান যখন যে দিকে থাকে, সেদিকের তারাগুলো সে সময় সূর্যের প্রায় সাথে সাথে ডুবে যায়। তাই এ সময় তাদেরকে দেখ যায় না। কিছু দিন পর এ জায়গায় চলে আসে অন্য তারা। এভাবে এক বছর পর আবার একই তারাদের দেখা মেলে রাতের আকাশে।**

**সাধারণত তারকাদের এই চলাচলের কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু গ্রহরা এই নিয়ম মানে না। দূরবর্তী আপাত ¯ি’র নক্ষত্রেদের তুলনায় রাতের আকাশে এদের গতি সাধারণত পূর্ব দিকে। চাঁদও কিন্তু গ্রহদের মতো প্রতি রাতে আগের রাতের তুলনায় পূর্ব দিকে চলে আসে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায়, গ্রহরা স্বাভাবিক পূর্ব দিকর বদলে নক্ষত্রদের সাথে সাথে পশ্চিম দিকে চলছে। এই ঘটনা সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে বুধ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের ক্ষেত্রে। বৃহস্পতি বা শনি তুলনামূলক দূরে হওয়াতে এই উল্টো গতি দেখতে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়।**

**প্রাচীন কালের মানুষ এই উল্টে গতির ব্যাখ্যা জানত না। তখন মহাবিশ্ব সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণা প্রচলিত। পৃথিবীকে মানে করা হত মহাবিশ্বের কেন্দ্র। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই টলেমি মহাবিশ্বের একটি মডেল দাঁড় করলেন। সেই মডেলে পৃথিবীর চারদিকে আটটি গোলক কল্পনা করা হল। চাঁদ ও সূর্যের জন্যে ছিল একটি করে কক্ষপথ। সেই সময়ে জানা পাচঁটি গ্রহের জন্যে (বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি) ছিল আরও পাঁচটি কক্ষপথ। আরেকটি কক্ষপথ ছিল দূরবর্তী নক্ষত্রদের জন্যে। সময় সময় গ্রহদের উল্টো গতির ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বলা হল, পৃথিবীর চারদিকের কক্ষপথে ঘোরার পাশাপাশি এরা কক্ষপথের মধ্যেই আরেকটি বৃত্তপথে চলাচল করে। এই বৃত্ত পথের নাম ছিল মন্দ বৃত্ত। এই চিত্রের মাধ্যমে গ্রহদের এলোমেলো চলনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও ত্র“টি ছিল এতে। এই নমুনা সঠিক হলে চাঁদ মাঝে মাঝে পৃথিবীর অর্ধেক দূরত্বে চলে আসার কথা, যা বাস্তবে ঘটে না।**

**এখন আমরা জানি, টলেমির মডেল ভুল ছিল। গ্রহদের চলাচলের সঠিক ব্যাখ্যা দেন জার্মান গণিত ও জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলার। ব্যবহার করেন ড্যানিশ জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের সংগ্রহ করা তথ্য-উপাত্ত। কেপলারের গ্রহের সূত্র অনুসারে, পৃথিবীসহ অন্য গ্রহরা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। উপবৃত্তের কোনো একটি উপকেন্দ্রকে ঘিরে এর প্রদক্ষিণ চলতে থাকে। মজার ব্যাপার হল, কেপলারের সূত্র থেকে গ্রহদের উল্টো গতির ব্যাখ্যা খুব সহজেই পাওয়া যায়।**

**এটা বোঝার জন্যে ওপরের চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন। মাথায় রাখতে হবে, যে গ্রহরা সূযের অপেক্ষাকৃত কাছে, তাদের বেগ দূরের গ্রহের তুলনায় বেশি। কক্ষপথের পরিধিও ছোট। ফলে কাছের গ্রহরা অপেক্ষাকৃত কম সময়েই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ফেলে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মঙ্গল বা বাইরের দিকের কোনো গ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের সাথে একই রেখায় অবস্থান করলেও একটু পরেই পৃথিবী চলে যায় সামনে। পৃথিবী থেকে ভেতরের দিকের গ্রহরা আবার এগিয়ে যায় পৃথিবীর চেয়ে। আপাতত পৃথিবীর সাপেক্ষে মঙ্গলের আপেক্ষিক অবস্থানের দিকে লক্ষ করুন। ধ, ন থেকে প তে গিয়ে মঙ্গেেলর দিক পাল্টে পশ্চিমমুখী হয়ে গেল। আবার ব তে এসে ঘুরে গেল পূর্ব দিকে। বোঝাই যাচ্ছে, এরকম গতির পেছনে মূল কারণ হল, পৃথিবীর তুলনায় অন্য গ্রহদের কক্ষপথের পরিধি ও বেগের কম-বেশি।**

**সূত্র: ব্যাড অ্যাস্ট্রোনমি, ইংরেজি উইকিপিডিয়া।**

**শনি গ্রহ বলয় পেল কোথায়?**

**সৌরজগতের সবেচেয়ে সুন্দর গ্রহ কোনটি-এ প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ মানুষই বলবেন শনি গ্রহের নাম। কারণ আর কিছুই নয়, এর সুন্দর বলয়ের সারি। ১৬১০ সালে গ্যালিরিও সবার আগে শনির বলয় দেখতে পান। অবশ্য আকৃতি যে আসলে বলয়ের মতো তা আবিষ্কার করেন ডাচ জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস। বলয়গুলো বরফ ও পাথর দিয়ে গঠিত। এরা কিন্তু ¯ি’র বসে নেই। শনির চারদিকে ঘুরছে খুব উ”চ গতিতে। তবে শনির বলয় নিয়ে একাধিক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন শনির শুধু একটিই বলয় আছে। আসলে শনির বলয়ের চারটি বড় গ্রুপ ও অপেক্ষাকৃত হালকা তিনটি গ্রুপ আছে। সবচেয়ে বড় গ্রুপটির ব্যাস শনির ব্যাসের ২০০ গুণ। আরেকটি ভুল ধারণা হল, শুধু শনিরই বলয় আছে। কিন্তু বলয় আছে বৃহস্পতি, নেপচুন ও ইউরেনাসেরও। এটা ঠিক যে সেগুলো অপেক্ষাকৃত হালকা।**

**কিন্তু আবিষ্কারের ৪০০ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত করে জানি না, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল শনির বলয়। তবে সম্প্রতি জাপান ও ফ্রান্সের কিছু গবেষক এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছেন। তারা বলছেন, যে বরফ ও পাথরখ- দিয়ে শনির বলয় নির্মিত তা সম্ভবত প্লুটোর সাইজের হাজার হাজার ব¯‘র সংঘষের ফর্লে তৈরি হয়েছে। প্রায় চারশ কোটি বছর আগে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন অ¯ি’তিশীল অবস্থায় ছিল। মনে করা হয়, এর ফলে সূর্য থেকে আরও দূরের প্লুটোর সাইজের ব¯‘দের বগ গ্রহদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের পরিবর্তন হয়। এ ব¯‘রা তখন সৌরজগতের আরও ভেতরের দিকে চলে আসে। সংঘর্ষে লিপ্ত হয় গ্রহদের সাথে। এই কারণেই সম্ভবত আজ চাঁদের বুকে এত এত গর্ত।**

**জাপানের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরির গবেষকরা সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে এই ঘটনার একটি নমুনা তৈরি করেন। এতে মনে হয়েছে, সেই সব সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষগুলোকে বড় গ্রহরা নিজেদের দিকে টেনে নেয়। স্থান দেয় তাদের কক্ষপথে। সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে নতুন নতুন খ- এসে জমা হয় আগেরগুলোর আশেপাশে। এভাবেই ধীরে ধীরে তৈরি হয় বলয় গ্রুপ।**

**সূত্র: নাসা ডট গভ**

**ধূমকেতু লেজ পায় কোথায়**

**প্রশ্নঃ গ্রহ, উপগ্রহের তো লেজ থাকে না। তাহলে, ধূমকেতু লেজ পায় কোথায়?**

**উত্তরঃ ধূমকেতুর লেজের উৎপত্তি এর গাঠনিক কারণে। ধূমকেতু হচ্ছে হিমায়িত বরফ, গ্যাস ও ধূলিকণা নিয়ে গঠিত। একটি ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছাকাছি আসে, তখন এটি উত্তপ্ত হতে থাকে। এতে অবস্থিত বরফ তখন বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। ফলে, আগে বরফের ফাঁকে ফাঁকে যে ধূলিকণা আটকে ছিল, সেগুলোও মুক্তহয়ে যায়।**

**বাষ্পীভূত এই পদার্থসমূহকে সূর্যালোক ও সৌর ঝড়ের চার্জিত কণিকার ধারা ধূমকেতুর পেছন দিকে ঠেলে দেয়। এতেই তৈরি হয় এর লেজ। ধূমকেতু কী কী পদার্থে গঠিত তার উপর নির্ভর করে তার লেজের আকৃতি।**

**ধূমকেতুর লেজ হয় দুই ধরণের- ধূলিকণা ও গ্যাস আয়ন। ধূলিকণার লেজে থাকে সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রাপ্ত আকারের সমান ছোট্ট ও কঠিন কণিকা।**

**ধূমকেতুর লেজ**

**অন্য দিকে, গ্যাস পরমাণু থেকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ইলেক্ট্রনকে আলাদা করে দিয়ে আয়নিত করে ফেললে গ্যাস আয়ন লেজ গঠিত হয়। সৌর বায়ুর কারণেই এই লেজের অবস্থান হয় সূর্যের উলটো দিকে। দুই ধরণের লেজই দৈর্ঘ্যে লক্ষাধিক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।**

**ধূমকেতু (ঈড়সবঃ) সূর্য থেকে দূরে চলে গেলে এর লেজ ও কোমা (বায়ুমন্ডল) বিলুপ্ত হয়। তখন, এর কেন্দ্রে অবস্থিত পদার্থসমূহ ঘনীভূত হয়ে শক্ত পাথুরে পদার্থে পরিণত হয়।**

**সূত্রঃ হাবলসাইট**

**চাঁদের বুকে পৃথিবীর অক্সিজেন**

**চাঁদ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। পৃথিবীর মতো এর কোনো বায়ুম-ল নেই বলেই জানি আমরা। একেবারে নেই বলা অবশ্য ভুল। চাঁদের পুরো বায়ুম-লের মোট ভর যোগ করলে ১০ মেট্রিক টনের সামান্য কম হয়। পরিমাণটাকে যদি আপনার বেশি মনে হয়ে থাকে, তবে একটি তথ্য জেনে নিশ্চয়ই চমকে যাবেন। চাঁদের বায়ুম-লের এটুকু পদার্থের চাপ পৃথিবীর বায়ুম-লীয় চাপের তুলনায় ১০ কোটি কোটি গুণ কম। চাঁদের এ সামান্য বায়ুর উপ¯ি’তির পেছনেও দায়ী সূর্য। সৌর বায়ুর প্রভাবে চাঁদের পৃষ্ঠের বিভিন্ন পদার্থের খাঁজে লুকিয়ে থাকা, জমে থাকা ও শোষিত গ্যাস বের হয়ে এসে উৎপন্ন হয় এ বায়ু।**

**তবে, এক মাস হলো জানা গিয়েছে, একই সৌর বায়ুর প্রভাবে পৃথিবীর কিছু অক্সিজেনও চলে যাচ্ছে চাঁদে। এবং সম্ভবত সেটি ঘটছে পৃথিবীর বায়ুম-লের সৃষ্টির পর থেকেই। সেটা আজ থেকে কয়েক শ কোটি বছর আগের কথা।**

**বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্রায় প্রতি মাসে এক বার করে ঘটছে এটি। আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীর চার দিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। এ প্রদক্ষিণের সময় চাঁদ পাঁচ দিনের মতো অবস্থান করে পৃথিবীর বায়ুম-লের ম্যাগনেটোস্ফিয়ার অঞ্চলে। পৃথিবীর বাসযোগ্যতার পেছনে ম্যাগনেটাস্ফিয়ার এর গুরুত্ব খুব বেশি। ধূমকেতুর আকৃতির বুদবুদ ধরনের এ অঞ্চলটি পৃথিবীকে সূর্য ও মহাকাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে সুরক্ষা দেয়। তবে এ অঞ্চলের সৃষ্টির পেছনে কিন্তু ভূমিকার রাখে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে পরিচালিত কিছু প্রক্রিয়া। ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক গভীরের বহিস্থ কেন্দ্রম-লে গলিত লোহার পরিচলন গতি থেকে তৈরি হয় ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এর চৌম্বক আবরণ।**

**দিনের বেলায় ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি থাকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬ থেকে ১০ গুণ পর্যন্ত। তবে রাতের বেলায় সৌর বিকিরণের অনুপ¯ি’তিতে সেটা পৌঁছে যায় চাঁদের কক্ষপথ থেকেও বহু দূর পর্যন্ত। পৃথিবীর ব্যাসার্ধের কয়েক শ গুণ পর্যন্ত।**

**চাঁদ এ অঞ্চলটি পাড়ি দেবার সময় অবস্থান করে পৃথিবীর পেছনে, সূর্য থেকে উল্টো দিকে। সেজন্যে এ সময় এটি নিজে সরাসারি সৌর বায়ুর প্রবাহ থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু পৃথিবী থেকে নির্গত পদার্থের প্রবাহ ঠিকই এর দিকে যেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা আগেই জেনেছেন যে নাইট্রোজেন সহ কিছু গ্যাস চাঁদের দিকে চলে যাচ্ছে। তবে অক্সিজেন চলে যাবার প্রমাণ এবারই প্রথম পাওয়া গেল।**

**জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্পদার্থবিদ কেন্তারো তেরাদা বলেন, ’আমাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী ও চাঁদ শুধু একই সাথে সৃষ্টিই হয়নি, এ দুটোর রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোও চলেছে সমান্তরালে।’**

**প্রাপ্ত নতুন এ তথ্যের মাধ্যমে চাঁদের পাথরের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের একটি রহস্যের সমাধান হতে পারে। চাঁদের চারপাশে কিন্তু পৃথিবীর মতো কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। ফলে সূর্য থেকে আসা উ”চ আধানগ্র¯’ কণিকা দ্বারা এটি সরাসরি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে আগে মনে করা হত, চাঁদের উš§ুক্ত পৃষ্ঠ থেকে সংগৃহীত নমুনার সাথে সৌর বায়ুর রাসায়নিক উপাদানের মিল থাকবে। ২০০৬ সালে চাঁদের পাথরের নমুনার পরীক্ষা করে দেখা গেল, অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে বেশি । অর্থ্যাৎ, চাঁদের পৃষ্ঠের অক্সিজেনে অন্য কোনো উৎসেরও ভূমিকা আছে।**

**এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল জাপানের সেলিনি (স্থানীয় নাম কাগুইয়া) চন্দ্র যানের মাধ্যমে। ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের সময়ের মধ্যে যানটি চাঁদকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করার পরে নেমে যায় চাঁদের বুকে। কক্ষপথে থাকার সময় এটি চাঁদের বায়ুম-লে উ”চ মাত্রার ধনাÍক চার্জধারী অক্সিজেন অণু আবিষ্কার করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অক্সিজেনের মাত্রা সব সময় এক রকম ছিল না। চান্দ্র মাসের ২৭ দিনের মধ্যে শুধু ৫ দিন দেখা যাচ্ছিল এ রাসায়নিক উপাদান। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ ৫ দিন সময়ে চাঁদ থাকে সূর্য থেকে পৃথিবীর উল্টো দিকে। সুরক্ষা পায় পৃথিবীর ম্যাগনেটোস্ফিয়ার অঞ্চলের মাধ্যমে। আগেই বলেছি, সৌর ঝড় থেকে বাঁচার জন্যে চাঁদের নিজস্ব কোনো চৌম্বকক্ষেত্র নেই।**

**ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সুরক্ষা দানকারী চৌম্বক ক্ষেত্রের আকৃতি গোলাকার নয়। বরং গড়িয়ে পড়া অশ্র“র মতো। এ অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। আর লম্বা লেজ ছড়িয়ে থাকে পৃথিবীর উল্টো দিকে। এর নাম ম্যাগনেটোটেইল বা চৌম্বক লেজ। ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এর মধ্যে থাকা যে কোনো কিছু সূর্যের বিকিরণ থেকে সুরক্ষা পায়। কিন্তু বিকিরণের ধাক্কায় পৃথিবীর বায়ুম-ল থেকে কিছু কণা ঠিকই বেরিয়ে পড়ে। চলে আসে চৌম্বক লেজের প্লাজমা শিট নামের অঞ্চলে। তেরাদার মতে, খুব সম্ভবত বেরিয়ে পড়া এ অক্সিজেনের কিছু অংশ চাঁদে আশ্রয় নেয়, আর কিছু অংশ চলে যায় আন্তঃনাক্ষত্রিক জগতে।**

**সূত্রঃ সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম, নাসা হেলিওফিজিক্স, ইংরেজি উইকিপিডিয়া।**

**পৃথিবীর দ্বিতীয় চাঁদ!**

**কেমন হত যদি পৃথিবীর আকাশে থাকত আরেকটি চাঁদ? হয়ত আমরা পুরো মাস জুড়েই রাতের আকাশে জ্যোৎ¯œা উপভোগ করতে পারতাম। তবে জ্যোৎøা উপহার দেওয়ার মতো চাঁদ পৃথিবীর আকাশে না থাকলেও সম্প্রতি সৌরজগতে এমন একটি গ্রহাণু পাওয়া গেছে, যেটি পৃথিবীর সাথে আচরণ করছে চাঁদের মতোই। এটি আবিষ্কৃত হয় এ বছরের এপ্রিলে। নামটা বেশ খটমটে। ২০১৬ এইচও৩। জানা গেছে, গ্রহাণুটি আমাদের পৃথিবীর নিয়মিত সঙ্গী। ফলে দেখে মনে হচ্ছে, এটি আমাদেও চিরচেনা চাঁদের মতোই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাহলে একে কি দ্বিতীয় চাঁদ বলা যায়?**

**দ্বিতীয় চাঁদ কথাটা শুনতে দার’ণ লাগলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু একে পৃথিবীর দ্বিতীয় চাঁদ বলতে নারাজ। কিন্তু কেন?**

**আসলে এটি মূলত আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে না। ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করেই। আমাদেও চাঁদও কিন্তু পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার পাশাপাশি পৃথিবীর সাথে সাথে সূর্যকে কেন্দ্র করেও ঘুরছে। তবুও যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকেও কেšদ্র করে ঘুরছে, তাই এটি মূলত পৃথিবীর উপগ্রহ। তবে গ্রহাণুটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এ রকম নয়। এমন না যে এটি আমাদেও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এটি আসলে পৃথিবীর প্রতিবেশি হিসেবে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এর কক্ষপথটাই এমন যে, এটি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সাথে সাথে থাকছে, ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে প্রায় বৃত্তাকার পথে। আরও কয়েক শ বছরও থাকবে এ অবস্থায়।**

**নাসার সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট ¯টাডিজ গ্রহাণুটি সম্পর্কে বলেছে, ’এটি আমাদেও গ্রহ থেকে এক বেশি দূরে অব¯ি’ত যে একে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা যায় না। তবে পৃথিবীর নিকট ব¯‘দেও মধ্যে এটিই সেরা ও সবচেয়ে ¯ি’তিশীল সঙ্গী।’**

**উল্লেখ্য, এটিই একমাত্র ব¯‘ নয়, যাকে পৃথিবীর চাঁদ মনে হচ্ছে। এর আগেও এ রকম বিভিন্ন গ্রহাণু পাওয়া গেছে। তবে নাসার বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে এটিই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুর’ত্বপূর্ণ ব¯‘। সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট ¯টাডিজ এর চেয়ারম্যান পল কোডাস বলেন, ’ ২০১৬ এইচও৩ গ্রহাণুটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে লুপ আকারে ঘুরছে এবং কখনোই পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূরে যাচ্ছে না, কারণ দুটি ব¯‘ই সূর্যকে কেšদ্র করে ঘুরছে। পৃথিবীর সাথে এ রকম আচরণকারী ব¯‘কে আমরা কোয়াসি স্যাটেলাইট বা নকল উপগ্রহ বলি। ২০১৬ ওয়াইএনওয়ান০৭ নামে এ রকম আরেকটি ব¯‘ ছিল এক সময়। দশ বছর আগে এটি কিছু দিন এমন আচরণ করে পরে সরে পড়ে। তবে নতুন এই গ্রহাণুটি আলাদা। এটি প্রায় এক শতাব্দী যাবত পৃথিবীর সাথে আছে। থাকবে আরও কয়েক শতক ধরে।’**

**আমেরিকার হাওয়াই এর এক দল জ্যোর্তিবিদ প্রথমে এটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। এটি এর কক্ষপথেও প্রায় অর্ধেকটা সময় পৃথিবীর চেয়েও সূর্যের কাছে থাকে। বাকিটা সময় পৃথিবীর পেছনে পড়ে যায়। পৃথিবীর কিঞ্চিত আকর্ষণের কারণে আমদেও থেকে চাঁদেও দূরত্ব যতখানি, এটি তার একশ গুণের বেশি দূরে যেতে পারে না। তবে এটি আবার চাঁদেও দূরত্বেও ৩৮ গুণের বেশি কাছেও আসতে পারে না।**

**এখনও এর প্রকৃত সাইজ জানা সম্ভব হয়নি। তবে এর সাইজ ১২০ থেকে ৩০০ ফুটের মধ্যে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।**

**এটি ছাড়াও আরও অন্তত ৪টি গ্রহাণু আছে, যারা পৃথিবীর সাথে কোয়াসি স্যাটেলাইটের মতোই আচরণ করে। আরও এমন চারটি ব¯‘ আছে যারা সময় সময় কোয়াসি স্যাটেলাইট হয়ে যায়। এদেও মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্রুনিয়ে নামের গ্রহাণুটি। এক সময় একে পৃথিবীর দ্বিতীয় চাঁদ হিসেবে ঘোষণাই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এটি কিন্তু পুরোপুরি কোয়াসি স্যাটেলাইটও না। এটি অনেক সময় চলে যায় পৃথিবী থেকে সূর্যের উল্টো পাশে। কখনো ঢুকে পড়ে বুধ গ্রহের কক্ষপথেও ভেতরে, আবার কখনও বা চলে যায় মঙ্গল গ্রহেরও বাইরে।**

**ফলে, যাই হোক পৃথিবীর দ্বিতীয় চাঁদ বা রাতভর জ্যোৎøার ঘটনাটি গল্পেই সীমাবদ্ধ। বা¯তবে নয়।**

**সূত্র: আর্থ স্কাই ডট অর্গ**

**কোথায় গেল মঙ্গলের পানি?**

**মঙ্গল গ্রহে বেশ কিছু পুষ্টিকর পদার্থ আছে। এর মাটিতে আছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম। এগুলো বিস্তৃত আছে ভূমি থেকে ৫০ কি.মি. গভীর পর্যন্ত। প্রাথমিক দশায় গ্রহটি শুষ্ক ও সিক্ত ছিল। এ কথার পক্ষে আছে অনেকগুলো প্রমাণ। মঙ্গলের পৃষ্ঠে নদী বা হ্রদের মতো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। কক্ষপথে থাকা যান এবং পৃষ্ঠে অবতরণ করা রোভার- দুটোর পাঠানো ছবি থেকেই দেখা গেছে এই চিত্র। এছাড়া মঙ্গলের অনেকগুলো খনিজেও সামান্য পানি আছে।**

**এত কিছুর পরেও বর্তমানে বলার মতো পানি নেই মঙ্গলে। হ্যাঁ, বরফ আছে অবশ্য। আর বায়ুম-লে আছে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প। বর্তমানে কিছু কিছু অবস্থায় পৃষ্ঠে সামান্য পরিমাণ পনি উৎপন্ন হয়। তবে পানির স্থায়ী বড় কোনো আধার নেই। কিন্তু কেন নেই? বরফ বা বাষ্প থাকতে পারলে পানি থাকতে কী অসুবিধা? মঙ্গলের সব পানি গেল কোথায়?**

**জবাব খোঁজার জন্যে পাঠানো হয়েছিল মহাকাশযান ম্যাভেন (গঅঠঊঘ)। পুরো নাম মার্স অ্যাটমোসফিয়ার অ্যান্ড ভোলাটাইল ইভোলুশান। এটি মঙ্গলে পৌঁছে ২০১৪ সালে। বর্তমানে বিচরণ করছে কক্ষপথে। কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এটি হিসাব করছে, গ্রহটির বায়ুম-লের কী পরিমাণ মহাশূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এটা থেকে আমরা হিসাব করে বলতে পারব, অতীতে পরিমাণটা কেমন ছিল। ২০১৫ সালের নভেম্বরে নাসা জানায়, সৌর ঝড়ের সময় মঙ্গলের বায়ুম-ল থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে পদার্থ হারাতে থাকে। সব মিলিয়ে যানটি দেখছে, ঠিক কী পরিমাণ পদার্থ বায়ুম-লে প্রবেশ করছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে।**

**চিত্র: মঙ্গলের আকাশে মহাকাশযান ম্যাভেন**

**বায়ুম-লের ক্ষয় পরিমাপের জন্যে এটি আরেকটি কৌশলেরও আশ্রয় নিচ্ছে। এটি দেখছে, কোনো মৌলের হালকা আইসোটোপের তুলনায় ভারী আইসোটোপ আছে কত ভাগ। আমরা জানি, মহাজাগতিক রশ্মি বা সৌর ফোটনের (আলোর কণা) প্রভাবে হালকা আইসোটোপদের পক্ষে বাইরে চলে যাওয়া বেশি সহজ। ফলে, ভারী আইসোটোপরা বায়ুম-লে বেশি থাকলে বুঝতে হবে প্রাথমিক বায়ুম-লের উল্লেখযোগ্য অংশই হারিয়ে গেছে। পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড খুঁজতে যানটি নজর দিচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দিকে। আর বায়ুম-লের ক্ষয় পরিমাপের জন্যে নজর রাখছে নিষ্ক্রিয় মৌল আর্গনের ওপর।**

**বর্তমানে মঙ্গলের বায়ুম-লীয় চাপ পৃথিবীর এক শতাংশেরও কম। পুরো এক মঙ্গোলীয় বছর (প্রায় ৬৮৭ দিন) ধরে এসব উপাত্ত সংগ্রহ করে পাওয়া গেছে চমকপ্রদ তথ্য। চার শ কোটি বছর আগে এ চাপ ছিল পৃথিবীর দেড় গুণ পর্যন্ত। গবেষণা দল আরও বলছেন, গ্রহটিতে হয়ত এক সময় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ২ থেকে ৪০ মিটার গভীরতার মহাসাগরও ছিল। গবেষণা দলের প্রধান ব্র“স জ্যাকোস্কি বলছেন, ’আমরা আশানুরূপ ফল পাচ্ছি। বাইরের মহাকাশে গ্যাস হারিয়ে ফেলা-ই হয়ত মঙ্গলের জলবায়ু পরিবর্তনের একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু বড়সড় একটি কারণ অবশ্যই।**

**তবে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জেমস হেড ও ইউএস জিওলোজিক্যাল সার্ভে এর মাইকেল কার কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। মঙ্গলে বর্তমানে পানি থেকে সৃষ্ট যে বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ছে, তার ব্যাখ্যা পেতে হলে ধরে নিতে হবে, অতীতের মহাসাগরগুলোর গভীরতা ছিল কয়েক শ মিটার। মতের অমিলের পেছনে একটি কারণ হতে পারে, অতীতে মঙ্গল ছিল পৃথিবীর মতো, এ ধারণা ভুল।**

**এ বিষয়ে আরেকটি থিওরিও আছে। গ্রহটি ছিল শুষ্ক ও ঠা-া। পৃষ্ঠে পানির প্রবাহের বদলে হয়ত বরফের স্তরের নিচে ছিল নদী ও স্রোতস্বিনী। সেক্ষেত্রে বায়ুম-লে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব আরেকটু বেশি হতে হয়। আর ম্যাভেনের হিসাব থেকে সে আভাসও কিন্তু মিলছে। আরেকটি মত হল, পানি আছে গুপ্ত কোনো স্থানে। হয়ত ভূমির অনেক গভীরে। যেমন, সম্প্রতি বেশ কিছু খাদের কিনারের দিকে ডোরাকাটা দাগ দেখা গেছে। এটা হয়ত পানিভেদ্য পাথর দিয়ে গভীর থেকে আসা পানির কাজ। কার বলছেন, ’হয় পানি কোথাও লুকিয়ে আছে, নয়ত অতটা ছিলই না।’**

**সূত্রঃ স্পেস ডট কম, নিউ সায়েন্টিসট ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া**

**অলিম্পাস মনসঃ সৌরজগতের উচ্চতম আগ্নেয়গিরি**

**মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কত? ৮ হাজার ৮ শো ৪৮ মিটার বা ২৯ হাজার ২৯ ফুট। একে কি কেউ টেক্কা দিতে পারে?**

**হ্যাঁ, পারে। তবে, উঁকি দিতে হবে পৃথিবী থেকে প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলের দিকে। তাহলেই পাওয়া যাবে একটি বিশাল আগ্নেয়গিরির খোঁজ। নাম অলিম্পাস মনস (ঙষুসঢ়ঁং গড়হং)। এর উচ্চতা প্রায় ২২ কিলোমিটার বা ১৪ মাইল। হ্যাঁ, অদ্ভুত লাগলেও শুনছেন ঠিকই। এটাই সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি।**

**অর্থ্যাৎ সমুদ্র সীমা থেকে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা যত, এই দানবীয় পর্বত তার প্রায় তিন গুণ বড়।**

**অবশ্য, এটি মঙ্গল গ্রহের নবীনতম আগ্নেয়গিরি। এর উদ্ভব ঘটেছে মঙ্গলের আমাজনিয়ান যুগে। ঊনবিংশ শতক থেকেই জ্যোতির্বিদদের সাথে এর পরিচয় ছিল। শুরুর দিকে একে ডাকা হতো ঘরী ঙষুসঢ়রপধ নামে, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ অলিম্পিক তুষার। আর, ল্যাটিন ভাষায় মনস অর্থ হলো 'পর্বত'।**

**আগ্নেয়গিরিটি মঙ্গলের পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত।এর ব্যাস ৬২৪ কিলোমিটার বা ৩৭৪ মাইল যা আমেরিকার অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের প্রায় সমান। অন্য দিকে, আগে পৃথিবীর বৃহত্তম অগ্নিগিরি (ঠড়ষপধহড়) ছিল মাউনা লোয়া। অবশ্য, ২০১৩ সালে সাগরতলে আবিষ্কৃত আরেকটি বিশাল আগ্নেয়গিরি টামু ম্যাসিফ। এই আগ্নেয়গিরিটির আয়তন প্রায় ৩ লাখ ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার বা ১ লাখ ১৯ হাজার বর্গমাইল। টামু ম্যাসিফ সাগর সমতল থেকে ২ কিলোমিটার পানির নিচে অবস্থিত। জাপান থেকে ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার পূর্বে পানির নিচে অবস্থিত শাটস্কি রাইজ নামে পরিচিত একটি ভৌগোলিক প্লেট বা মালভূমিতে অবস্থিত।**

**টামু ম্যাসিফের আকার অলিম্পাস মন্সের সাথে তুলনীয় হলেও মঙ্গোলের অগ্নিগিরিটি আয়তনে মাউনা লোয়ার চেয়ে ১০০ গুণ বড়। শুধু অলিম্পাস মন্সই নয়, মঙ্গল গ্রহে মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে উঁচু আরো অনেকগুলো পাহাড় রয়েছে যেমন অংপৎধবঁং গড়হং, ইলিসিয়াম মনস, আরসিয়াম মনস ইত্যাদি । এগুলোর প্রতিটিই উচ্চতায় ১২ কিলোমিটারের উপরে। সত্যি বলতে, মঙ্গোলে এমন প্রায় ডজনখানেক আগ্নেয়গিরি আছে যারা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলোর দশ থেকে ১০০ গুণ বড়।**

**কিন্তু মঙ্গোলের পাহাড় ও অগ্নিগিরিগুলো এত উঁচু বা বিশাল কেন?**

**এর অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রহটিতে সক্রিয় প্লেট টেকটোনিকস নেই। ফলে, এর ক্রাস্ট তথা উপরিভাগ অবস্থান পরিবর্তন করে না যেমনটা হয় পৃথিবীতে। এর ফলে, আগেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নিক্ষিপ্ত ম্যাগমা একই স্থানে স্তূপীকৃত হয়ে গড়ে ওঠে বিশাল আগ্নেয়গিরি। বিজ্ঞানীদের মতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মঙ্গোলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অভিকর্ষ। অভিকর্ষ তথা কোন বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণের ক্ষমতা কম বলেই উচ্চতা বেশি পেরেছে।**

**বর্তমানে মঙ্গোলের অন্তর্ভাগ বা কোর শীতল হয়ে যাবার কারণে অলিম্পাস মনসসহ অন্যান্য আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে না।**

**তথ্যসূত্রঃ নাসা, যুগান্তর, ইংরেজি উইকিপিডিয়া, বিবিসি, স্পেইস ডট কম**

**যে যান মানুষকে মঙ্গলে নেবে**

**শুনতে অবাস্তুব লাগলেও এটাই সত্যি যে ২০২৫ সালের মধ্যেই মানুষকে মঙ্গলে বসবাস করানোর জন্যে আপ্রাণ সাধনা করে যাচ্ছেন ইলন মাস্ক ও তার বহু বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের একটি- স্পেস এক্স। এর জন্যে ব্যবহার করা হবে এ যাবত কালের সবচেয়ে বড় রকেট। ২০০৮ সাল থেকেই তাঁর স্বপ্নের এই প্রতিষ্ঠান মঙ্গলে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এবার তিনি জানালেন ঠিক কেমন যান ব্যবহার করে ৩০ লাখ মানুষকে মঙ্গলে নেওয়ার এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চান তিনি।**

**মেক্সিকোয় ইন্টান্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল কংগ্রেস কতৃক আয়োজিত এক তিনি সেমিনারে দেওয়া বক্তব্যে তিনি জানালেন, প্রতি ট্রিপে ১০০ জন করে লোক নেওয়া হবে। এক একটি ট্রিপের জন্যে সময় লাগবে ৮০ দিন করে। তিনি এই যোগাযোগ ব্যবস্থার নাম দিয়েছেন আন্ত:গ্রহ পরিবহন ব্যবস্থা (আইটিএস) ।**

**আইটিএস এর ভেতরে থাকবে একটি পুন:ব্যবহারযোগ্য বুস্টার রকেট। এটি যাত্রীবাহী মহাকাশযান মডিউলকে পৌঁছে দেবে কক্ষপথে। এরপর বুস্টার রকেট মডিউল থেকে নিজেকে আলাদা করে নেবে এবং পৃথিবীতে ফিরে এসে জ্বালানির ট্যাংকার সাথে নিয়ে আবার গিয়ে মিলিত হবে কক্ষপথে থাকা যানের সাথে।যানে জ্বালানিটুকু দিয়ে বুস্টার ও ট্যাংকার আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।ওদিকে জ্বালানি পেয়ে মহাকাশযান মডিউল মঙ্গলের দিকে শুরু করবে ৮০ দিনের যাত্রা । বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে এর সাথে থাকবে সোলার অ্যারেও।**

**প্রথম ট্রিপেই যদি যেতে চাও, তবে গুণতে পাঁচ লক্ষ আমেরিকান ডলারের মতো বড় অঙ্কের টাকা। তবে মাস্ক বলছেন, এ খরচ পরে কমে এসে এক লক্ষ ডলারে ঠেকতে পারে। এত টাকা কেন? মাস্কের হিসাব মতে, পুরো পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে খরচ পড়বে দশ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি টাকা। মাস্কের স্পেস এক্স একা এই টাকার যোগানও দিতে পারবে না, লাগবে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ। এই প্রকল্পকে মাস্ক আমেরিকা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে তুলনা করেন। অর্থ্যাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন এই প্রকল্পটি আসলেই বিশাল একটি প্ল্যান।**

**যে র্যাপ্টর রকেট ইন্জিন যাত্রীবাহী রকেট মডিউলকে বহন করে নিয়ে যাবে তা ইতোমধ্যে পরীক্ষাও করা হয়েছে। অপরদিকে বুস্টারের জ্বালানি ট্যাংকের একটি প্রাথমিক নমুনাও প্রস্তুত করা হয়েছে।**

**সবকিছু ঠিক মতো চললে আশা করা হচ্ছে, চার বছরের মধ্যে আইটিএস পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন শুরু করতে পারবে। অন্য দিকে মনুষ্যবিহীন যান ড্রাগন ক্যাপসুলকে কিন্তু মঙ্গলে পাঠানো হবে ২০১৮ সালেই। অন্তত পরিকল্পনা সে রকমই। আইটিএস লম্বায় হবে ১২২ মিটার। বুস্টারকে সক্রিয় রাখার জন্যে কাজ করবে ৪২ টি র্যাপ্টর ইন্জিন।**

**প্রথমদিকে ট্রিপগুলো হবে ২৬ মাস পর পর। সামগ্রিক প্ল্যান হচ্ছে, লাল গ্রহটিতে এ রকম হাজার হাজার যান পাঠানো হবে। এভাবে ধীরে ধীরে মঙ্গলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণেআবাস গড়ে তুলতে ৪০ থেকে ১০০ বছর লাগতে পারে। ফ্লাইট লাগবে হয়ত দশ হাজারখানা।**

**এই যানযে শুধু মঙ্গলে গিয়েই বসে থাকবে তা নয়। এটি মঙ্গলকে ছাড়িয়ে আরো দূরে যাবার চিন্তাও মাথায় রাখছে। বিশেষ নজর আছে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার প্রতি।**

**তবে মূল সমস্যা হল টাকা। অনেকেই বাঁকা চোখে বলছেন, মাস্ক এত টাকা কোথায় পাবেন? কিন্তু মঙ্গলে যাওয়ার ব্যাপারে মাস্ক কিন্তু সিরিয়াস। এক সময় স্রেফ পেপ্যালের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিলেন তিনি। সেসব ছেড়ে দিয়ে বিনিয়োগ করেছেন টেসলা কার, স্পেস এক্স, সোলার সিটি, ওপেন এআই ইত্যাদিপ মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানে। তবে সবকিছুর মূল উদ্দেশ্যে মানুষকে মঙ্গলে নিতে হবে। এই মানুষটার অতীত ইতিহাস বলে, একবার যেটায় হাত দেন তার শেষও তিনি দেখে নেন।**

**নবম গ্রহের সন্ধানে**

**১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হবার ২০০৬ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল সৌরজগতের নবম গ্রহ। গ্রহের নতুন সংজ্ঞার ফলে প্লুটো বামন গ্রহে পরিণত হয়ে পড়ায় সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াায় আটে। ১৮৪৬ সালে অষ্টম গ্রহ হিসেবে নেপচুন আবিষ্কৃত পর থেকেই সন্দেহ ছিল যে এর বাইরেও আরেকটি গ্রহ আছে, কারণ দেখা গিয়েছিল কিছু একটার প্রভাবে ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথ খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করছে। সেই গ্রহের সন্ধান করতে গিয়েই খোঁজ পাওয়া যায় প্লুটোর। আবিষ্কার করেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবাউ। তখন ইউরেনাস ও নেপচুনের অস্বাভাবিক আচরেণের জন্যে প্লুটোকে দায়ী করে একে আনুষ্ঠানিকভাবে নবম গ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**

**কিন্তু ১৯৭৮ সালে এসে বোঝা গেল যে ইউরেনাস ও নেপচুনের মতো বড় গ্রহদের আচরণকে প্রভাবিত করার সাধ্য প্লুটোর মতো ছোট্ট গ্রহের নেই। শুরু হয় দশম গ্রহের অনুসন্ধান। কিন্তু ১৯৯০ এর দশকে ভয়েজার ২ মহাকাশযানের পাওয়া হিসাব মতে দেখা যায়, মূল সমস্যা হয়েছে নেপচুনের ভর মাপতে ভুল হয়েছিল বলে।**

**এই সমস্যা এখন না থাকলেও সৌরজগতের আরো কিছু ব্যতিক্রমী আচরণের ব্যাখ্যা দিতে কিছু জ্যোতির্বিদ নতুন করে আরেকটি গ্রহ থাকার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছেন। এর কারণ হল নেপচুনের বাইরে থাকা ব¯‘সমূহের আচরণ। ১৯৯২ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত নেপচুনের বাইরে প্রায় ১৭৫০টি মাইনর প্ল্যানেট আবিষ্কৃত হয়। প্লুটো থেকেও দূরে কাইপার বেল্ট বলয়ে অব¯ি’ত এ ধরনের অনেকগুলো ব¯‘র অসংলগ্নতা ব্যাখ্যা করতে ২০১৪ সালে প্রথম আবার নবম গ্রহের কথা আলোচনায় আসে। সৌরজগৎ তৈরি হবার পর এর অবশিষ্ট উপাদান- বরফে ঢাকা অসংখ্য পাথরখ- মিলে গড়ে উঠেছে কাইপার বেল্ট অঞ্চল।**

**২০১৬ সালে নবম গ্রহ নিয়ে আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (ক্যালটেক) দুজন বিজ্ঞানী কনস্টান্টিন বাটিগিন ও মাইকেল ব্রাউন। তারা লক্ষ করেন যে কাইপার বেল্ট অঞ্চলের অনেকগুলো ব¯‘র কক্ষপথের মধ্যে বেশ মিল আছে। এ থেকে মনে হচ্ছে যে হয়ত এরা সকলেই বেশি ভরের কোনো ব¯‘ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এ থেকে তারা নতুন একটি গ্রহের কথা প্রস্তাব করেন, যার সাইজ পৃথিবীর চার গুণ এবং ভর দশ গুণ। তাদের প্রস্তাাবিত হিসাব অনুসারে এর কক্ষপথ সূর্যের ২০০ এইউ (অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা পৃথিবী থেকে সূর্যেও গড় দূরত্বের সমান) থেকে ১২০০ এইউ পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে এক বছরের পরিমাণ হবে পৃথিবীর পনের হাজার বছরের সমান।**

**চিত্র: শিল্পির তুলিতে নবম গ্রহ**

**তবে বিপক্ষেও মত আছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ^বিদ্যালয়ের অ্যান ম্যারি ম্যাডিগান ও তার সহকর্মী মাইকেল ম্যাকর্কোট দেখান যে ঐ ব¯‘দের আচেেণর ব্যাখ্যা তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই পাওয়া যায়। এই বিকল্প ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে যদি ব¯‘গুলোর মিলিত ভর পৃথিবীর ভরের কাছাকছি হয়। কি¯‘ ব্রাউন ও বাটিগিন ফের দেখান যে এক্ষেত্রে নবম গ্রহের উপ¯ি’তি মেনে নিয়ে প্রদত্ত ব্যাখ্যাই বেশি যুক্তিসঙ্গত, কেননা বর্তমান হিসাব মতে ঐ এলাকায় এই পরিমাণ ভর নেই।**

**নবম এই গ্রহটি আছে কি নেই তা নিশ্চিত করে বলার সময় এখনো আসেনি। তবে একে পাওয়া গেলেও কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাব না। আমরা খালি চোখে দেখি শুধু পাঁচটি গ্রহ- বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। তবু, নতুন এই গ্রহটির ব্যাপাওে নিশ্চিত হওয়া গেলে তা যে দারুণ খবর হবে তাতে সন্দেহ নেই।**

**সূত্র: স্পেস ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া (প্ল্যানেট বিয়ন্ড নেপচুন ও প্ল্যানেট নাইন)**

**প্লুটোর গ্রহত্ব হারানোর কাহিনী**

**২০ জানুয়ারি, ১৯৯৯। একটি খবর সবাইকে চমকে দিল। প্লুটো এখন আর গ্রহ নয়, একটি বিশাল বরফখ- মাত্র। বিবিসিসহ বড় বড় সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় এই খবর। কিন্তু প্লুটো আসলে তক্ষুনি তার গ্রহত্ব হারায়নি।**

**প্লুটো গ্রহ কিনা- এই মান নির্ধারণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক মহাকাশবিজ্ঞান সমিতির (ওঅট বা ওহঃবৎহধঃরড়হধষ অংঃৎড়হড়সরপধষ টহরড়হ) বিভাগ-৩ এর কাঁধে পড়ে।**

**১৯৩০ সালে ক্লাইড টমবাউ প্লুটো গ্রহটিকে আবিষ্কারের পর এটি সৌরজগতের নবম গ্রহের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু, বহু দিন ধরেই এটা স্পষ্ট যে প্লুটো অন্যান্য গ্রহের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখতে অক্ষম। এর কক্ষপথ পাশ্ববর্তী গ্রহ নেপচুনকে ছেদ করে গেছে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে প্লুটোর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে বহিঃস্থ সৌরজগতের নতুন আবিষ্কৃত অনেকগুলো বস্তুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মাইনর প্ল্যানেট গবেষকদের কাছে ব্যাপারটি ছিল ব্যাপক আলোচিত।**

**পরে নেপচুন গ্রহের বাইরের এলাকার কিছু বস্তুর কক্ষপথ বেশ ভালোভাবে চিহ্নিত করতে পারার পর প্লুটো বিতর্ক আরও চাঙ্গা হল। ওই বস্তু গুলোকে নাম দেওয়া হয় ট্রান্স নেপচুনিয়ান অবজেক্টস বা ঞঘঙ।**

**ওঅট এর বিভাগ-৩ ঞঘঙ এর তালিকায় প্লুটোকে এক নম্বরে রাখার ব্যাপারে চিন্তা করল। তখনও প্লুটোর গ্রহত্ব বজায় থাকল। তবে পরিচয় হল দুটো- গ্রহ এবং টিএনও একইসাথে। তখনও গ্রহের কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা ছিল না। আশা ছিল যদি গ্রহের সংজ্ঞার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছা যায়, তবে সৌরজগতের অনেকগুলো বস্তুকে নতুন করে তালিকাভুক্ত করা যাবে। অন্যথায় বিতর্কিত বা ঐতিহাসিক পদবী রেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।**

**এই অনৈক্যের সুবাদে প্লুটো আরো কয়েক বছর গ্রহত্বের সাধ নিল। কিন্তু ২০০৩ সালে আবিষ্কৃত হল ইরিস। এর আকার প্লুটোর চেয়ে বড়। প্লুটো আবারও বিতর্কে পড়ে গেল। কফিনে শেষ পেরেকগুলো ঠুকে দিতে ২০০৪ সালে আবিষ্কৃত হল হোমিয়া (ঐধঁসবধ), ২০০৫ সালে মাকিমাকি(গধশবসধশব) যারা ভর ও আয়তনে প্লুটোর কাছকাছি । অন্য দিকে ১৮০১ সালে তথা নেপচুন আবিষ্কারের ৪৫ বছর আগে আবিষ্কৃত হয় সেরেস (ঈবৎবং)। একে অর্ধ-শতক ধরে গ্রহ বলে মনে করা হত। পরে ফেলা হয় গ্রহাণুদের তালিকায়। এরও ভর ও আয়তন প্লুটোর কাছাকাছি। তাছাড়া, প্লুটোর ভর চাঁদের মাত্র ১৮ শতাংশ!**

**এখন তাহলে, প্লুটো যদি গ্রহ হয়, তাহলে এই ইরিস (যে প্লুটোর চেয়েও বড়), হোমিয়া, মাকিমাকি, সেরেস বেচারারা কী দোষ করল? অন্য দিকে, শুধু এরাই নয়, ২০০২ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে অরকাস, স্যালাসিয়া, কৌয়ার, সেডনা ইত্যাদি ৬-৭ টি উল্লেখ্যযোগ্য বস্তু আবিষ্কৃত হল।**

**প্লুটোর সাথে অন্যান্য বামন গ্রহ ও চাঁদের তুলনা**

**আন্তর্জাতিক মহাকাশবিজ্ঞান সমিতি এবার গ্রহের সংজ্ঞা নির্ধারণ করল। আরেকটি তালিকা তৈরি করল বামন গ্রহদের নিয়ে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ইরিস, হোমিয়া, মাকিমাকি ও সেরেসের সাথে প্লুটোর নাম লেখা হল বামন গ্রহদের (উধিৎভ চষধহবঃ) খাতায়।**

**সংজ্ঞায় বলা হল, গ্রহ হচ্ছে সেই সব বস্তু যারা**

**ক. যথেষ্ট ভারী হওয়ায় নিজস্ব অভিকর্ষের চাপে গোলাকৃতি পেয়েছে।**

**খ. তাপ নিউক্লিয়ার ফিউসন বিক্রিয়া ঘটানোর মত বেশি ভরবিশিষ্ট নয়।**

**গ. আশেপাশের অঞ্চল থেকে প্ল্যানেটেসিমালদের সরাতে পেরেছে। ফলে কক্ষপথের সীমানায় আর কেউ নেউ।**

**এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়।**

**আর বামন গ্রহের সংজ্ঞা হলঃ**

**সেই সব বস্তু যাদের ভর গ্রহের সমান কিন্তু গ্রহও নয়, উপগ্রহও নয়; সূর্যকে সরাসরি প্রদক্ষিণ করে; নিজস্ব আকৃতি পাবার মত অভিকর্ষের মালিক কিন্তু কক্ষপথকে অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র করতে পারেনি।**

**প্লুটো যে বামন গ্রহই থাকবে- এই সিধান্ত চূড়ান্ত হলেও কতটা স্থায়ী হতে পারে তা সময়ই বলে দেবে, কারণ এই সিধান্তে সবাই খুশি নয়। কারণটা মূলত ঐতিহাসিক।**

**সূত্রঃ ইংরেজি উইকিপিডিয়াঃ চষধহবঃ; উধিৎভথঢ়ষধহবঃ; নাসা ডট গভ**

**মহাবিশ্বের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ**

**নক্ষত্রের চেয়ে গ্রহের তাপমাত্রা কম হবে-এটাই নিয়ম। যারা তথ্যটি জানেন, তাঁরা নিশ্চয় এমন একটি গ্রহের কথা শুনলে চমকে যাবেন, যার তাপমাত্রা মহাবিশ্বের আশি ভাগ নক্ষত্রের চেয়েও বেশি। আসলেই যথেষ্ট বিস্ময়কর কথা। কেননা, গ্রহ আর নক্ষত্রের পার্থক্যের বড় একটি মাপকাঠিই হলো তাপমাত্রা। গ্রহদের তাপমাত্রা নক্ষত্রের তুলনায় সাধারণত অনেক কম থাকে বলেই এরা ফিউশন বিক্রিয়ায় শুরু করতেপারে না। তৈরি করতে পারে না নিজস্ব আলো। যেমন, সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ হলো শুক্র। এর তাপমাত্রা হলো ৪৬২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সে তুলনায় সৌর পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অনেক বেশি। ৫৫০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কেন্দ্রের দেড় কোটি ডিগ্রির ওপরের তাপমাত্রার কথা নাইবা বললাম। পৃষ্ঠের তাপমাত্রাই যে শুক্রের প্রায় ১২ গুণ! অন্য দিকে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির তাপমাত্রা শুক্রের প্রায় অর্ধেক। মাত্র ২৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।**

**কেল্ট-৯ নামের একটি তেজস্বী নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে আশ্চর্য এ গ্রহটি। নক্ষত্রের নাম অনুসারেই গ্রহটির নাম হলো কেল্ট-৯বি। একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে মাত্র দেড় দিন। কারণটাও স্পষ্ট। প্রাথমিক পরিমাপ অুনসারে নক্ষত্র থেকে এর দূরত্ব হলো মাত্র ৫১ লক্ষ কিলোমিটার (৩২ লক্ষ মাইল)। সে তুলনায় সৌরজগতের নিকটতম গ্রহ বুধ সূর্য থেকে অনেক দূরে অব¯ি’ত। দূরত্ব ৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। এ কারণেই নিজ নক্ষত্রকে ঘুরে আসতে গ্রহটির চেয়ে বুধের অনেক বেশি সময় (৮৮ দিন) লাগে।**

**কেল্ট-৯বি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ২০১৪ সালে। কিলোডিগ্রি এক্সট্রিমলি লিটল টেলিস্কোপ (কঊখঞ বা কেল্ট) যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রের আলোকেই নামটি পাওয়া। ২০১৬ সালে এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্র সম্পর্কে জানার পরে এর কথা ঘোষণা করা হয়। গত ৫ জুন তারিখে নেচার সাময়িকীতে এটি সম্পর্কে নতুন কিছু গবেষণা ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কেল্ট-৯ নক্ষত্রটি আমাদের থেকে প্রায় ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে অব¯ি’ত। গ্রহটির ভর বৃহস্পতির চেয়ে ২.৮ গুণ বেশি। কিন্তু ঘনত্ব অর্ধেক। এর কারণ হলো, পাশ্ববর্তী উত্তপ্ত নক্ষত্রের প্রভাবে নিয়মিত এর বায়ুম-লে ঝড় বয়ে চলে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা থাকে ৪,৩২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাদের শনি-বৃহস্পতির মতোই গ্রহটি একটি গ্যাস জায়ান্ট। অর্থাৎ, এতে কোনো শক্ত পৃষ্ঠ নেই।**

**ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইনসল্যান্ড এর জ্যোতির্বিদ জন্টি হরনার বলেন, ’বললে ভুল হবে না যে এই গ্রহটি মহাবিশ্বে আমাদের পরিচিত নক্ষত্রের ৮০ ভাগের চেয়েও উত্তপ্ত।’ এর তাপমাত্রা এমন মাত্রাতিরিক্ত হবার কারণ হলো নক্ষত্রের অতি কাছাকাছিতে অবস্থান। নক্ষত্রটি নিজেও আবার অনেক বেশি উত্তপ্ত। প্রায় ৯৮৯৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম বেশি উত্তপ্ত একটি নক্ষত্র। এটি একটি প্রধান ক্রমের তাপমাত্রা। অর্থাৎ, এটি এখন আমাদের সূর্যের মতোই জীবনের মধ্য বয়স পার করছে। ফিউশন বিক্রিয়ার সাহায্যে হাইড্রোজেন পুড়িয়ে হিলিয়ামে পরিণত করার মাধ্যমে আলো ও তাপ উৎপন্ন করছে।**

**গ্রহটি নিয়ে পরিচালিত গবেষণা দলের অন্যতম সদস্য ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ স্কট গাউডি বলেন, ’ভরের সাহায্যে গ্রহকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা সে অনুসারে একে গ্রহই বলতে হবে। তবে এ পর্যন্ত আমাদের দেখা কোনো গ্রহের বায়ুম-লের সাথেই এর মিল নেই। এর মূল কারণ দিবা ভাগে এর প্রচ- তাপমাত্রা।’ এত বেশি উত্তাপ নিয়ে কোনো গ্রহ টিকে থাকতে পারে ভেবেই জ্যোর্তিবিদরা অবাক। সুইনবার্ন ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ অ্যালান ডাফি বলেন, ’ অবাক হওয়ার কারণ হলো, একটি নক্ষত্র যদি খুব ভারী এবং তেজস্বী হয়, তবে বিকিরণের প্রচ-তার এর চারপাশ থেকে প্রায় সব পদার্থ উড়িয়ে নিয়ে যায়। একটি গ্রহ তৈরি হবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ পদার্থ সাধারণত অবশিষ্টই থাকে না।’**

**যে নক্ষত্রের ভর যত বেশি হয়, সেটি তত দ্র“ত ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কারণ, ফিউশন বিক্রিয়া শুরুই হয় নক্ষত্রের মহাকর্ষজনিত অন্তর্মুখী সংকোচনের কারণে। বিক্রিয়াটি শুরু হলে বাইরের দিকে একটি প্রসারণ চাপ তৈরি হয়। ফলে নক্ষত্রটি ভারসাম্যে আসে। এখন, যে নক্ষত্রের ভর বেশি, সেটিকে ভারসাম্যে রাখার জন্যে বেশি প্রসারণ চাপের প্রয়োজন হবে। ফলাফল, বেশি পরিমাণ জ্বালানি খরচ। এবং পরিণামে দ্র“ত মৃত্যু। তেজস্বী বিকিরণের কারণেই ভারী নক্ষত্রের চারপাশে কোনো গ্রহ তৈরি হয়ে থাকলেও তারও জীবনকাল ছোট্ট হয়। জ্যোতির্বিদদের মতে, কেল্ট-৯বি প্রতি সেকেন্ডে ১ কোটি কেজি ভর হারাচ্ছে! ফলে নক্ষত্রের উল্টো দিকে গ্রহটির একটি লেজ তৈরি হয়েছে। ধূমকেতুদের যেমন থাকে আর কি।**

**ফলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যখন গ্রহটি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথবা নিছক এক খ- কেন্দ্রীয় কোর পড়ে থাকবে, যদি আদৌ এর কোনো কোর থেকে থাকে। এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি, সেটা আছে কি না। গ্রহ শিকারি জ্যোতির্বিদরা সাধারণত ছোট ও কম তেজস্বী নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহ খোঁজেন। কারণ, তাদেরকে এক দিকে খুঁজে পাওয়া সোজা। আবার বাসযোগ্যতার দিক থেকেও এরা এগিয়ে থাকে। তবে এ গ্রহটি নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমাদের জানার পরিধি আরও বিস্তৃত হচ্ছে। আমরা জানছি, ওই দূর আকাশে কী কী থাকতে পারে। কোন কোন পদ্ধতিতে গ্রহদের জš§-মৃত্যু হতে পারে। গ্রহটি নিয়ে আরও জানার জন্যে শীঘ্রই আরও বাঘা বাঘা টেলিস্কোপ কাজে লাগানো হবে। এর মধ্যে রয়েছে বর্তমানে নির্মাণধীন শক্তিশালী জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপও। যেটি অক্টোবরে মহাশূন্যে (পৃথিবীর কক্ষপথে) ছুটে যাবে। মহাশূন্যের বিশালতার এক টুকরো পৃথিবীকে উপহার দেবার জন্যে। মানুষের প্রসারমান জ্ঞানের রাজ্যকে আরও প্রসারিত করার জন্যে।**

**সূত্র: নেচার, সায়েন্স অ্যালার্ট, স্যালন ডট কম উইকপিডিয়া।**

**ট্রেস -৪: সৌরজগতের বাইরে বৃহত্তম গ্রহ**

**এখন পর্যন্ত জানা মতে, সৌরজগতের বাইরে সবচেয়ে বড় গ্রহটি এক বিস্ময়। তাত্ত্বিকভাবে এর অস্তিত্বই থাকা অসম্ভব। এর নাম দেওয়া হয়েছে ট্রেস -৪ (ঞৎঊঝ-৪)। এই গ্রহটি বৃহস্পতি গ্রহের ১.৭ গুণ বড়। এর ঘনত্ব অতিমাত্রায় স্বল্প, তাই একে ধোঁয়াটে গ্রহদের (চঁভভু চষধহবঃং) কাতারে রাখা হয়েছে। এর ঘনত্ব হল প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে মাত্র দশমিক ২ গ্রাম যা প্রায় তর্নিকাঠের (ইধষংধ ড়িড়ফ) ঘনত্বের সমান।উল্লেখ্য, পৃথিবীর ঘনত্ব প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে সাড়ে ৫ গ্রামের ওপরে।**

**তথ্যটি দিলেন অ্যারিজোনার লয়েল মানমন্দিরের (ঙনংবৎাধঃড়ৎু) গবেষণা প্রদান জর্জি মান্দুশেভ। তিনি আরও বলেন, " গ্রহটির বহিঃস্থ বায়ুম-লের উপর অভিকর্ষীয় টান নগণ্য হওয়ায় সম্ভবত বায়ুম-লের কিছু অংশ ধূমকেতুর লেজের আকার ধারণ করেছে।"**

**গ্রহটির ভর অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় ঘনত্ব খুবই কম। ফলে এক্সোপ্ল্যানেটদের (সৌরজগতের বাইরের গ্রহ) জগতে এটি এক ব্যতিক্রম গ্রহ। ব্যতিক্রমের মাত্রা এতই বেশি যে বর্তমান থিওরি দিয়ে এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।**

**স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে এটি বেশি বড়। মান্দুসেভ স্পেস ডট কমকে বলেন, গ্রহটির যা ভর, তাতে এর আকার বৃহস্পতির সমান হওয়া উচিত। অথচ এটি তার দ্বিগুণ। এডওয়ার্ড ডানহাম বলেন, "ট্রেস -৪ একটি তাত্ত্বিক সমস্যা বাঁধিয়েছে। অবশ্য, সমস্যা তৈরি হওয়া ভাল। কারণ, তা সমাধান হলে আমরা নতুন জিনিস জানতে পারি।"**

**গ্রহটি পৃথিবী থেকে ১৪০০ আলোকবর্ষ দূরে, হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত। এর আরেকটি অবাক করা ব্যাপার হল, এই গ্রহ মাত্র সাড়ে তিন দিনে এর তারকাকে (এঝঈ ০২৬২০-০০৬৪৮) প্রদক্ষিণ করে ফেলে। অর্থ্যাৎ, এতে সাড়ে তিন দিনে এক বছর হয়ে যায়।**

**ট্রেস-৪ গ্রহের মাতৃ তারকাও আরেক বিস্ময়। এর বয়স প্রায় সূর্যের সমান হলেও কাজেকর্মে এগিয়ে গেছে অনেক বেশি, হয়েছে বেশি পোক্ত। ভর বেশি হওয়ায় এর বিবর্তন ঘটেছে দ্রুত। মহাকাশবিজ্ঞানের ভাষায় এটি সাবজায়ান্টে পরিণত হয়েছে। সাবজায়ান্ট বলা হয় সেই সব তারকা/নক্ষত্রকে যারা হাইড্রোজেন জ্বালানী শেষ করে লোহিত দানবে (জবফ এরধহঃ) পরিণত হবার অপেক্ষায় আছে। অন্য দিকে, আরো ৫ থেকে ৭ বিলিয়ন বছর পরে আমাদের সূর্য লোহিত দানব হতে পারবে। সেই সময় সূর্য বিস্তৃত হয়ে পৃথিবী সহ নিকটবর্তী গ্রহসমূহকে গ্রাস করে ফেলবে।**

**ট্রেস-৪ যেহেতু এর মাতৃ তারকার খুব কাছে থেকে ঘুরছে, তাই বেচারার কপাল খারাপ, ভবিষ্যতে মাতৃ তারকার জঠরে চলে যেতে হবে। মান্দুশেভ বলেন, এটা ঘটবে, যখন নক্ষত্রটি আরো প্রায় ১০০ বছর পরে লোহিত দানবে রূপান্তরিত হবে।**

**ট্রেস-৪ এর মাতৃ তারকা এঝঈ ০২৬২০-০০৬৪৮ সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ উজ্জ্বল এবং প্রতি সেকেন্ডে ৩-৪ গুণ বেশি শক্তি নির্গত করে। নিয়মানুযায়ী অপেক্ষাকৃত বড় ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত গ্যাসীয় গ্রহরা হালকা হয়। কিন্তু এই গ্রহটির আকার এত বিশাল কেন, তা ব্যাখ্যাতীত।**

**সূত্রঃ**

**১. স্পেইস ডট কম**

**২. ইংরেজি উইকিপিডিয়াঃ ঊধৎঃয**

**নতুন বাসযোগ্য গ্রহ**

**জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সন্ধান। প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে হলে আগে পাওয়া চাই পৃথিবীর মতোই প্রাণের জন্যে উপযোগী পরিবেশের উপস্থিতি। সম্প্রতি আরেকটি বর্হিগ্রহে এ রকম পরিবেশের সন্ধান পাওয়া গেল। এটি আমাদের একটি প্রতিবেশি সৌরজগতেই অব¯ি’ত। দূরত্ব আমাদের থেকে ১৪ আলোকবর্ষ। ঘুরছে উলফ ১০৬১ নামের একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে অন্তত তিনটি গ্রহ ঘুরছে। সম্ভাব্য বাসযোগ্য গ্রহটির নাম উলফ ১০৬১সি। অবস্থান নক্ষত্রটির বাসযোগ্য এলাকার ঠিক মধ্যখানে। অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মতোই। আামাদের সৌরজগতে শুক্র গ্রহ বেশি উষ্ণ, আবার মঙ্গল বেশি শীতল।**

**গ্রহটি অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল ২০১৫ সালে ডিসেম্বরেই। তবে সে সময় এত কিছু জানা যায়নি। তবে প্রাণের উপযোগী পরিবেশের প্রমাণ মিললেও এখনই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, এতে প্রাণ আছে কি না। এ বিষয়েই তাই তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে নাসার জেমন ওয়েব টেলিস্কোপ। এছাড়াও এমইটিআই (মেসেজিং এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল ইনটিলিজেন্স) এর বিজ্ঞানীরাও একই বিষয়ে কাজ করছেন।**

**সূত্রঃ সায়েন্স অ্যালার্ট**

**স্পেস ট্রেনে মহাকাশ ভ্রমণ**

**নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, ট্রেন আবার মহাকাশে চলবে কীভাবে। দীর্ঘ যাত্রার ট্রেনের একটি কাজ হল একটার পর একটা স্টেশনে লোক নামিয়ে দেওয়া। আমাদের স্পেস ট্রেনের সাথে এই ধারণার মিল আছে। তবে এটি লোক নামিয়ে দেবে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে। যুক্তরাষ্ট্রের মনট্রিলের উদ্ভাবক চার্লস বোমবার্ডিয়ের এর মাথায় এসেছে এই বুদ্ধিখানা। তিনি তার এই যানের নাম দিয়েছেন সোলার এক্সপ্রেস, যা বর্তমানে প্রচলিত অন্য যে কোনো যানের চেয়ে অনেক দ্রুত চলবে।**

**তাদের এই ট্রেন চলবে আলোর বেগের ১০০ ভাগের এক ভাগ গতিতে। আলোর বেগ যেখানে সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, সেখানে এর বেগ হবে সেকেন্ডে ১, ৮৬৪ মাইল। এই গতির ফলে মাত্র দুই দিনের কম সময়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে মঙ্গল গ্রহে, যেখানে বর্তমান প্রযুক্তিতে গ্রহটিতে যেতে সময় লাগে অন্তত ছয় মাস।**

**বোমবার্ডিয়ের বলেন, ‘মহাকাশ ভ্রমণে সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় গতি বাড়াতে ও কমাতে গিয়ে। এই কাজগুলোর জন্যে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ শক্তি, আর সেটা স্পেস ট্রেনের মতো ভারী জিনিস হলেতো কথাই নেই। তবে একবার ট্রেন বেগ অর্জন করে ফেললে এর শক্তি খরচ অনেক কমে আসে।এই ধারণা মাথায় রেখেই কাজ করবে স্পেস ট্রেন। এটা কখনো থামবে না, বরং স্পেন ওয়াগন বা স্পেস ক্যাপসুল সময় সময় এর সাথে মিলিত হবে।’**

**এটাকে এখনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি মনে হলেও তার দল এটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে মহাকাশ ভ্রমনকে নিয়ে আসা যায় হাতের নাগালে। তাদের চিন্তা হল ৫০ মিটার (১৬৪ ফুট) দৈর্ঘের অনেকগুলো সিলিন্ডার একটার সাথে একটা লাগানো থাকবে। ট্রেনের বগির মতো এই সিলিন্ডারগুলো ক্রমাগত ছুটতে থাকবে।**

**প্রথমে রকেট বুস্টার দিয়ে একে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হবে। কিছু জ্বালানি রেখে দেওয়া হবে পরে গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে। এর পরে এটি বিভিন্ন বস্তুতে (গ্রহ, উপগ্রহ) স্লিংশটের মাধ্যমে গতি বাড়িয়ে নেবে, বাড়তি জ্বালানির প্রয়োজন হবে না।এই স্লিংশটের ধারণা কিন্তু মোটেই অবাস্তব নয়। বর্তমানেই অধিকাংশ যান এ প্রক্রিয়ায় গতি বাড়িয়ে নেয়। ভয়েজার ১, ২; নিউ হরাইজন ইত্যাদি সবাই এই উপায়ে গতি বাড়িয়ে নিয়েছিল।**

**বিশাল বিশাল সোলার অ্যারের সাহায্যে স্পেস ট্রেনে সৌরশক্তি সঞ্চয় করা হবে। বিভিন্ন ধূমকেতু ও ছোট ছোট উপগ্রহ থেকে পানি সংশ্লেষের ব্যবস্থা করা হবে, যা ট্রেনে থাকা মানুষরা ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্য এখনো অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করতে হবে। যেমন গতিদানব এই ট্রেনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।তাই বলা চলে এটি হল একেবারে বেসিক আইডিয়া। এর উন্নতি করা যায় কীভাবে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।**

**ফোর্বস ম্যাগাজিনের মতে, এর সাহায্যে চাঁদে যেতে সময় লাগবে ২.১৩ মিনিট, মঙ্গলে যেতে লাগবে ৩৭ ঘণ্টা। আর সবচেয়ে দূরের গ্রহ নেপচুনে যেতে সময়ের প্রয়োজন হবে ১৮ দিন।এর সাথে মিলিয়ে নাও, ভয়েজার ২ নেপচুন পর্যন্ত পৌঁছেছিল ১২ বছরের মাথায়। নাসার মতে বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে মঙ্গলে যেতে লাগবে আট মাসেরও বেশি, স্পেস এক্সের ইলন মাস্কের মতে সময়টি একটু কম- ছয় মাসের মতো।**

**এখন শুধুই অপেক্ষা।**

**সূত্র: সায়েন্স অ্যালার্ট**

**তৃতীয় অধ্যায়: রাতের আকাশ**

**উজ্জ্বল তারাদের গল্প**

**রাতের আকাশে চোখ নিক্ষেপ করলেই হাজার হাজার তারার আলো আমাদের চোখে ধরা দেয়। হাজার হাজার বলা অবশ্য ভুল। মেঘহীন পরিষ্কার রাতের আকাশে বড়জোর ২ থেকে আড়াই হাজার তারা দেখা যায়। আবার রাতের আকাশের উজ্জ্বল বস্তুদের মধ্যে কিন্তু শুধু তারারাই আছে এমনটিও নয়।**

**চাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আমরা যাকে শুকতারা বলি সেটিওতো আসলে তারা তথা নক্ষত্র নয় বরং শুক্র গ্রহ। এই শুক্র গ্রহই রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু (চাঁদকে বাদ দিয়ে)। অপরদিকে ২য় উজ্জ্বল বস্তুও কিন্তু কোন নক্ষত্র নয়, এটি হচ্ছে অপর গ্রহ বৃহস্পতি। যাই হোক, আমরা দেখতে চাই নক্ষত্রদের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল।**

**তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানো, রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হল লুব্ধক। এরপরের অবস্থানে আছে যথাক্রমে সুহাইল, আলফা সেন্টোরি, স্বাতী, ভেগা ইত্যাদি। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রাথমিক কিছু বিষয় জেনে রাখলে সুবিধা হবে।**

**তারা ও গ্রহের পার্থক্য কী?**

**সাধারণত রাতের আকাশে আমরা যা দেখি চাঁদ ছাড়া তাদের বাকী সবাইকে আমরা তারা বলি। কিন্তু এসব বস্তুদের মধ্যে ‘তারা’ যেমন আছে, তার পাশাপাশি আছে গ্রহ, বিভিন্ন সময় থাকতে পারে ধূমকেতু বা উল্কা। আবার থাকতে পারে কৃত্রিম জিনিসও। বিমানের কথা না হয় বাদই দিলাম। রাতের আকাশে পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকেই কিছু দিন পরপর আন্তার্জাতিক মহাকাশ স্টেশন দেখা যায়।**

**তাহলে তারা কারা? তারার পরিচয় সঠিকভাবে দিতে হলে বলতে হবে তারকা বা নক্ষত্র। পৃথিবী বা অন্য গ্রহদের মত তারকাদের কিন্তু কোন কঠিন পৃষ্ঠ থাকে না। এদের জীবনের প্রাথমিক ভাগে অভ্যন্তরভাগে তাপ নিউক্লিয় সংযোজন (ফিউশন) বিক্রিয়ার মাধ্যমে অবিরামভাবে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের সূর্যসহ অন্যান্য তারকারা আলো ও তাপ উৎপন্ন করে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই রয়েছে ১০০ বিলিয়ন থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র। এদের সবার আবার আমাদের সূর্যের মত গ্রহব্যাবস্থা নেই অবশ্য। মহাবিশ্বের প্রায় ৫০% নক্ষত্রই বাইনারি স্টার সিস্টেমের সদস্য। এক্ষেত্রে দুটি নক্ষত্র একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তাহলে বলা যায় এরা একে অপরের গ্রহ?**

**না। অন্য কারো চারদিকে ঘুরলেই গ্রহ হয়ে যায় না। গ্রহদের নিজস্ব আলো তৈরি করার ক্ষমতা নেই। এরা কোন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। আমরা রাতের আকাশে খালি চোখে পাঁচটি গ্রহ দেখতে পাই। এরা হল বুধ, শুক্র (শুকতারা), মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। শনি ছাড়া এদের বাকি এরা সবাই রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধকের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল।**

**আমাদেরকে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে- সেটা হচ্ছে রাতের আকাশের বস্তুদের আপাত উজ্জ্বলতা বা অ্যাপারেন্ট ম্যাগনিটিউড (অঢ়ঢ়ধৎবহঃ সধমহরঃঁফব)। একটি বস্তুকে পৃথিবী থেকে দেখতে কতটা উজ্জ্বল লাগে সেটাই হচ্ছে তার আপাত উজ্জ্বলতার পরিমাপ। এটা বস্তুর প্রকৃত উজ্জ্বলতা বা দীপ্তি থেকে আলাদা জিনিস। কারণ, বাস্তবে বেশি দীপ্তিমান হলে দূরত্বসহ বিভিন্ন কারণে পৃথিবী কোন তারকাকে অন্য তারকার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল মনে হতেই পারে। যেমন রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক কিন্তু সবেচেয়ে বেশি দীপ্তিমান ৫০টি তারকার মধ্যেও নেই।**

**তারকার উজ্জ্বলতা পরিমাপ করা হয় লগারিদম স্কেলে। উজ্জ্বলতার মান যত বেশি হয় তার উজ্জ্বলতা হয় তত কম। এটা অনেকটা এসিডের চঐ এর মানের মত। এসিডের পিএইচ যত বেশি হয় সেটি তত কম শক্তিশালী এসিড। পৃথিবীর আকাশের উজ্জ্বলতম বস্তু সূর্যের আপাত উজ্জ্বলতা -২৭ (মাইনাস ২৭)। চাঁদসহ সৌরজগতের খালি চোখে দৃশ্যমান পাঁচট গ্রহের প্রত্যেকের আপাত উজ্জ্বলতার মান নেগেটিভ (০ এর নিচে) যা এদের উজ্জ্বলতার বড়ত্বের প্রমাণ বহন করে। চাঁদের ক্ষেত্রে এই মান -১২.৭, শুক্রের -৪.৮৯, বৃহস্পতির -২.৯৪, মঙ্গলের -২.৯১, বুধের -২.৪৫ এবং শনির ক্ষেত্রে এই মান -.৪৯। অন্য দিকে শুধু প্রথম চারটি উজ্জ্বল তারকারই আপাত উজ্জ্বলতা জিরোর নিচে।**

**আরেকটি বিষয় জেনে রাখো। আকাশের বুকে তারকাদের ঠিকানা। তোমরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সম্পর্কে জানো। পৃথিবীর দুই মেরুর ঠিক মাঝ বরাবর পূর্ব পশ্চিমে কল্পিত রেখার নাম নিরক্ষ বা বিষুব রেখা (ঊয়ঁধঃড়ৎ)। এখন আকাশকে মাথার উপরে একটি গম্বুজের মত কল্পনা করো। যদিও আসলে তারাগুলো পৃথিবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত তবু রাতের আকাশে এদেরকে এরকম কোন কল্পিত গবম্বুজে ছাঁটানো লাইটের মতই মনে হয়। এটা ধরে নিলে তারাদেরকে অবস্থান নির্ঢারণ করাও সহজ হয়ে যায়। তাহলে আকাশকে গম্বুজ কল্পনা করেছো? আমরা বোঝার জন্যে যাকে গম্বুজ কল্পনা করলাম তার সঠিক নাম খ-গোলক (ঈবষবংঃরধষ ঝঢ়বযবৎব)। এবার বিষুব রেখার উপরে খ-গোলকের মধ্যে একটি রেখা কল্পনা করো। একে বলা হয় খ-বিষুব।**

**খ-বিষুব থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত তারাদের অবস্থান অনেকটা পৃথিবীর অক্ষাংশের মতই বের করা হয়। তবে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা উত্তর ও দক্ষীনের জন্যে মানের আগে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ কথাটা যোগ করি। যেমন বাংলাদেশে অবস্থান ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। কিন্তু খ-গোলকের ক্ষেত্রে উত্তরে হলে এর আগে + চিহ্ন এবং দক্ষীনে মাইনাস চিহ্ন (-) বসানো হয়। আর এর আনিষ্ঠানিক নাম ডেক্লাইনেশন (উবপষরহধঃরড়হ) বা বাংলায় বিষুব লম্ব।**

**অন্য দিকে পূর্ব পশ্চিমের অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে দ্রাঘিমার মত একটি বিষয় আছে। এর নাম বিষবাংশ (জরমযঃ ধংপবহংরড়হ)। তবে এতে একটু ঝামেলা আছে এবং বোঝা একটু কষ্টকর। এর কারণ পৃথিবী নিজের অক্ষের সাপেক্ষে আবর্তন করার কারণে আমাদের সাপেক্ষে দ্রাঘিমা অপরিবর্তিত থাকলে খ-গোলক কিন্তু এই আবর্তনের জন্যেই আমাদের সাপেক্ষে ঘুরতে থাকে। তাই এই বিষয়টি আপাতত আলোচনা করলাম না। তাতে আমাদের আপাতত খুব বেশি অসুবিধাও হবে না, যদি আমরা আর একটি কনসেপ্ট বুঝে নেই।**

**তারাম-লী। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ আকাশের কাছাকাছি অবস্থানের কিছু তারকাদের একত্রে কোন প্রাণী বা কাল্পনিক চরিত্রের কথা কল্পনা করত। ১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সমিতি এই চিহ্নিত অঞ্চলগুলোকে কিছুটা পরিমার্জন ও পরিববর্ধন করে পুরো খ-গোলককে মোট ৮৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেকটি তারাই এই ৮৮টির কোনটিতে পড়েছে। বিখ্যাত কিছু তারাম-লী (ঈড়হংঃবষষধঃরড়হ) হল আদম সুরত বা কালপুরুষ, সপ্তর্ষীম-লী, বকম-লী ইত্যাদি।**

**তারাম-লী অ তারাভুজের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। তারাম-লী ছারাও অনেক সময় কিছু তারাকে একত্র করে কিছু প্রাণী বা জ্যামিতি চিত্র কল্পনা করা হয়। এরা হল তারাভুজ। যথাস্থানে আমরা এর প্রয়োগ দেখবো।**

**কোন তারা কোন তারাম-লীতে অবস্থিত এর অবস্থান বের করা আর কঠিন হয় না এবং পাশাপাশি এর বিষুব লম্ব জানলে আরো নিখুঁততভাবে এর অবস্থান জানা যায়। পুরোটা নিখুঁৎ হতে হলে বিষবাংশ না জানলেও হয়। জানলে সুবিধা হয় অবশ্যই। তোমরা হয়ত বিরক্ত হয়ে যাচ্ছো, তারাদের গল্প শোনানোর লোভ দেখিয়ে এসব কী প্যাঁচাল পাতানো হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আমরা এক এক করে দেখছি-**

**থুক্কু! আরো দুএকটি লাইন না বললেই নয়। বাংলাদেশের অবস্থান ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। ফলে, আমাদের মাথার উপরে খ-গোলকের +২৩ বিষুব লম্ব অবস্থিত। তাহলে আমরা যেসব তারাকে ঠিক মাথার উপরে দেখবো বুঝতে হবে এরা খ-বিষুব থেকে ২৩ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত। আর খ-বিষুব পুরো খ-গোলককে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ- এই দুই অংশ বিভক্ত করেছে।**

**পুরো আকাশ গোলক ৩৬০ ডিগ্রি। আমরা একসাথে আকাশের অর্ধেক তথা ১৮০ ডিগ্রি দেখতে পারি। ফলে দুই খ-মেরুর মাঝখানে কৌণিক দূরত্ব ১৮০ দূরত্ব। আমরা উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত হলেও বিষুব রেখার ২৩ ডিগ্রি উত্তরে থাকায় আমরা উত্তর মেরুর দক্ষিণেও ২৩ ডিগ্রি দক্ষিণের তারাও দেখবো। আর দক্ষিণে দেখবো ৯০-২৩ বা প্রায় ৬৭ ডিগ্রির মত। তবে দিগন্তের কাছাকাছি অবস্থানের তারারা নানা কারণে আমাদের চোখে আসতে বাধা পায়। এর মূল কারণ ঘর-বারি বা দূরবর্তী শহরের আলো। অর্থ্যাৎ বলতে চাইছি, আমরা উত্তর গোলার্ধে আছি বলে আমাদের দেখা সব তারকা উত্তর গোলার্ধেই অবস্থিত- এমনটি ভাবা ঠিক হবে না।**

**এবার সত্যি বলছি,উজ্জ্বল তারাদের আলো আর পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখবো না।**

**১। লুব্ধক (ঝরৎরঁং):**

**নীল এই নক্ষত্রটিই রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল। এটি মূলত দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে থাকলেও সহজেই বাংলাদেশের দক্ষিণ আকাশে দেখা যায়। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস একে দেখার সেরা সময়। বিখ্যাত তারাম-লী কালপুরুষ বা আদম সুরতের সাথে থাকে বলে একে খুঁজে বের করাও দারুণ সহজ। একে খুঁজে পেতে হলে আদম সুরতের (ঙৎরড়হ) কোমরের দিকে অবস্থিত তিনটি তারকায় গঠিত ওরিনয়ন’স বেল্ট থেকে বরাবর পেছেনে যেতে হবে। সামনে পরা উজ্জ্বল তারাটিই নির্ঘাত লুব্ধক। এর অবস্থান ক্যানিস ম্যাজর (ঈধহরং গধলড়ৎ) তারাম-লীতে।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ -১.৪৬**

**বিষুব লম্বঃ – ১৭০ (এই পরিমাপের ক্ষেত্রে ডিগ্রির ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েছি)**

**দূরত্বঃ ৮.৬৯ আলোকবর্ষ (আলোর এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্ব। নিচের সব ক্ষেত্রেই দূরত্বের এই এককটি ব্যবহার করবো আমরা)**

**২। সুহাইল (ঈধহড়ঢ়ঁং):**

**এর অপর নাম অগস্ত্য বা ক্যানোপাস। তারাটির অবস্থান খুব বেশি দক্ষিণে (বিষুব লম্ব মাইনাস ৫২) হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে একে দেখা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর। শহর থেকেতো আরো বেশি কঠিন। তবে গ্রামের পরিষ্কার আকাশে একেত খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। একে খুঁজে পাবার উপায় হল আদম সুরতে রাইজেল ও লুব্ধক তারা দুটিকে যোগ করে লুব্ধক থেকে নিচের দিকে একটি লম্ব আঁকতে হবে। লুব্ধক থেকে রিগেলের প্রায় দ্বিগুণ দূরত্ব পাওয়া যাবে ক্যানোপাসকে।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ -.৬২**

**বিষুব লম্বঃ -৫২ ডিগ্রি**

**দূরত্বঃ ৩০৯ আলোকবর্ষ**

**৩। আলফা সেন্টোরিঃ**

**এটিও দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। আলফা সেন্টোরি সিস্টেমের নক্ষত্রটি এর সঙ্গী প্রক্সিমা সেন্টোরির চেয়ে উজ্জ্বল। অথচ প্রক্সিমা সেন্টোরি সূর্যের (এবং সেই কারণে পৃথিবীরও) নিকটতম নক্ষত্র হওয়া সত্ত্বেও খালি চোখে দেখা যায় না বললেই চলে। এই নক্ষত্রকে শহর থেকে (বাংলাদেশের) দেখা প্রায় অসম্ভব। গ্রামে গেলে দেখা সম্ভব যদি নির্বিঘ্ন দিগন্ত থাকে। যেহেতু বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ দিকে সর্বোচ্চ মাইনাস ৬৭ বিষুব লম্বের তারা দেখা সম্ভব (থিওরিটিক্যালি) এবং এর বিষুব লম্ব মাইনাস ৬০ ডিগ্রি। কিন্তু দেখা যাবে খুবই সামান্য সময়ের জন্যে।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ -.২৮**

**বিষুব লম্বঃ -৬০০**

**দূরত্বঃ ৪.৩২**

**৪। স্বাতী (অৎপঃঁৎঁং):**

**উজ্জ্বল তারাদের মধ্যেই এটিই প্রথম যার অবস্থান আকাশের উত্তর গোলার্ধে। লাল দেখতে তারাটি খালী চোখে দৃশ্যমান লোহিত দানবদের মধ্যে অন্যতম । একে খুব সহজেই পাওয়া যায় সপ্তর্ষীমন্ডলীর সাহায্যে। সপ্তর্ষীর চামচ বা পেয়ালার আকৃতির অংশের লেজকে পেছন দিকে বাড়িয়ে এগোতে থাকলে প্রাপ্ত লাল বস্তুটিই স্বাতী। আরো সামনে গেলে পাওয়া যাবে আরেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র চিত্রা (ঝঢ়রপধ) যার রোল নং হচ্ছে ১৫।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ মাইনাস ০.০৫**

**বিষুব লম্বঃ +১৯০**

**দূরত্বঃ ৩৬.৭২**

**৫। অভিজিৎ (ঠবমধ):**

**৫ম উজ্জ্বল নক্ষত্রটিরও অবস্থান উত্তর গোলার্ধে। ফলে বাংলাদেশ থেকে একেও দেখা খুবই সহজ। অন্য দিকে এটি আবার বিখ্যাত তারাভুজ (অংঃবৎরংস) সামার ট্রায়াঙ্গেল এরও উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এই তারাভুজের অপর দুটি নক্ষত্র হচ্ছে শ্রবণা (অষঃধরৎ) ও পুচ্ছ (উবহবন)। গ্রীষ্মকাল শুরু হলেই এই তারাগুলো রাতের আকাশে হাজিরা দেওয়া শুরু করে। এমনকি শীতের শুরুতেও এদেরকে দেখা যায়। তবে এ সময় এরা থাকে পশ্চিমাকাশে- ডুবু ডুবু।**

**এর আপাত উজ্জজ্বলতা ০.৩। দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২৫.০৪ আলোকবর্ষ। অবস্থান খ-গোলকের +৩৮ লাইনে।**

**৬। ক্যাপেলা (ঈধঢ়বষষধ):**

**রাতের আকাশের সবচেয়ে বিখ্যাত তারাভুজ উইন্টার সার্কেল বা উইন্টার হেক্সগনের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হওয়ায় একে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় না। উইন্টার সার্কেল হচ্ছে আকাশের ৬টি খুব উজ্জ্বল তারাদের নিয়ে তৈরি একটি তারাভুজ। এর তারাগুলো হল যথাক্রমে লুব্ধক, প্রভাস, ক্যাপেলা, পোলাক্স, আলডেবারান ও রাইজেল। উজ্জ্বলতায় এদের ক্রম যথাক্রমে ১, ৮, ৬, ১৭, ১৪ ও ৭।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.০৮**

**বিষুব লম্বঃ +৪৬০**

**দূরত্বঃ ৪২.৮**

**৭। রাইজেল (জরমবষ):**

**আদম সুরতের বাম পায়ে এর অবস্থান। চিনে নিতে অসুবিধা হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। অন্য দিকে ইতোওধ্যেই দেখেছো, এটি উইন্টার সার্কেলেরও অন্যতম নক্ষত্র। আদম সুরত বা কালপুরুষের (ঙৎরড়হ) উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এটি। উপরের ছবিতে খেয়াল করো ওরিয়ন’স বেল্টের এক পাশে রাইজেল এবং আরেক পাশে বেটেজিউস অবস্থিত। তবে এটি খ-বিষুবের দক্ষিণে অবস্থিত। কিতœু তাই বলে বাংলাদেশ থেকে দেখতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধা নেই।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.১৮**

**বিষুব লম্বঃ -৮০**

**দূরত্বঃ ৮৬৩**

**৮। প্রভাস (চৎড়পুড়হ)**

**এর অপর নাম সরমা। এটি উইন্টার সার্কেলের অন্যতম নক্ষত্র। শখের জ্যোতির্বিদদের আরেকটি সহজ শিকার। লুব্ধক ও রাইজেলকে উইনগটার সার্কেলের বৃত্তচাপের অংশ মনে করে লুব্ধক্তহেকে রাইজেলযে দিকে তার উল্টো দিকে গেলেই দেখা মিলবে প্রভাসের।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৪০**

**বিষুব লম্বঃ +৫০**

**দূরত্বঃ ১১.৪৬**

**৯। আর্দ্রা (ইবঃবষমবঁংব):**

**আদম সুরতের মধ্যে থাকা একটি লাল নক্ষত্র। রাতের আকাশে চোখে পড় অন্যতম লোহিত দানব (জবফ মরধহঃ)। এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের খুব প্রিয় তারকা। কারণ, এটি যে কোন মুহূর্তে আতশবাজির মত ফেটে উঠবে। কারণ রেড জায়ান্ট দশায় থাকা তারকারা সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সমগ্র গ্যালাক্সিকে উজ্জ্বল করে তোলে। চিনে নিতে উপরের ছবি দেখো। আগেই বলেছি ওরিয়নের বেল্ট থেকে রাইজেল যে দিকে তার উল্টো দিকে। তবে এটি একটি বিষম তারা। এর মানে হল, এটি সময় সময় উজ্জ্বলতার পরিবর্তন করে। তাই অনেক সময় এর রোল নং ৯ এর বদলে ১০ হয়ে যায়।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৪৫**

**বিষুব লম্বঃ +৭০**

**দূরত্বঃ ৪৯৮**

**১০। আখেরনার (অপযবৎহবৎ):**

**এটি খুব বেশি দক্ষিণে অবস্থিত। তবু বাংলাদেশ থেকে দেখা অসম্ভব নয়। কিন্তু শহর থেকে দেখা একটু কঠিন। আদম সুরতের ডান পাশ থেকে নদীর মত দেখতে ইরিডেনাস বা যামীমন্ডলীর যাত্রা শুরু। এর একেবারে প্রান্তে আখেরনারের অবস্থান।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৪৫**

**বিষুব লম্বঃ -৫৭০**

**দূরত্বঃ ১৩৯**

**১১। হেডার (ঐধফধৎ):**

**আমাদের উত্তর গোলার্ধের জন্যে দেখা সুবিধাজনক নয়। এটি সেন্টোরাস তারাম-লীতে অবস্থিত। আর এই তারাম-লীটি সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত দেখা যায়। আমরা ২৩ ডিগ্রিতে থাকায় বুঝতেই পারছো একে দেখার জন্যে কেমন বেকায়দায় আছি আমরা। একে দেখার মত নির্বিঘ্ন দিগ্নত পাওয়া হবে সোনার হরিণ পাবার মত।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৬১**

**বিষুব লম্বঃ -৬০০**

**দূরত্বঃ ৩৯২**

**১২। শ্রবণা (অষঃধরৎ):**

**আগেই বলেছি সামার ট্রায়াঙ্গেলের অন্যতম নক্ষত্র এটি। ফলে শীত কাল আসতে থাকলে এটি আস্তে আস্তে পশিমে যেতে থাকে। এক সময় আর রাতের আকাশে একে দেখা যায় না। আবার দেখায় যায় গ্রীষ্মের শুরুতে। তবে যাদের ভোরে ওঠার অভ্যাস আছে তারা এপ্রিলেই ভোরের পূব আকাশে একে দেখতে পারো। একে খুঁজে নাও পূর্বের অভিজিতের মত সামার ট্রায়াঙ্গেলে।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৭৬**

**বিষুব লম্বঃ +৯**

**দূরত্বঃ ১৬.৭৩**

**১৩। অ্যাক্রাক্স (অপৎীঁ):**

**বাংলাদেশ থেকে একে দেখার আশা করা অনুচিত। এটি ক্রাক্স তারাম-লীতে অবস্থিত যেটি ২০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে দেখা যায় না। তাই একে নিয়ে আপাতর বেশি মাথা ঘামাতে চাই না।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৭৭**

**বিষুব লম্বঃ -৬৩০**

**দূরত্বঃ ৩২২**

**১৪। আলডেবারান (অষফবনধৎধহ):**

**আরেকটি বিখ্যাত লোহিত দানব। আদম সুরতের মাধ্যমে একেও খুব সহজেই খুঁকে নেওয়া যায়। আদমের বেল্ট থেকে প্রায় সোজা ডানে গেলেই একে পাওয়া যাবে। আর বাঁইয়ে গেলে? লুব্ধক। আগেই দেখেছো, এটিও উইন্টার সার্কেলের সদস্য। এটি বৃষম-লীর উজ্জ্বলতম তারা।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৮৭**

**বিষুব লম্বঃ +১৬০**

**দূরত্বঃ ৬৬.৬৪**

**১৫। চিত্রা (ঝঢ়রপধ):**

**সপ্তর্ষীর চামচ থেকে লেজ বরাবর বৃত্তচাপ এঁকে প্রথমে স্বাতী (রোল নং ৪) এবং আরো সামনে গিয়ে পাওয়া যাবে চিত্রাকে। এটি আবার রাশিচক্রের সদস্য কন্যাম-লীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে ঘোরার সময় ১২ মাসের বিভিন্ন সময় আকাশে বিভিন্ন তারা দেখা যায়। আর পৃথিবীর এই গতির কারণে খ-গোলকে সূর্যের একটি কাল্পনিক চলন পথ তৈরি হয় যাকে ইক্লিপ্টিক বা সূর্যপথ বলে। এই অঞ্চলে থাকা তারাম-লীগুলোকে রাশিচক্র বলে। তাই বলে কিন্তু আমরা জ্যোতির্বিদ্যা ছেড়ে জ্যোতিষবিদ্যায় চলে যাইনি। ওদের করা রাশিচক্রে হিসাব সম্পূর্ণ ভুল ও অবৈজ্ঞানিক। তাদের মতে রাশিচক্রের তারাম-লী ১২ টি, কিন্তু এর আসল সংখ্যা হবে ১৩।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ০.৯৮**

**বিষুব লম্বঃ -১১০**

**দূরত্বঃ ২৫০**

**১৬। জ্যোষ্ঠা (অহঃধৎবং):**

**কাঁকড়াবিছার মত দেখতে তারাম-লী বৃশ্চিকের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এটি। এই তারাম-লীটি সব সময় আদম সুরতের উল্টো দিকে থাকে। আদম সুরত ডুবলে এর উদয় ঘটে। বৃশ্চিকের বুক বরাবর তারাটির অবস্থান। এটি কিছুটা দক্ষিণে হলেও সহজেই বাংলাদেশ থেকে দৃশ্যমান।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ১.০৫**

**বিষুব লম্বঃ -২৬**

**দূরত্বঃ ৫৫৪**

**১৭। পুনর্বসু (চড়ষষীঁ):**

**মিথুন ম-লীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। উইন্টার সার্কেল বা হেক্সাগনের (শীতের ষড়ভুজ) একটি শীর্ষে এটি বসে আছে বলে একে চেনাও দারুণ সহজ কাজ। তবে এর সাথেই এর জমজ তারা ক্যাস্টরও বসে আছে। আগের উইন্টার সার্কীলের ছবিটি দেখো। যে তারাটির অবস্থান প্রভাসের দিকে সেটি হচ্ছে পোলাক্স, আর যেটি ক্যাপেলার দিকে আছে সেটি হচ্ছে ক্যাস্টর। ‘ক্যা-ক্যা’ দিয়ে মনে রাখতে পারো।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ১.১৬**

**বিষুব লম্বঃ ২৮০**

**দূরত্বঃ ৩৩.৭৮**

**১৮। মৎস্যমুখ (ঋড়সধষযধঁঃ):**

**একে বলা হয় নিঃসঙ্গ তারা। এর কারণ এর আশেপাশে কোন উজ্জ্বল তারা নেই। বছরের শেষের মাসগুলোতে দক্ষিণ আকাশে একে দেখা যায়।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ১.১৬**

**বিষুব লম্বঃ -২৯০**

**দূরত্বঃ ২৫.১৩**

**১৯। পুচ্ছ (উবহবন):**

**এর আগেও এর কথা বলেছি। অভিজিৎ ও শ্রবণার সাথে মিলে এটি গড়ে তুলেছে সামার ট্রায়াঙ্গেল। এটি আবার বিখ্যাত তারাম-লী বকম-লীতে অবস্থিত। প্রথম আবিষ্কৃত ব্ল্যাক হোল সিগ্নাস এক্স-১ এই বকম-লীর দিকে অবস্থিত।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ১.২৫**

**বিষুব লম্বঃ ৪৫০**

**দূরত্বঃ ১৪১২**

**২০। মিমোসা (গরসড়ংধ):**

**এটিও দক্ষিণে অবস্থিত। ফলে বাংলাদেশের জন্য এটি সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। এটি আবার বিষম তারা। এর গড় উজ্জ্বলতা ১.২৫ হলেও এটি ১.২৩ থেকে ১.৩১ এর মধ্যে উঠা-নামা করে।**

**আপাত উজ্জ্বলতাঃ ১.২৫**

**বিষুব লম্বঃ -৬০০**

**দূরত্বঃ ২৭৯**

**রাতের আকাশের অসংখ্যা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র ২০টি নিয়ে আমরা আলাপ করলাম। অন্য কোম সময় বাকি তারাদের গল্প করার সুযোগের আশা রেখে আজকে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।**

**সূত্রঃ আব্দুল জব্বার/তারা পরিচিতি, স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ ডট কম, আর্থস্কাই ডট অরগ, আইজ অন দ্যা স্কাই, আইঅ্যান্ডিপাথ ডট কম।**

**অন্য গ্রহের আকাশ**

**- আচ্ছা পৃথিবীর বায়ুম-ল না থাকলে আকাশ কেমন হত?**

**- পৃথিবীতে আসা সূর্যের আলো আসলে ৭টি রঙে গঠিত। এই আলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এসে বায়ুকণার সাথে ধাক্কা লেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে নীল রঙ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে আমাদের পৃথিবীর আকাশ নীল দেখায়। কিন্তু বায়ুম-ল না থাকলে আকাশ হত কালো। একদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে থাকত। এরা আলো পুরো আকাশ দখলে রাখত না। দিনেও তারা দেখা যেত।**

**- তাহলে কি চাঁদের আকাশ দেখতে কালো? ওখানেতো বায়ুমন্ডল নেই। অন্য গ্রহ বা উপগ্রহের আকাশ দেখতে কেমন? চাঁদ বা অন্য গ্রহের রাতের আকাশ কি পৃথিবীর আকাশের মত এত সুন্দর? অন্যান্য গ্রহকে যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায়, তেমনি পৃথিবীকে কি সেই গ্রহগুলোকে দেখা যায়?**

**এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে আজকের আয়োজন।**

**আগে সংক্ষেপে পৃথিবীর আকাশ সম্পর্কে একটু বলে নিই। পৃথিবীর রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু চাঁদ। তবে এরপরের অবস্থানে কিন্তু লুব্ধক নয়। লুব্ধক সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কিন্তু গ্রহদের চেয়ে পিছিয়ে। খালি চোখে সৌরজগতের মোট পাঁচটি গ্রহ আমরা দেখতে পাই। এরা হল বুধ, শুক্র (শুকতারা), মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। শনি ছাড়া এদের বাকি সবাই লুব্ধকের চেয়েও উজ্জ্বল। তবে সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিকভাবে দেখা যায় শনি ও বৃহস্পতিকে। বুধ ও শুক্র সব ঋতুতে থাকে না, থাকলেও কয়েক ঘণ্টার বেশির জন্যে নয়।**

**আচ্ছা, এবার তাহলে পৃথিবির বাইরে উঁকি দেই।**

**পৃথিবীর বাইরে একমাত্র চাঁদের আকাশকেই সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা ও ছবি তোলা গেছে। অন্য কোথাও মানুষের পা পড়েনি বলে আকাশ দেখতে কেমন হবে তা জানার জন্যে নির্ভর করতে হয় পরোক্ষ উপায়ের উপর। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপায় হচ্ছে মহাকাশযানের পাঠানো তথ্য। যেমন মঙ্গল গ্রহ, শুক্র এবং শনির উপগ্রহ টাইটানের আকাশের তথ্য এভাবে পাওয়া গেছে। আকাশের চিত্র কেমন হবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বায়ুম-ল আছে কি নেই, থাকলে তার উপাদান কী, মেঘ আছে কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আকাশের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যে আকাশগুলো সরাসরি দেখা যায়নি এসব তথ্যের মাধ্যমে তাদের আকাশ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।**

**বুধ গ্রহের আকাশঃ**

**বুধ গ্রহের কোন বায়ুম-ল নেই। ফলে সূর্যের আলোকে বিক্ষিপ্ত করার মতও কেউ নেই। দিনের বেলায়ও তাই কালো মহাকাশ চোখে পড়বে। সাথে থাকবে কিছু বিন্দু বিন্দু তারার আলো। তবে সূর্যের কারণে একটি বিন্দু হবে বেশ বড়। এটি হল সূর্য। পৃথিবী থেকে দেখার তুলনায় সূর্যের আকার হয় গড়ে আড়াই গুণ এবং উজ্জ্বলতা হয় ৬ গুণ পর্যন্ত।**

**পৃথিবীর রাতের আকাশের মত বুধের রাতের আকাশকে কোন চাঁদ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত করতে পারে না। কারণ বুধের কোন উপগ্রহই নেই। এখানে রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম বস্তু শুক্র। পৃথিবীর চেয়ে বুধের আকাশে শুক্রকে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। বুধ গ্রহে এর আপাত উজ্জ্বলতা (-৭.৭ বা মাইনাস ৭.৭) যেখানে পৃথিবীতে এই মান (-৪.৬)। তোমরা জানো, আপাত উজ্জ্বলতার মান যত কম হয়, বস্তু তত উজ্জ্বল হয়। যেমন চাঁদের আপাত উজ্জ্বলতা (-১২.৭) এবং সূর্যের (-২৭)।**

**বুধ থেকে আমাদের পৃথিবী এবং চাঁদও ভালো মত চোখে পড়ে। আপাত উজ্জ্বলতা যথাক্রমে (-৫) ও (-১.২)। পৃথিবীতে যেমন দেখা যায়, তেমনি বুধ থেকে বাকি গ্রহদেরও দেখায় যায়, তবে অনেকটা অনুজ্জ্বল।**

**পৃথিবীর উত্তর মেরু বরাবর যেমন ধ্রুবতারার অবস্থান তেমনি বুধ গ্রহের দক্ষিণ মেরুতে একটি ধ্রুব তারা আছে। এর নাম আলফা পিকটোরিস। কখনও কখনও বুধ গ্রহে একই দিনে দুইবার সূর্যোদয় দেখা যায়। কেন তা আমরা অন্য কোন সময় ব্যাখ্যা করব।**

**শুক্র গ্রহের আকাশঃ**

**পৃথিবীর আকাশে শুক্র (শুকতারা) খুবই জনপ্রিয় বস্তু। কিন্তু এর নিজের আকাশ খুবই নিষ্প্রভ। দিনের বেলায়ও সূর্য দেখা যায় না। রাতেও তারারা মিটিমিটি করে না। এর কারণ গ্রহটির বায়ুম-লে অস্বচ্ছ সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতি। সোভিয়েত মহাকাশযান ভেনেরার মতে শুক্র গ্রহের আকাশ দেখতে কমলা রঙের। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তন করে বলে এতে সূর্য ওঠে পশ্চিমে, অস্ত যায় পূবে। এটিই আবার সেই অদ্ভুত গ্রহ যাতে বছরের চেয়ে দিন বড়।**

**গ্রহটির বায়ুম-ল পেরিয়ে উপরে উঠলে চাঁদ, পৃথিবী এবং বুধ গ্রহকে বেশ ভালো উজ্জ্বল দেখা যায়।**

**চাঁদের আকাশঃ**

**চিত্রঃ ১৯৬৮ সালে চাঁদের কক্ষপথ থেকে তোলা পৃথিবীর ঐতিহাসিক ছবি**

**চাঁদেরও কোন বায়ুম-ল নেই। তাই এর আকাশ দেখতে কালো। তবে দিনের বেলায় সূর্য খুব উজ্জ্বল থাকার কারণে তারাদেরকে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে সূর্যের আলোর দিককে কোনভাবে ঢেকে রাখলে তারা দেখা সম্ভব। এর কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমরা জানি, আলোর উৎসের আশাপাশের বস্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে আলোকে হাত দিয়ে আড়াল করে রাখলে আলোক উৎসের পাশের বস্তু সহজেই দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে সূর্যের দিককে হাত দিয়ে ঢেকে রাখলেও তারা দেখা যাবে না। কারণ বায়ুম-লের কারসাজিতে আলো সব দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে সূর্যকে দেখতে যেমন লাগে, চাঁদ থেকেও তেমনই লাগে। কিছুটা বেশি উজ্জ্বল এবং সাদা রঙের- যেহেতু বায়ুম-ল অনুপস্থিত।**

**চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখতে কেমন লাগে? খুশির খবর হচ্ছে, চাঁদের আকাশের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু কিন্তু পৃথিবীই। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় লাগে, চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তার চার গুণ মনে হয়। পৃথিবীর আকাশে যেমন চাঁদ বড় ছোট হয়, তেমনি চাঁদ থেকে দেখতে পৃথিবীও বড় ছোট হয়। কারণ দুজনেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। তবে পৃথিবীতে যখন চাঁদের পূর্ণিমা, চাঁদে তখন পৃথিবীর অমাবশ্যা। একইভাবে চাঁদের অমাবশ্যার সময় পৃথিবী চাঁদকে দেয় জ্যোৎস্না শোভিত রাত। তার মানে জ্যোৎস্না চাঁদের একক সম্পত্তি নয়। সুযোগ দিলেও পৃথিবীও তার দান ফিরিয়ে দিতে পারে।**

**চিত্রঃ চাঁদে পৃথিবির উদয় ঘটছে। একে আমরা নাম দিতে পারি ‘ভূদয়’। ইংরেজিতে বলে আর্থরাইজ**

**আমরা জানি, চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকে এক বার ঘুরতে যে সময় নেয় তাতে পৃথিবীকে এক বার ঘুরে আসে। ফলে আমরা পৃথিবী থেকে সব সময় চাঁদের একটি পৃষ্ঠই দেখতে পাই। সর্বোচ্চ অবশ্য ৫৮% পর্যন্ত দেখা যায়। এর অনিবার্য কারণ হিসেবে চাঁদেরও শুধু পৃথিবীর নিকট পৃষ্ঠ থেকেই পৃথিবীকে দেখা যায়। অন্য পাশ থেকে দেখা যায় না।**

**পৃথিবীতে বসে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখি, যখন সূর্যের আলোতে তৈরি পৃথিবীর ছায়া চাঁদের গায়ে গিয়ে পড়ে। এই সময় পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে। এই সময় চাঁদে ঠিক কী ঘটে? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, এই সময় চাঁদ থেকে কেউ পৃথিবীর কারণে সূর্যকে দেখতে পাবে না। তার মানে চাঁদে তখন হবে সূর্যগ্রহণ। মজার ব্যাপার, তাই না! চাঁদ থেকে পৃথিবীকে তুলনামূলক অনেক বড় দেখায় বলে সূর্যগ্রহণের সময়ের দৈর্ঘ্যও হবে লম্বা।**

**চিত্রঃ পৃথিবীতে চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝে।**

**পৃথিবীতে যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন তাহলে চাঁদে কেমন দেখাবে? এটা তেমন দারুণ কিছু হবে না। কারণ পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে। ফলে এ সময় চাঁদ সূর্যের আলোকে বাধা দিয়ে পৃথিবীর উপর ছায়া ফেলতে চেষ্টা করবে। এ কারণে পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণ হবে ঠিকই। কিন্তু চাঁদের আকাশ থেকে দেখলে পৃথিবী যেহেতু চার গুণ বড় তাই চাঁদের আকাশের পৃথিবী খুব একটা ঢাকা পড়বে না। একটি গলফ বল ১৫ ফুট দূরে সূর্যের আলোর যেমন ছায়া ফেলবে, তেমন প্রতিক্রিয়াই শুধু চাঁদ তৈরি করতে পারবে। তবু এক কথায় বলা চলে, যখনি পৃথিবীতে কোন ধরনের গ্রহণ (ঊপষরঢ়ংব) ঘটে, তখন চাঁদেও একটি গ্রহণ হয়ে থাকে।**

**চিত্রঃ নাসার অ্যাপলো ১৭ মিশন কমান্ডার ইউজিন সারনান চাঁদকে পেছনে রেখে পোজ দিচ্ছেন। চাঁদে যাওয়া মোট ১২ ব্যক্তির মধ্যে তিনি সবার শেষে ফিরেছেন।**

**মঙ্গল গ্রহের আকাশঃ**

**মঙ্গল গ্রহের একটি পাতলা বায়ুম-ল আছে, তবে তা প্রচুর ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। এতে করে আলো অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় আকাশ খুব উজ্জ্বল থাকে। কোন তারা দেখায় যায় না। মঙ্গলের আকাশের সঠিক রঙ জানা একটু কষ্টকর। তবে আগে যতটা মনে হত, মঙ্গলের আকাশ ততটা গোলাপী নয়। এর রঙ কমলা থেকে লালের কাছাকাছি। মঙ্গলের আকাশে সূর্যকে পৃথিবীর আকাশের তুলনায় ছোট দেখা যায়। এটাইতো হওয়া উচিত, তাই না? কারণ মঙ্গলতো পৃথিবী থেকেও সূর্যের দূরে।**

**মঙ্গলের দুটো ছোট্ট চাঁদ (উপগ্রহ) আছে- ফোবোস ও ডিমোস। ফোবোসকে সূর্যের অর্ধেকের চেয়ে ছোট দেখায়। আর ডিমোস একেবারে প্রায় বিন্দুর মত। সত্যিকারের সূর্যগ্রহণ বলতে যা বোঝায় তা এই চাঁদরা মঙ্গলের আকাশে তৈরি করতে পারে না। বরং সূর্য ও মঙ্গলের সাথে একই রেখায় এলে এদেরকে সূর্যের উপর দিয়ে চলে যেতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে গ্রহণ না বলে বলা হয় ট্রানজিট।**

**মঙ্গল থেকে পৃথিবীকে দেখতে ডাবল স্টারের মত লাগে। এর কারণ পৃথিবীর সাথে চাঁদের উপস্থিতি। পৃথিবী ও চাঁদের সর্বোচ্চ আপাত উজ্জ্বলতা হয় যথাক্রমে (-২.৫) ও (+০.৯)। তবে শুক্র গ্রহকে আরেকটু উজ্জ্বল দেখায়। এর আপাত উজ্জ্বলতা হয় (-৩.২) পর্যন্ত। মনে আছে নিশ্চয়ই, আপাত উজ্জ্বলতার মান কম হলে বস্তু হয় অপেক্ষাকৃত বেশি উজ্জ্বল। আর আগে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে দিলে বড় সংখ্যার মান হয়ে যায় ছোট। তবে মঙ্গলের চাঁদ্গুলো থেকে মঙ্গলকে বিশাল বড় দেখায়। পূর্ণিমার চাঁদের সময় চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি ফোবোস ও ডিমোস থেকে মঙ্গলকে যথাক্রমে তার ৬৪০০ ও ১০০০ গুণ বড় দেখায়!**

**মঙ্গলের পরে সৌরজগতে আছে গ্রহানুপুঞ্জ। আপাতত এদের নিয়ে বলার মত বিশেষ কিছু নেই। তাই আমরা চলে যাচ্ছি বৃহস্পতি গ্রহে। তবে এতক্ষণ যাদের কথা বললাম- চাঁদ অথবা মঙ্গল বা অন্য গ্রহরা; এদের উপর আমরা অবতরণ করতে পারব (শুক্রের ভয়াবহ বায়ুম-লীয় চাপে মারা পড়ব যদিও)। কিন্তু বাকি গ্রহরা হল গ্যাস দানব (এধং মরধহঃ) অথবা তুষার দানব (রপব মরধহঃ)। সাধারণত এদের কোন কঠিন পৃষ্ঠ থাকে না যেখানে আমরা কখনও অবতরণের চিন্তা করতে পারি।**

**বৃহস্পতির আকাশঃ**

**বৃহস্পতির বায়ুম-লের ভেতর থেকে কখনও কোনভাবে ছবি তোলা হয়নি। তবে মনে করা হয় এর আকাশও পৃথিবীর আকাশের মতই নীল, তবে বেশ অনুজ্জ্বল। এতে সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা ২৭ গুণ কম। আমরা এখন জানি, শনি ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি গ্রহের বলয় আছে, তা খুবই সরু অবশ্য। বৃহস্পতির এই বলয় এর বিষুব অঞ্চল থেকে দেখা সম্ভব। বায়ুম-লের আরও নিচের দিকের এলাকা বিভিন্ন মেঘ ও রঙের কুয়াশায় পরিপূর্ণ। ফলে এদিকে সূর্যের আলো আসতে বাধা পায়। পৃথিবীর তুলনায় এখানে সূর্যকে চারভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট দেখায়।**

**সূর্যের পরে বৃহস্পতির আকাশে উজ্জ্বল বস্তুরা হল এর প্রধান চারটি চাঁদ। এরা হল আয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন বলে এদের নাম গ্যালিলীয় চাঁদ। এর মধ্যে আয়ো আমাদের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। তবে কিছুটা কম উজ্জ্বল। কিন্তু আবার কোন মাতৃ গ্রহ থেকে দেখা এর চাঁদদের মধ্যে আয়োকেই সবচেয়ে বড় দেখায়। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হল গ্যানিমিড। এটি আয়ো ও ইউরোপার কাছাকাছি মানের উজ্জ্বল। তবে দেখতে আয়োর চেয়ে ছোট- অর্ধেক। তবে ইউরোপার চেয়ে অবশ্য দ্বিগুণ দেখায়। ক্যালিস্টো এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরে। ফলে এটি দেখতে আয়োর চারভাগের এক ভাগের মত। আমাদের চাঁদের মত এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বৈশিষ্ট্য (যেমন এবড়োথেবড়ো পৃষ্ঠ) চোখে পড়ে না।**

**চিত্রঃ বৃহস্পতির আকাশে আয়ো এবং ইউরোপা**

**এরা আমাদের চাঁদের মতই সূর্যগ্রহণ ঘটাতে সক্ষম। বরং আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা এই কাজটি বেশিই করে। এর কারণ হচ্ছে বৃহস্পতির কক্ষীয় নতি পৃথিবীর চেয়ে অনেক অল্প। অ্যামালথিয়া ছাড়া এর ভেতরের দিকের বাকি উপগ্রহদেরকে দেখতে তারার মত দেখায়। অ্যামালথিয়া মাঝে মাঝে বড় হয়ে প্রায় ক্যালিস্টোর সমান হয়ে যায়। তবে বৃহস্পতির আকাশে এরা সবাই যে কোন তারার চেয়ে উজ্জ্বল থাকে। আরও দূরের উপগ্রহদের মধ্যে হিমালিয়া ছাড়া কাউকে দেখা যায় না।**

**এবার আসি বৃহস্পতির উপগ্রহদের আকাশে। এদের সংখ্যা আপাতত ৬৭ এদের কারোই বলার মত বায়ুম-ল নেই। ফলে আকাশ হয় কালো। এদের আকাশে বৃহস্পতিকে অসাধারণ দেখায়। অভ্যন্তরীণ উপগ্রহদের এর সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ আয়োতে বৃহস্পতিকে আমরা চাঁদকে যেমন দেখি তার ৩৮ গুণ বড় দেখায়! সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ মেটিস। এখানে বৃহস্পতিকে দেখা যায় আমাদের চাঁদের ১৩০ গুণ! মেটিসে বৃহস্পতি সূর্যের আলোর ৪% পর্যন্ত উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত করতে পারে। বলে রাখা ভাল, আমাদের চাঁদ পৃথিবীর আকাশে সূর্যের চেয়ে ৪০০ গুণ অনুজ্জ্বল।**

**শনি গ্রহের আকাশঃ**

**আগেই বলেছি শনি গ্রহেরও কোন কঠিন পৃষ্ঠ নেই। এর বায়ুম-লের উপুরের দিকে থেকে আকাশ সম্ভবত নীল দেখাবে। তবে আরও নিচের দিকে আকাশের রঙ দেখাবে হলুদাভ। শুধুমাত্র অনুসূর (সূর্যের নিকটতম) অবস্থানে থাকার সময় এর উত্তর গোলার্ধ সূর্যকে দেখার সুযোগ পায়। এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে বায়ুম-লের উপরিভাগ থেকে এর বলয় দেখা যায় ভালোভাবেই।**

**শনির উপগ্রহরা রাতের আকাশকে খুব বেশি সুন্দর করে তুলতে পারে না, যদিও এখন পর্যন্ত এর ৬২ টি উপগ্রহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় চাঁদ টাইটান। এটি শনির আকাশে আমাদের চাঁদের অর্ধেকের মত লাগে। এর আপাত উজ্জ্বলতা (-৭)। তবে দূরত্ব বেশি হবার কারণে টাইটান শনির সবচেয়ে অনুজ্জ্বল চাঁদ। এর চেয়েও উজ্জ্বল দেখায় মাইমাস, এনচেলাডাস, টেথিস, ডায়োনে ও রিয়া। বাইরের দিকের উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র ফোবেকে দেখা যায়।**

**আমাদের চাঁদের মতই শনির ভেতরের দিকের চাঁদেরাও শনিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয় ততক্ষণে শনি নিজের অক্ষের উপর আবর্তন শেষ করে। ফলে এদের এক পৃষ্ঠ থেকেই শুধু শনিকে দেখা সম্ভব। তবে ভেতরের দিকের চাঁদ্গুলোতে শনি একটি দেখার মত জিনিস বটে! শনির উপগ্রহ প্যানে শনিকে আমাদের চাঁদে চেয়ে ১০৪ গুণ বড় দেখায়। তবে শনির উপগ্রহগুলো থেকে এর বলয় খুব ভালোভাবে দেখা যায় না। এর কারণ এরা শনির বলয়ের সাথে একই সমতলে অবস্থান করছে। অন্য দিকে বলয়ের পুরুত্বও কিন্তু খুব বেশি না।**

**সৌরজগতের উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র শনির উপগ্রহ টাইটানেরই পুরু বায়ুম-ল আছে। এর পৃষ্ঠ থেকে আকাশকে দেখতে বাদামী বা গাঢ় কমলা রঙের দেখায়। টাইটান সূর্যের আলো পায় পৃথিবীর ৩০০০ ভাগের এক অংশ। ফলে দিনের বেলায় এর আকাশ দেখায় পৃথিবীর গোধূলির মত। পৃথিবী ছাড়া পুরো মহাবিশ্বে এখন পর্যন্ত জানা মতে শুধু টাইটানেই রংধনু তৈরি হতে পারে। শনিকে দেখা যায় শুধু বায়ুম-লের উপরিভাগের দিকেই।**

**অন্য দিকে এনসেলাডাস উপগ্রহে শনিকে তুলনামূলক অনেক অনেক ভালো দেখা যায়। আমাদের চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি তার তুলনায় এখান থেকে শনিকে ৬০ গুণ বড় দেখা যায়। তবে আমাদের চাঁদের মতই এর মাত্র এক পৃষ্ঠ থেকেই শনিকে দেখা সম্ভব। এর আকাশে শনিকে বড়- ছোট হতেও দেখা যায়। এখান থেকে শনির আরও কিছু উপগ্রহকেও দেখা যায়। এর মধ্যে মাইমাসকে দেখা যায় আমাদের চাঁদের সমান।**

**চিত্রঃ শিল্পির হাতের তুলিতে শনির উপগ্রহ এনসেলাডাসের আকাশ**

**শনির দক্ষিণ মেরু বরাবর আকাশে আমাদের ধ্রুবতারার মত একটি তারা আছে। এর নাম ডেল্টা অক্টানটিস।**

**ইউরেনাস গ্রহের আকাশঃ**

**এই গ্রহটির আকাশ খুব সম্ভব হালকা নীল। এর হালকা বলয় পৃষ্ঠ থেকে দেখা যাওয়ার কথা নয়। ইউরেনাসের দক্ষিণ ও উত্তর দুই মেরুতেই একটি করে মেরু তারা (চড়ষব ংঃধৎ) বা ধ্রুবতারা আছে। এরা হল যথাক্রমে ১৫ ওরাইওনিস ও সাবিক। দুটোই আমাদের উত্তর মেরুর ধ্রুবতারার চেয়ে অনুজ্জ্বল।**

**এর পৃষ্ঠ থেকে কোন উপগ্রহকেই আমাদের চাঁদের মত বড় দেখা যায় না, যদিও এখন পর্যন্ত এরা সংখ্যা ২৭। তবে এরা সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় দারুণ একটি দৃশ্য ঠিকই তৈরি হয়।**

**নেপচুনের আকাশঃ**

**নেপচুন সৌরজগতের সর্বশেষ গ্রহ। অনেকটা ইউরেনাসের মত এর আকাশ। তবে এটি হালকার বদলে উজ্জ্বল নীল। এরও বলয় আছে। তবে তা খুবই সরু হওয়াতে গ্রহের পৃষ্ঠ থেকে দেখা যায় না। সূর্যের পরে এর আকাশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু উপগ্রহ ট্রাইটন। একে আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট দেখায়। আরেকটি চাঁদ প্রোটিয়াস দেখতে আমাদের চাঁদের অর্ধেক। নেপচুনের সবচেয়ে বড় চাঁদ হল ট্রাইটন। এর হালকা বায়ুম-ল আছে। তবু আকাশ কালোই দেখায়। এর আকাশে নেপচুনকে এক জায়গায় স্থির দেখায়। কেন বলতো? এতক্ষণের আলাপ থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।**

**প্লুটোর আকাশঃ**

**প্লুটো এখন আর গ্রহ নয় বরং বামন গ্রহ (উধিৎভ ঢ়ষধহবঃ)। প্লুটো সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় ১৩০ গুণ দূরে। তবু এখানে সূর্য মোটামুটি ভালোই উজ্জ্বল। এখানে আমাদের চাঁদের চেয়ে সূর্যের উজ্জ্বলতা ১৫০ থেকে ৪৫০ গুণ। এর বায়ুম-লে আছে নাইট্রোজেন, মিথেন ও কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস। প্লুটো এর বৃহত্তম উপগ্রহ শ্যারনের সাথে মহাকর্ষীয় বন্ধনে আটক। এ কারণে এরা সব সময়ে একে অপরের দিকে মুখ করে থাকে।**

**চিত্রঃ প্লুটোর আকাশে সূর্য (উপরে ডানে) ও উপগ্রহ শ্যারন**

**সৌরজগতের বাইরের আকাশঃ**

**বহির্গ্রহ মানে সৌরজগতের বাইরের গ্রহ। ৬৫ থেকে ৮০ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত সূর্যকে খালি চোখে দেখা যাবে। মাত্র ২৭ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত একটি নক্ষত্রে নাম বিটা কোমি বেরানেসিজ। আমাদের আকাশে এটি খুব অনুজ্জ্বল। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র জগৎ আলফা সেন্টোরি (প্রক্সিমা সেন্টোরি নক্ষত্রও একই বাইনারি জগতের অংশ)। এই অঞ্চল থেকে সূর্যকে দেখা যাবে ক্যাসিওপিয়া তারাম-লীতে। উজ্জ্বলতা হবে আমাদের রাতের আকাশের ৬ষ্ঠ উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্যাপেলার মত।**

**আজকের মত এখানেই রাখলাম।**

**সূত্রঃ ইয়াকুভ পেরেলম্যান/অ্যাস্ট্রোনমি ফর এন্টারটেইনমেন্টইংরেজি উইকিপিডিয়া (এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল স্কাই), অ্যানসারস ডট কম।**

**চতুর্থ অধ্যায়: পৃথিবী**

**বড় হলো দিনের দৈর্ঘ্য**

**আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কেবলই মনে হতে থাকে, সময়গুলো যেন দ্র“ত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এক একটি বছর যেন ফুড়–ৎ করে উড়ে যাচ্ছে। এর পেছনে অবশ্য গাণিতিক ব্যাখ্যা আছে। আমরা যখন ছোট থাকি, এই ধরুন বয়স যখন চার, তখন মাত্র এক বছর আমাদের পুরো জীবনের চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু বয়স যখন পঁচিশ, তখন এক বছর হয় পঁিচশ ভাগের মাত্র এক ভাগ। এ জন্যেই বড় হলে সময়গুলো দ্র“ত চলে যায় বলে মনে হয়।**

**তবে আমাদের কাছে বছরগুলো দ্র“ত চলে যাচ্ছে বলে মনে হলেও জ্যোতির্বিদরা কিন্তু বলছেন উল্টো কথা। বছরের দৈর্ঘ্য দিন দিন বড় হচ্ছে। আমরা জানি, পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর এক বার ঘুরে এলে এক দিন হয়। আর সাধারণত এক বছরে যেহেতু ৩৬৫ দিন, তাই পৃথিবী প্রতি বছর নিজ অক্ষের ওপর ৩৬৫ বার ঘোরার (আবর্তন) সুযোগ পায়। আবার আমরা জানি, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট, ৪ সেকেন্ড। এখন দিন দিন যদি এই সময়ের পরিমাণ বড় হয়ে যায়, তার ফলে অবশ্যই বছরের দৈর্ঘ্যও বড় হতে বাধ্য। আর বাস্তবে এটাই ঘটছে।**

**পৃথিবীর আবর্তন কাল ধীর হয়ে যাবার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে চাঁদ। চাঁদের আকর্ষণে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর আকৃতি পরিবর্তন হয়। চাঁদ পৃথিবীর যে দিকে থাকে, পৃথিবীর সে অংশ (বিশেষ করে পানি) চাঁদের আকর্ষণে ফুলে ওঠে। আবার চাঁদের উল্টো পাশের পৃথিবীও বিপরীত দিকে ফুলে ওঠে আকর্ষণ কম থাকার ফলে। এ কারণেই কিন্তু পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়। আর এ কারণেই ধীর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আবর্তন গতি। আবার চাঁদ ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান ও দূরত্ব যেহেতু ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে, তাই পৃথিবীর বিকৃতিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়। ফলে আবর্তন গতির তারতম্যও বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়। সূর্যের প্রভাব খুবই নগণ্য বলে আমরা আপাতত সেটুকু এড়িয়ে যাচ্ছি।**

**এত দিন বিজ্ঞানীরা জানতেন, চাঁদের আকর্ষণসহ বিভিন্ন কারণে প্রতি শতকে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য ২ দশমিক ৩ মিলিসেকেন্ড করে বড় হচ্ছে। তবে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের কিছু গবেষক বলছেন, দিনের দৈর্ঘ্য আসলে বাড়ছে ১ দশমিক ৮ মিলিসেকেন্ড করে। এর পেছনে তাঁরা দায়ী করেছেন পৃথিবীর সমুদ্র স্তর, কোর ও ম্যান্টেলের মধ্যে ক্রিয়াশীল তুড়িৎচুম্বকীয় বলসহ নানা কারণকে। অবশ্য এই হারে দিন বড় হতে থাকলে দিনের দৈর্ঘ্য মাত্র ১ মিনিট বড় হতেই সময় লাগবে ৩৩ লাখ বছর! আর এক ঘণ্টা বাড়তে সময় লাগবে ২০ লাখ শতক!**

**তাহলে এত নগণ্য হিসাব-নিকাশ করে কার কী লাভ? প্রথমত বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে দিন দিন আমাদের অতি সূক্ষ¥ হিসাবের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য খুবই জরুরী একটি বিষয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে তা জানার জন্যেও চাই সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ। তবে সম্প্রতি আরো সূক্ষ্মভাবে দিনের দৈর্ঘের পরিবর্তনের হিসাব বের করা হলেও একই সাথে জানা গেছে, এ পরিবর্তনের ভবিষদ্বাণী করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ, আগের তুলনায় বেশি জিনিসের প্রভাব কাজ করছে বলে জানা গেছে।**

**নতুন এই হিসাব বের করার জন্যে যুক্তরাজ্যের এক দল জ্যোতির্বিদ প্রায় তিন হাজার বছরের উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৭২০ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত। সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া গেছে ব্যাবীলনীয়দের লিখিত মাটির ফলক থেকে। এছাড়াও ব্যবহার করা হয়েছে গ্রিক, চীনা, মধ্যযুগীয় ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত। বহু বছর ধরে এসব অঞ্চলের মানুষের দেখা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ পর্যবেক্ষণ থেকে মূলত পাওয়া গেছে এসব উপাত্ত। এই ঐতিহাসিক উপাত্তকে কম্পিউটার নমুনার সাথে তুলনা করেই নেওয়া হয়েছে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত।**

**তবে পৃথিবীর আবর্তন গতির পরিবর্তন সব সময় একই হারে হয়নি। যেমন, বরফ যুগে পৃথিবীর সব পানি জমে গিয়ে মেরু অঞ্চলে জমা হয়েছিল। এ সময় কমে গিেেয়ছিল পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি। এই একই কারণেই আইস স্কেটাররা ঘোরর সময় হাত মেলে ধরলে কমে যায় তাদের ঘোরার গতি। ফলে ভবিষ্যতে ঠিক কী হারে ঘূর্ণন গতির পরিবর্তন হবে, তা শতভাগ নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক জন মাউন্ড বলেন, ’ভূতাত্ত্বি প্রক্রিয়াগুলো এত দীর্ঘ সময় নিয়ে ঘটে থাকে যে, আমাদের স্বাভাবিক সময়ের মাপকাঠিতে তার হিসাব বের করা খুব কষ্টসাধ্য কাজ।’**

**সূত্র: সায়েন্স অ্যালার্ট, টাইম অ্যান্ড ডেইট ডট কম, ইউনিভার্স টুডে, কর্নেল ডট এজু**

**পৃথিবীর প্রকৃত মানচিত্র উদ্ভাবন**

**ছোট বেলা থেকেই আমরা পৃথিবীর সমতল মানচিত্র দেখে অভ্যস্ত। বাড়ির দেয়ালে বা ভূগোল বইয়ের পাতায় এটা আমরা সবাই দেখেছি। সহজে বোঝার জন্যে এই মানচিত্র খুব কাজে আসে। বিনিময়ে কিন্তু দিতে হয় চড়া মূল্যও। এ মানচিত্রে পৃথিবীর অনেকগুলো অঞ্চেেলর ক্ষেত্রফল দেখানো আছে ভুলভাবে। যেমন, বাস্তবে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রফল গ্রিনল্যান্ডের প্রায় চারগুণ। কিন্তু ম্যাপ খুললে দেখা যাবে উল্টো ঘটনা। গ্রিনল্যান্ডই যেন বড়। একইভাবে, বাস্তবে আফ্রিকা মহাদেশ গ্রিনল্যান্ডের চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বড়। কিন্তু ম্যাপে দুটোকে দেখা যায় প্রায় সমান। কিন্তু কেন এমন হয়?**

**এর কারণ হল, গোলাকার পৃথিবীতে গ্রিনল্যান্ডের অবস্থান মেরু অঞ্চলের খুব কাছাকাছি। ধরুন, আপনি একটি ফুটবলকে একটি কাগজ দিয়ে মুড়ে নিলেন। এরপর যদি কাগজটিকে মেলে ধরতে যান, দেখা যাবে এটি বাইরের দিকে ভাঁজ হয়ে আছে। ভেতরের দিকে যে পরিমাণ কাগজ আছে, বাইরের দিকে ততটা নেই। কিন্তু পৃথিবীর সমতল মানচিত্র আঁকার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয় না। বিষুব রেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে যে পৃথিবী ভাঁজ হয়ে আছে সেটা দেখানো হয় না। যে ম্যাপটি আঁকা হয় সেটি সঠিক হত, যদি পৃথিবী উত্তরে-দক্ষিণে একটি সিলিন্ডারের মতো হত। তাহলে কি ম্যাপ দেখা বন্ধ করে দিতে হবে?**

**না। পৃথিবীকে জানতে হলে ম্যাপ না দেখে উপায় নেই। একটি উপায় হল গ্লোব। কিন্তু কাগজের দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠায়ই যদি পৃথিবীর আসল চিত্র দেখতে চাই? এটা চিন্তা করেই এ সমস্যার দারুণ একটি সমাধান নিয়ে এসেছেন জাপানি শিল্পী ও ¯’পতি হাজিমে নারাকাওয়া। এটা পৃথিবীর প্রায় নিখুঁত একটি চিত্র আপনার চোখের সামনে তুলে ধরবে। এটা যে আসলে গ্লোব না সেটা ভুলেই যাবেন। বিভিন্ন দেশের সাইজও দেখতে পাবেন প্রায় পরিপূর্ণ নিভুল অনুপাতে।**

**নাম অথাগ্রাফ (অঁঃযধএৎধঢ়য)। এটি সম্প্রতি জাপানের ডিজাইন জগতের সেরা পুরস্কার গুড ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড জিতে নিয়েছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এর দিকে তাকালে আপনি আকাশ থেকে পড়ে যাবেন। দেখা যাবে, এশিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা বেঁকে ভিন্ন দিকে চলে গেছে। আরো নানাভাবে একে অদ্ভুত দেখালেও এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাপই এর চেয়ে সঠিকভাবে বিভিন্ন এলাকার অনুপাত দেখাতে পারেনি।**

**আমরা বাড়ির দেয়ালে বা ক্লাসরুমে যে মানচিত্র ঝুলানো দেখি, সেটির উদ্ভাবক হলেন গেরারডাস মার্কেটার (১৫১২-১৫৯৪)। এই ভূেেগালবিদের বাড়ি ছিল বেলজিয়াম। ১৫৬৯ সালে তিনি বর্তমানে প্রচলিত মানচিত্রটি বানান। তাঁর নামানুসারে একে বলা হয় মার্কেটার প্রোজেকশান। সহজে আঁকা ও বোঝার জন্যে এই ম্যাপের জুড়ি নেই। পাশাপাশি নৌ চলাচলেও দারুণ কাজে আসে এটি। কিন্তু এর বড় বড় সমস্যার কথা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি।**

**নারাকাওয়া তাঁর নতুন মানচিত্রে পুরো গ্লোবকে ৯৬টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। এরপর মাত্রাগুলোকে গোলক থেকে রূপান্তর করেছেন টেট্রাহেড্রনে। টেট্রা শব্দের অর্থ চার, আর হেড্রন মানে তলক। ফলে টেট্রাহেড্রনে চারটি তল থাকে। তলগুলো দেখতে ত্রিভুজের মতো। আর থাকে ছয়টি ধার ও চারটি শীর্ষ। কয়েকটি ধাপে ধাপে কাজ করে নারাকাওয়া টেট্রাহেড্রনের ভাঁজ খুলে মানচিত্রকে আয়তাকার কাগজে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পদ্ধতিতে পৃথিবীর প্রকৃত চিত্র আগের মতোই আয়তাকার পৃষ্ঠায় ফুটে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রফলের অনুপাতেও হেরফের হয় না। এটি খুব আস্থার সাথে বিভিন্ন মহাদেশ, সমুদ্র এমনকি বহুল অবহেলিত অ্যান্টার্কটিকাকেও ঠিকভাবে দেখায়। চাইলে আবার আপনি একে মুড়িয়ে গ্লোবের মতোও করে নিতে পারবেন।**

**তবে এটা শতভাগ নিখুঁত নয়। নৌ চলাচলের জন্যে হয়ত একে পুরোপুরি আদর্শ বলা যাবে না। তবুও এটা তুলনামূলক অনেক ভালো। এর চেয়ে ভালো মানচিত্র বানাতে হলে আরেকটু বেশি পরিশ্রম করে উপবিভাজনের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে (৯৬ থেকে বেশি)। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন না একবার।**

**সূত্র: ওয়্যার্ড ডট কম ও সায়েন্স অ্যালার্ট ডট কম।**

**পৃথিবী কত জোরে ঘোরে?**

**এক কথায় বললে বলতে হয়, পৃথিবীর আবর্তন বেগ ঘণ্টায় ১৬৭০ কিলোমিটার বা সেকেন্ডে প্রায় ৪৬৪ মিটার। তবে এই মান সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিস্তারিত জেনে নিই, চলুন।**

**পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরছে**

**পৃথিবী প্রতিনিয়ত পশ্চিম থেকে পূবে আবর্তন করে চলছে। এই আবর্তনের কারণেই ক্রমান্বয়ে রাত দিন হয়, সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটে। পশ্চিম থেকে পূবে এই আবর্তনের জন্যেই উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি মেরুর উদ্ভব ঘটেছে।**

**পৃথিবীর আবর্তন বেগ কিন্তু সর্বত্র সমান নয়। বিষুব অঞ্চল তথা দুই মেরুর ঠিক মাঝখানে এই বেগ সর্বোচ্চ। অন্য দিকে, বিষুব অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে নিকটবর্তী হতে থাকলে বেগ কমতে থাকে। ঠিক মেরুবিন্দুতে বেগ শুন্য। এটা বোঝার জন্যে উপর্যুক্ত লিঙ্কে একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। এখন ভিন্ন একটি দিচ্ছি।**

**মনে করুন, আপনি একটি সুতার প্রান্তবিন্দুতে একটি বল বেঁধে সুতাসহ বলটিকে চারপাশে ঘোরাচ্ছেন। তাহলে দেখবেন, সুতার একেবারে প্রান্তবিন্দুতে বেগ সর্বোচ্চ। সুতার কোন বিন্দু আপনার হাতের যত নিকটে হবে তত বেগ হবে কম। ঐ ঘূর্ণন পথের কেন্দ্রবিন্দুতে বেগ হবে জিরো। কারণ সেটি ঘুরছেই না।**

**কল্পনায় পৃথিবীকে একবার পশ্চিম থেকে পূবে চক্কর দেওয়ান। অথবা একটি টেনিস বল বা কমলা হাতে নিয়ে একইভাবে ঘোরান। দেখবেন প্রান্তবিন্দুর দিকে ক্রমান্বয়ে বেগ কম এবং একেবারে মেরুতে জিরো।**

**অবশ্য, এখানে আমরা রৈখিক বেগের কথা বলেছি। ঘূর্ণায়মান বস্তুর জন্যে আরেকটি বেগ হল কৌণিক বেগ। সেটি কিন্তু প্রতিটি বিন্দুতে একই হবে। কারণ, প্রতিটি বিন্দুই সমান সময়ে সমান পথ তথা ৩৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করবে।**

**এখন, আসুন নিজেরাই বের করে ফেলি পৃথিবীর আবর্তন বেগ কত।**

**আমরা জানি সমবেগের জন্য সূত্র হল**

**ঝ = াঃ।**

**এখানে, ঝ = অতিক্রান্ত দূরত্ব,**

**া= বেগ এবং**

**ঃ= সময়**

**তাহলে পাই, বেগের সূত্র হবে,**

**বেগ বের করতে হলে আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব (ঝ) ও এই দূরত্ব পাড়ি দিতে অতিবাহিত সময় (ঃ) জানতে হবে।**

**আমরা জানি, পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তন সম্পন্ন করে। আর বিষুব রেখা বরাবর এর পরিধি হল ৪০, ০৭৫ কিমি.। এই পথই আমরা (আসলে আমরা না, যারা বিষুব অঞ্চলে বাস করে) পৃথিবীর বুকে বসে পাড়ি দেই ২৪ ঘণ্টায়।**

**তাহলে, বিষুব অঞ্চলে আবর্তন বেগ = (৪০০৭৫ স্ট২৪) কিমি./ঘণ্টা।**

**অর্থ্যাৎ ঘন্টায় প্রায় ১৬৭০ কি.মি। মাইলের হিসাবে এই বেগ হল ঘণ্টায় ১০৭০। এসআই এককে হিসেব করলে হবে সেকেন্ডে প্রায় ৪৬৪ মিটার।**

**এই বেগ কিন্তু বিষুব অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। বিষুব অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যেতে থাকলে পৃথিবীর আবর্তন অক্ষের দূরত্ব কাছে চলে আসবে। ফলে, ঐ বিন্দুর সাপেক্ষে পরিধি তথা ২৪ ঘণ্টায় অতিক্রান্ত পথ আরো কম হবে। [উপরের চিত্রটি দেখুন]**

**বিষুব অঞ্চল ছাড়া অন্য অঞ্চলে বেগ বের করার জন্য আমাদেরকে মূল বেগের সাথে ঐ স্থানের অক্ষাংশের পড়ং এর মান গুণ করতে হবে।**

**তাহলে, ৪৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে পৃথিবীর আবর্তন বেগ হবে**

**া = ১৬৭০ দ্ধ পড়ং ৪৫ শস/য**

**= ১৬৭০ দ্ধ ০.৭০৭**

**= ১১৮০ শস/য।**

**অর্থ্যাৎ ঘণ্টায় ১১৮০ কিলোমিটার বা সেকেন্ডে প্রায় ৩২৮ মিটার।**

**আমাদের ঢাকায় পৃথিবীর আবর্তব বেগ কত হবে?**

**ঢাকার অক্ষাংশ হল ২৩.৭ ডিগ্রি উত্তর।**

**তাহলে, বেগ, া = ১৬৭০ দ্ধ (পড়ং ২৩.৭) = ১৫২৯ শস/য**

**অর্থ্যাৎ, ঘণ্টায় ১৫২৯ কিমি. বা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪২৪ মিটার।**

**এত বিশাল বেগে ঘুরছি আমরা! তাহলে পৃথিবী থেকে পড়ে যাচ্ছি না কেন?**

**জানতে হলে এই নিবন্ধটি পড়ুন।**

**সূত্রঃ**

**১. ইংরেজি উইকিপিডিয়াঃ ঊধৎঃয**

**২. নাসা**

**পৃথিবীর আবর্তনে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন?**

**এই ঘটনার সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত যে আমরা চলন্ত কোন বস্তুর উপর বসে থাকলে সেটা যদি কোন দিকে মোড় নেয়, আমরা তার উলটো দিকে পড়ে যেতে থাকি, যদি না জিনিসটাকে শক্ত করে ধরে রাখি। কখনও বাসের ছাদে বসেছেন? বসলে টের পেতেন। বাস যখন কোন দিকে মোড় নেয়, আপনাকে শক্ত করে বাসকে ধরে রাখতে হবে, নইলে উলটো দিকে পড়ে আপনার যাত্রা সাঙ্গ হবে। [আমি একবার চড়েছিলাম, কেমন লাগে বোঝার জন্য প্লাস গাড়ি না পেয়ে]**

**চিত্র: পৃথিবীল বিভিন্ন অক্ষাংশে আবর্তন বেগ**

**পৃথিবী প্রতিনিয়ত পশ্চিম থেকে ঘুরছে। এ জন্যেই ক্রমান্বয়ে রাত- দিন হচ্ছে**

**আমরা জানি, পশ্চিম থেকে পূবে পৃথিবীর আবর্তন বেগ ঘণ্টায় ১৬৭০ কি.মি (বিষুব অঞ্চলে)। ঢাকায় এই বেগ ঘণ্টায় ১৫২৯ কি.মি। যাই হোক, এই বিপুল বেগের কারণে আমরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে যাবার কথা। পৃথিবী আমাদেরকে ফেলে দিয়ে সূর্যকে চক্কর দেবার জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১ লাখ আট হাজার কি.মি বেগে ছুটে চলে যেত। এই বেগটা হল সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ বেগ।**

**কিন্তু, পৃথিবী খুব ভাল! আমাদেরকে ফেলে চলে যায় না। কিন্তু কেন?**

**কোন বস্তু কোন ঘুর্ণায়মান বস্তুর উপর টিকে থাকবে, নাকি পড়ে যাবে তা নির্ধারণ করে দুটি বিপরীতধর্মী বলের যুদ্ধ। এরা হল বস্তুটির অভিকর্ষ ও কেন্দ্রবিমুখী বল। অনেকে হয়ত মনে করে থাকতে পারেন বলদ্বয় হবে আসলে যথাক্রমে কেন্দ্রমুখী (ঈবহঃৎরঢ়বঃধষ) বল (ঋড়ৎপব) ও কেন্দ্রবিমুখী বল (ঈবহঃৎরভঁমধষ ঋড়ৎপব)। এই বলদ্বয় কিন্তু আসলে একে অপরের সমান ও বিপরীতমুখী, নিউটনের ৩য় সূত্রানুসারে। আর, আমাদের আলোচ্য বলের (ঋড়ৎপব) যুদ্ধ হবে কিন্তু বড় বস্তুর ক্ষেত্রে যার মহাকর্ষ উল্লেখযোগ্য যেমন, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি।**

**এখন তাহলে দেখা যাক পৃথিবীতে কোন বলের আধিপত্য কেমন?**

**পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন বস্তুকে পৃথিবী ঋ বা ড = সম বলে টানে। এখানে ঋ হল আকর্ষণ বল, ড হল এই আকর্ষণ তথা অভিকর্ষজনিত বল, টান বা ওজন। স বস্তুর ভর, ম হল অভিকর্ষজ ত্বরণ , যার কারণে প্রতি সেকেন্ডে যে বেগ বৃদ্ধি পায়। ম এর মান হল প্রতি বর্গ সেকেন্ডে মোটামুটি ৯.৮ মিটার।**

**যাই হোক, এই সূত্র আপাতত আমাদের খুব বেশি দরকার নেই। আমাদের এতটুকু জানলেই চলবে যে পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ (ম) প্রতি বর্গ সেকেন্ডে মোটামুটি ৯.৮ মিটার। ।**

**এখন, আমাদের জানা দরকার আবর্তনের জন্য আমাদের বেগ কী পরিমান হ্রাস পায়।**

**আমরা জানি, ঘূর্ণায়মান বা আবর্তনশীল কোন বস্তুর ত্বরণ (অপপবষবৎধঃরড়হ) বের করার সূত্র হল,**

**ঘূর্ণনশীল বস্তুর ত্বরণ বের করার সূত্র**

**পৃথিবীর ঘূর্ণন বা আবর্তন বেগ হল, া = ৪৬৪ মি/সেকেন্ড, ব্যাসার্ধ, ৎ = ৬৩৭১ কিমি.**

**বা ৬, ৩৭১, ০০০ মিটার।**

**হিসেব করে পাই, ত্বরণ ধ = প্রায় ০.০৩৮৮ মিটার (প্রতি বর্গ সেকেন্ডে)।**

**অর্থ্যাৎ পৃথিবীর আবর্তনের কারণে আমরা প্রতি বর্গ সেকেন্ডে মাত্র ০.০৩৩৮ মিটার হারে পড়ে যেতে থাকি, যেখানে অভিকর্ষ আমাদেরকে তার প্রায় ২৯০ গুণ ত্বরণে (৯.৮১ মিটার/বর্গ সেকেন্ড) টেনে ধরে রাখে।**

**তাহলে কিভাবে আমরা কোন দিকে পড়ে যাব?**

**অর্থ্যাৎ পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে আমরা যে বলে পড়ে যাবার উপক্রম হই, তার চেয়ে অনেক বেশি বলে পৃথিবী আমাদেরকে টেনে ধরে রাখে। এ জন্যেই আমরা পড়ে যাই না।**

**উপরন্তু, উপরের এই হিসাব শুধু বিষুব অঞ্চলের জন্য। আমাদের বাংলাদেশে কেন্দ্রবিমুখী বলের প্রভাব হবে আরও কম। এটি নির্ভর করবে কোনো অঞ্চল বিষুব রেখা থেকে কত দূরে আছে তার উপর। আবর্তন বেগ জেনে নিয়ে আপনিও বের করতে পারেন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্যে এই প্রভাব কতটুকু।**

**নিজেই বের করুন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ**

**তোমার উচ্চতা জানো? সাথে স্টপওয়াচ আছে? আজকাল তাতো থাকেই। শুধু স্মার্টফোনেই নয়, সব সাধারণ ফোনেও আজকাল স্টপওয়াচ থাকে। এ দুটো জিনিস থাকলেই তুমি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মাপার জন্যে তৈরি। আগে আমরা দেখবো কিভাবে বের করতে হয়, পরে না হয় দেখি কেন এই পদ্ধতি কাজ করবে।**

**শর্ত ও পরিবেশঃ সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের দিকে উন্মুক্ত দিগন্ত। এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করবে সমুদ্র সৈকতে। যে কোন বিস্তৃত প্রান্তর হলেও হবে যেখানে নির্বিঘ্নে সূর্যের উদয়-অস্ত দেখা যায়। আকাশে মেঘ থাকা চলবে না। কারণ, আমাদেরকে উদয় বা অস্তের সময় সূর্যের দিকে তাকাতে হবে। উল্লেখ্য, একই পরীক্ষা চাঁদকে দিয়েও করা যাবে।**

**কাজের ধাপঃ**

**নিচের যে কোন কৌশল অবলম্বন করা যাবে।**

**কৌশল-১ঃ সূর্যোদয়ের সময়**

**১। দাঁড়িয়ে পূর্ব দিগন্তে চোখ রাখো**

**২। সূর্যের প্রথম রশ্মিটি চোখে পড়লেই স্টপওয়াচ চালু করে দাও।**

**৩। এবার পূর্ব দিকে মাথা রেখে দ্রুত শুয়ে পড়ো।**

**৪। পূর্ব দিগন্তে তাকালে দেখা যাবে সূর্য (বা চন্দ্র) দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছে। তাকিয়ে থাকো আরো কিছুক্ষণ।**

**৫। একটু পরেই সূর্য (বা চন্দ্র) আবার উঁকি দেবে। আগের মত প্রথম রশ্মিটি চোখে পড়ার সাথে স্টপওয়াচ বন্ধ করে দাও**

**কৌশল-২ঃ সূর্যাস্তের সময়**

**১। শুয়ে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে তাকিয়ে থাকো।**

**২। সূর্যের (বা চন্দ্রের) শেষ আলোকবিন্দুটুকু মিলিয়ে যেতেই চালু করে দাও স্টপওয়াচ।**

**৩। দ্রুত দাঁড়িয়ে যাও।**

**৪। পশ্চিমে তাকিয়ে দেখা যাবে সূর্যের কিছু অংশ এখনও দিগন্তের উপরে আছে।**

**৫। সূর্য আবার যখন দিগন্তের নিচে চলে যাবে স্টপওয়াচ বন্ধ করে দাও।**

**হিসাবঃ**

**এখন তোমার কাছে কী কী তথ্য আছে, দেখা যাক।**

**তোমার উচ্চতা (পা থেকে চোখ পর্যন্ত) = য (ধরি)**

**স্টপওয়াচ থেকে প্রাপ্ত সময় = ঃ**

**আমরা বের করতে চাই, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = জ**

**সূত্রঃ**

**জ =**

**সূত্রের প্রমাণ নিচে দেখো**

**সতর্কতাঃ**

**১। খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকালে সাময়িক বা স্থায়ী, আংশিক বা পূর্ণ অন্ধত্ব বরণ করতে হতে পারে। তবে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় তাকানো সম্পূর্ণ নিরাপদ।**

**২। উচ্চতা কিন্তু পা থেকে চোখ পর্যন্ত বের করতে হবে, চুলের শীর্ষ পর্যন্ত নয়। মাইন্ড ইট!**

**৩। উচ্চতা ও সময়ের সূক্ষ্মতার উপর ফলাফলের নির্ভুলতা নির্ভর করবে।**

**সূত্র আসল কিভাবে?**

**উপরের চিত্রটির দিকে নতুন করে আবার তাকাও।**

**আমরা জানি পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। উপরোক্ত চিত্রে অঈ হচ্ছে আসলে আমাদের চোখ থেকে দিগন্তের দূরত্ব। ধরো, খোলা সমুদ্রে পশ্চিম দিক থেকে একটি জাহাজ আসছে। এখন অঈ হবে সেই দূরত্ব যেখানে পৌঁছলে জাহাজটি আমাদের চোখে পড়বে। জাহাজটি যখন এই দূরত্বে পৌঁছবে তখন জাহাজ ও তোমার অবস্থানবিন্দুদ্বয় পৃথিবীর কেন্দ্রে θ উৎপন্ন করবে।**

**এই কোণটিকে বলা হয় আবর্তন কোণ (অহমষব ড়ভ ৎড়ঃধঃরড়হ)।**

**এখন, দেখো,**

**অইঈ একটি সমকোণী ত্রিভুজ। এতে অঈ হচ্ছে লম্ব, অই ভূমি এবং ইঈ অতিভূজ। এখানে ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে আমরা পাই,**

**ঈড়ংθ = [ যেহেতু পড়ং θ = ]**

**তাহলে, জ = জপড়ং θ + যপড়ং θ**

**বা জ- জপড়ং θ = যপড়ংθ**

**বা জ (১-পড়ংθ ) = যপড়ংθ**

**বা জ =**

**এখন আমাদেরকে এই θ বের করতে হবে। এটা আমরা দুইভাবে বের করতে পারি। ঐকিক নিয়ম দিয়ে বা অনুপাত ব্যবহার করে।**

**পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। অর্থ্যাৎ, পুরো একবার তথা ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে, θ বের করার জন্যে আমরা এভাবে বলতে পারি,**

**২৪ ঘণ্টায় বা ২৪দ্ধ৩৬০০ সেকেন্ডে আবর্তিত হয় ৩৬০ ডিগ্রি**

**∴ ১ সেকেন্ডে আবর্তিত হয় ডিগ্রি**

**তাহলে ঃ সেকেন্ডে আবর্তিত হয় দ্ধ ঃ**

**=**

**এবার খেয়াল কোরো, θ এর এই মানই কিন্তু আমরা আমাদের সূত্রে বসিয়েছি।**

**সঠিক মানঃ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = ৬.৪ দ্ধ ১০৬ । মিলিয়ে দেখো, কতটা কাছাকাছি পেলে! বের করলে জানাও।**

**পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ মেরু থাকলেও পূর্ব পশ্চিম মেরু নেই কেন?**

**পৃথিবী প্রতি ঘন্টায় ১৬৭০ কি.মি. বেগে ( সেকেন্ডে ৪৬৫ মি. বা ১০৭০ মাইল /ঘণ্টা) নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। এই ঘুর্নণের দিক হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে। আর এই ঘূর্নণের দিকই নির্ধারণ করেছে কোন দিক মেরু হবে। এই যে ঘুর্ণন বেগ -এটি কার্যকর শুধুমাত্র বিষুব অঞ্চলের জন্য, যা দুই মেরুর ঠিক মাঝে অবস্থিত। বিষুব অঞ্চল থেকে যতই মেরুর দিকে যাওয়া হবে ততই এই বেগ হ্রাস পেতে থাকবে।**

**বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে গেলে ঘূর্নণের হ্রাসপ্রাপ্ত মান বের করতে হলে স্বাভাবিক মানের সাথে অক্ষাংশের পড়ং এর মান গুণ করতে হবে।**

**পৃথিবীর দুই মেরুর ঠিক মাঝে অবস্থিত বিষুব অঞ্চল**

**যেমন, ৪৫ ডিগ্রি অক্ষাংশে এই বেগ হবে ১৬৭০ \*ঈড়ং ৪৫ কস/য= ১৬৭০\*০.৭০৭ = ১১৮০ কস/য।**

**এই মান কমতে কমতে মেরুতে গিয়ে হয় জিরো। কারণ মেরুতে অক্ষাংশ হল ৯০ ডিগ্রি। ঈড়ং ৯০ = ০ বলে গুনফল হয় জিরো।**

**এটাতো গাণিতিক মত। তবে গণিত কখোনই অসত্য কথা বলে না। মেরুতে বেগ কেন জিরো এটা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আমরা টপিকের মধ্যেই আছি। একটু পর বোঝা যাবে।**

**গ্রামে আগেকার দিকে মাঠের মাঝখানে একটি খুঁটি গেঁড়ে খুঁটির সাথে গরুকে বেঁধে খুঁটির চারপাশে চক্রাকারে ঘোরানো হত। এতে করে ধান গাছে অল্প যে কিছু ধান থেকে যেত তা গরুর পায়ের চাপে ঝরে পড়ে নিচে জমা হত। আমরা যদি একটু চিন্তা করি, রশির একেবার প্রান্ত বিন্দুতে ঘূর্নণ বেগ সর্বোচ্চ। খুঁটির দিকে কাছাকাছি হলে ক্রমেই বেগ কমতে থাকবে। কারণ, যে সময়ে বাইরের প্রান্ত বিন্দু এক চক্কর দেবে সেই সময়েই ভেতরের যে কোন বিন্দুও এক চক্কর দিয়ে দেবে। কিন্তু ভেতরের যে কোন বিন্দু চক্কর দিতে অনেক কম পথ যেতে হবে। সময় একই লাগায় ভেতরের বিন্দুর বেগ কম হতে হবে।**

**কল্পনায় এবার পৃথিবীকে একবার পশ্চিম থেকে পূবে চক্কর দেওয়ান। অথবা একটি আপেল/ কমলা হাতে নিয়ে একইভাবে ঘোরান। দেখবেন প্রান্তবিন্দুর দিকে ক্রমান্বয়ে বেগ কম এবং একেবারে মেরুতে জিরো।**

**এবার মূল আলচনায় ফিরে আসি। আসলে এই ঘূর্ণনের সাথেই মেরুর ব্যাপার জড়িত।**

**পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে আবর্তন করায় এর দুই আবর্তন অক্ষ উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত। আসলে এই অক্ষটি হচ্ছে কেন্দ্র দিয়ে দুই মেরুর সংযোজক সরলরেখা। দুই মেরু বিন্দু পৃথিবীর আবর্তন অক্ষের দুই প্রান্ত বিন্দু। ফলে এই বিন্দু দুইটি আসলে বিশেষ দুটি বিন্দু, যেমন বিশেষ বিন্দু আর কোথাও নেই।**

**পৃথিবী যদি উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে আবর্তন করত তবে পূবে ও পশ্চিমে এই রকম বিশেষ দুটি সৃষ্টি হত।**

**আবার, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যথাক্রমে পৃথিবীর সর্ব উত্তর ও সর্ব দক্ষিণের বিন্দু। বিন্দুগুলো প্রকৃত/আক্ষরিক অর্থেই প্রান্তিক। কিন্তু একটু চিন্তা করুন পূর্ব বা পশ্চিমে কি এমন কোন প্রান্তিক অবস্থান আছে যাকে আমরা সবচেয়ে পূর্ব/ পশ্চিম বলবো?**

**ম্যাপে আমরা যেটাকে পূর্ব / পশ্চিম বলি সেটা শুধুই আপেক্ষিক। বেশিরভাগ ম্যাপেই আমেরিকাকে পশ্চিমে ও ওশোনিয়াকে পূর্বে দেখানো হয়। তাই বলে বলা যাবে না যে আমেরিকাই সবচেয়ে পূর্বের জায়গা।**

**পৃথিবীর ম্যাপকে একটু ভিন্নভাবে দেখানো হল। তাহলে আমেরিকা আসলে আমাদের থেকে পূর্ব দিকে নাকি পশ্চিম দিকে?**

**ইলাস্ট্রেটেড অক্সফোর্ড ডিকশনারির পেছনে একটি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আছে। তাতে আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে রাশিয়ার ডানে - মানে পূবে- একেবারে পৃষ্টার ডান পাশে। দেখানো যেতেই পারে। তার মানে এই নয় যে আমেরিকাই এখন পূবে চলে গেছে। ঐ ম্যাপে আফ্রিকা ও ইউরোপ একেবারে বাঁয়ে- মানে পশ্চিমে। কিন্তু কোনটাই পরম পশ্চিম বা পরম পূর্ব নয়।**

**ধরুন, আপনি পূর্ব-পশ্চিমের কোন অবস্থান থেকে (মানে কোন একটি দ্রাঘিমাংশ বিন্দু থেকে) (ধরুন) পূবে যাচ্ছেন। যতই পূবে যান না কেন পশ্চিম সব সময় আপনার পেছনেই থাকবে।**

**যেমন আপনি বাংলাদেশ থেকে পূবে যেতে থাকলে ক্রমে মায়ানমার, চীন, তাইওয়ান, জাপান, প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে যাবেন। আরো যেতে থাকলে মেক্সিকো, কিউবা, মরক্কো, আলজেরিয়া, মধ্য প্রাচ্য, পাকিস্তান, ভারত হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবেন। নাক বরাবর যদি হাঁটতে থাকেন, সব সময়ই কিন্তু আপনার পেছনে পশ্চিম থাকবে।**

**কিন্তু এবার আপনি যদি বলেন, না, পূর্ব-পশ্চিমে পরিধি পাড়ি না দিয়ে আমি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর পাড়ি দেব। এই অভিযানে স্বাগতম। এবারে আপনি উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। তাহলে ভারত, ভুটান, চীন, মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়া পাড়ি দিয়ে আপনি চলে যাবেন সুমেরুতে, মানে উত্তর মেরুতে।**

**ধরুন ঠিক এই মুহূর্তে আপনি সুমেরু (উত্তর মেরু) থেকে আরেক পা বাড়ালেন (এত পথ আপনাকে হাঁটিয়েই নিচ্ছি)। একটু আগে আপনার পেছনে ছিলো দক্ষিণ। এবার? পেছনে উত্তর আর সামনে দক্ষিণ।**

**হায়! হায়! আপনিতো ঘোরেননি, কিন্তু দিক যে পাল্টে গেলো!**

**যাক, কিছু মনে না করে আপনি যখন আরো এগিয়ে আমেরিকা মহাদেশের উপর দিয়ে চলে বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান চিলি পার হয়ে দক্ষিণ মেরু ক্রস করলেন, আরেকটি ধাক্কা! সামনে এতক্ষণ দক্ষিণ ছিল, তা আবার ঘুরে উত্তর হয়ে গেলো।**

**এটাই হলো উত্তর ও দক্ষিণ বিন্দুর বিশেষত্ব।**

**কিন্তু পূর্ব বা পশ্চিমের কোন বিন্দুর এমন কোন বিশেষত্ব নেই, কোন প্রান্তিক বিন্দু নেই, তাই মেরুও নেই।**

**সূত্রঃ নাসা জিএসএফসি**

**কুয়াশাধনু**

**আমরা রঙধনুর (জধরহনড়)ি কথা শুনেছি। কিন্তু কখনোকি শুনেছি কুয়াশাধনুর কথা? আমরা জানি বৃষ্টির ফোটাগুলো প্রিজমের মতো আচরণ করায় সূর্যের উল্টো দিকে অনেক সময় সূর্যের বেনীআসহকলার ৭টি রঙের বর্ণালী ধনুকের মত আকৃতিতে চোখে পড়ে। একেই আমরা রংধনু বা রামধনু বলে ডাকি।**

**এই রংধনুরই জ্ঞাতিভাই কুয়াশাধনু। ধনু বলার কারণ, এরও আকৃতি সাধারণত ধনুকের মতই অনেকটা। উৎপন্ন হবার প্রক্রিয়ায়ও রয়েছে যথেষ্ট মিল। তবে রংধনুর ক্ষেত্রে বড় বড় বৃষ্টির ফোটার মাঝে আটকে থাকা বৃষ্টিকণা প্রিজমের মতো কাজ করে রংধনুর জন্ম দেয়। কিন্তু নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টির বদলে এর উৎপত্তি ঘটে কুয়াশার ভেতরে। রংধনুর মতই এদের সৃষ্টি সূর্যালোকের বর্ণালী বিভক্তি ও পরিবেশের আদ্রতাজনিত কারণে। রংধনুর মতোই এদের অবস্থানও থাকে সূর্যের উল্টোপাশে। অনেক সময় কুয়াশার বদলে মেঘের ভেতরে আটকে থাকা পানির কণা এই ধনু সৃষ্টির জন্যে দায়ী হতে পারে।**

**উজ্জ্বল সূর্যালোকে পাতলা কুয়াশার দিকে তাকালেও এই ফগবো চোখে পড়তে পারে। উজ্জ্বল সূর্য যখন কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যায়, তখনি এটি দেখার মোক্ষম সময়। সাগরেও চোখে পড়তে পারে এই ভিন্ন রকম ধনুর আকৃতিটি। তবে, কুয়াশা সৃষ্টীকারী পানির কণা অতিশয় ক্ষুদ্র- এমনকি ০.০৫ মিলিমিটারেরও কম- হবার কারণে ফগবো বিবর্ণ বা এমনকি বর্ণহীনও হতে পারে। এরা লম্বায় রংধনুর প্রায় সমানই হয়, তবে প্রস্থে রংধনুর চেয়ে অনেকটাই বেশি। পানির কণাদের আকারের ভিন্নতার কারণে এতে অনেকগুলো বলয় তৈরি হতে পারে।**

**পানির কণা যখন অনেক বেশি ক্ষুদ্র হয় তখন এই ধনুর রঙ্ঘ হয় সাদা। এই সময় একে সাদা রংধনু (ডযরঃব জধরহনড়ংি) বলা হয়। অনেক সময় বিমান পথে মেঘের উপর দিয়ে চলাচল করার সময় নিচে তাকিয়ে এমন ধনু চোখে পড়ে। এ অবস্থায় একে বলা হয় ক্লাউড বো (ঈষড়ঁফ নড়)ি।**

**দেখতে হলেঃ**

**সূর্য ৩৫-৪০ ডিগ্রির কম উচ্চতায় থাকলেই এটি দেখার সম্ভাবনা তৈরি হবে। তবে তুমি যদি থাকো কোন পাহাড় অথবা জাহাজে তবে এই শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী নয়।**

**সূত্র: বিবিসি ডট কম, মেট অফিস ডট গভ ডট ইউকে**

**পঞ্চম অধ্যায়: আকাশ দেখে শিখি**

**দিক নির্ণয়ে হাত ঘড়ি**

**মনে করো তুমি হারিয়ে গেলে গভীর অরণ্যে বা দূর সমুদ্রে। বুঝতে পারছো না তোমার গন্তব্য কোন দিকে। কোন দিকে পশ্চিম বা উত্তর বোঝা যাচ্ছে না। হাতে কম্পাসও নেই। অন্য দিকে দিনের বেলা হলে ধ্রুবতারা, শুকতারা বা অন্য কোন তারা দেখে দিক নির্ণয়েরও উপায় নেই। কিন্তু আকাশে সূর্য আর তোমার সাথে একটি হাতঘড়ি থাকলে নিশ্চিন্তে থাকো।**

**উপযুক্ত পরিবেশঃ উন্মুক্ত সূর্যলোক**

**প্রয়োজনীয় উপকরণঃ একটি অ্যানালগ হাত ঘড়ি যাতে ঘণ্টার কাঁটা,মিনিটের কাঁটা ইত্যাদি আছে।**

**ধাপঃ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের জন্যে নিয়ম একটু আলাদা। আমরা উত্তর গোলার্ধে আছি, তাই আগে এটাই দেখে নিই।**

**ধাপ-১: তোমার অ্যানালগ ঘড়িটাকে ভূমির সমান্তরালে রেখে এর ঘণ্টার কাঁটা সূর্যের দিকে মুখ করিয়ে রাখো।**

**ধাপ-২: এবার ঘন্টার কাঁটা ও ঘড়ির ১২টা চিহ্নিত দাগের ঠিক মধ্যবিন্দুটি কোন দিকে আছে খেয়াল করো। এই দিকটি হবে দক্ষিণ।**

**ধাপ-৩: দক্ষিণ জেনে গেলে। এবার দক্ষিণ দিকে মুখে করে দাঁড়ালে তোমার পেছনে থাকবে উত্তর, ডানে পশ্চিম আর বাঁয়ে পূর্ব দিক থাকবে। তবু যদি সন্দেহ হয়, খেয়াল করলে দেখবে দিনের আকাশকে পূর্ব ও পশ্চিম- এই দুই ভাগে বিভক্ত করলে দুপুরের আগে সূর্য থাকবে পূর্ব অংশে এবং দুপুরের পরে পশ্চিম অংশে। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম সম্পর্কে স্পষ্ট হতে পারবে।**

**দক্ষিণ গোলার্ধের জন্যঃ**

**ধাপ-১: ঘড়ির ১২টার দাগ সূর্যের দিকে মুখ করে ঘড়িটাকে ভূমির সমান্তরালে রাখো।**

**ধাপ-২: এবার ঘড়ির ১২টার দাগ ও ঘণ্টার কাঁটার ঠিক মধ্যবিন্দু কোন দিকে আছে দেখো। এই দিকটিই উত্তর।**

**ধাপ-৩: উত্তর জেনে গেলে। এবার আগের মতই পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ জেনে নাও।**

**সময় জানাবে সপ্তর্ষীম-লী**

**গত সংখ্যায় আমরা ঘড়ি দেখে দিক নির্ণয় করার উপায় জেনেছিলাম। এবার আমরা এর কিছুটা উল্টো ঘটনা দেখব। সেটা কেমন? আমরা এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দিক দেখে সময় বলবো। সেটা কিভাবে? চলো দেখি।**

**প্রয়োজনীয় উপকরণঃ**

**প্রয়োজনীয় পরিবেশঃ মেঘমুক্ত আকাশ, উত্তর গোলার্ধ**

**প্রাথমিক বিষয়ঃ**

**আকাশের ৮৮টি তারাম-লীর উল্লেখযোগ্য একটি হল সপ্তর্ষীম-লী (টৎংধ গধলড়ৎ)। আকাশের তারাদের নিয়ে গঠিত একেকটি নকশার নাম তারাম-লী। নামের মধ্যে ‘সপ্ত’ কথাটি থাকলেও আসলে মূল ম-লীতে তারা আছে সাতটির বেশি। তবে প্রধান সাতটি তারা নিয়ে গঠিত হয়েছে আরেকটি নকশা। সাধারণত এই সাতটি তারাকেই আমরা সপ্তর্ষীম-লী বলি, যদিও এটি আসলে একটি তারাভুজ (অংঃবৎরংস)। একে সাধারণত সপ্তর্ষী (ইরম উরঢ়ঢ়বৎ) বলা হয়। আমাদের আজকের আলোচনায় এই সাত তারার সপ্তর্ষীই কাজে আসেব।**

**চিত্রঃ সপ্তর্ষীর বাইরের দুটি নির্দেশক তারকা দুবে ও মেরাক ধ্রুবতারার সন্ধান দেখিয়ে দিচ্ছে**

**ঋতু বা সময়ভেদে উত্তর, উত্তর-পূর্ব বা উত্তর-পশ্চিম আকাশে একে দেখা যায়। আর বাংলাদেশের আকাশে এটি কখনো অস্ত যায় না। তবে নিচের দিকে, দিগন্তের কাছাকাছি থাকলে শহর দেখা দেখা একটু মুশকিল।**

**পৃথিবীর আবর্তনের কারণে পুরো ২৪ ঘণ্টায় এটি একবার ঘুরে আসে। থব তারা সব সময় একই বিন্দুতে বসে থাকায় মনে হচ্ছে এটি যেন ধ্রুব তারাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই ধ্রুব তারা ও সপ্তর্ষী দিয়েই আমরা আজকে একটি ঘড়ি বানাবো। এই ঘড়িতে স্বাভাবিক ঘড়ির বদলে ২৪টি দাগ থাকবে।**

**যা করতে হবেঃ**

**১। সপ্তর্ষী খুঁজে বের করো। উত্তর আকাশের এই তারাম-লী দেখতে চামচ, পেয়ালা বা লাঙ্গলের মত লাগে। এটি সব সময় ধ্রুবতারার কাছে থাকে। কখনো উপরে, কখনো নিচে, কখনো বাঁয়ে, আবার কখনো বা ডানে।**

**২। ধ্রুবতারা খুঁজে নাও। সপ্তর্ষীর দুবে (উঁনযব) ও মেরাক (গবৎধশ) তারা দুইটি যোগ করে রেখাটিকে সামনের দিকে ছয় গুণ টেনে নিলে পাওয়া যাবে ধ্রুবতারা। দুবে ও মেরাকের মাধ্যমে ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাওয়া যায় বলে এদের নাম হয়েছে নির্দেশক তারা (চড়রহঃবৎ ংঃধৎ)।**

**৩। এবার একটি অ্যানালগ ঘড়ি কল্পনা করো। ঘড়ির কেন্দ্রে থাকবে ধ্রুবতারা। এবার কেন্দ্র থেকে সপ্তর্ষীর নির্দেশক তারা দুটি সংযোগ রেখা বরাবর রেখা কল্পনা করো। এই রেখাটিকে আমাদের ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা মনে করো।**

**চিত্রঃ ধ্রুবতারা ও নির্দেশক তারায় নির্মিত ঘড়ির কাঁটা**

**৪। এখানে খেয়াল করো, আমাদের এই ঘড়িটি একটু স্পেশাল। আমাদের সাধারণ ঘড়ির কাঁটা বাম থেকে ডানে যায়। আর এটা কিন্তু ডান থেকে বাঁয়ে যাবে। এছাড়াও আগেই বলেছি, আমাদের ঘড়িতে থাকবে ২৪ টি দাগ। অর্থ্যাৎ, প্রত্যেক ঘণ্টার জন্যে একটি করে দাগ। আমাদের ঘণ্টার কাঁটার প্রতি ১৫ ডিগ্রি অবস্থান পরিবর্তনের জন্যে এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হবে। ১৫ ডিগ্রি কেন? কারণ পুরোটা মানে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে আসতে ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তাহলে ২৪ দিয়ে ভাগ করে প্রতি ঘণ্টার জন্যে ১৫ ডিগ্রি চলাচল পাওয়া যায়।**

**ডিগ্রি মাপবে কিভাবে?**

**আমাদের ঘড়িটিও অন্যান্য অ্যানালগ ঘড়ির মতই বৃত্তাকার। তাই এটি সব মিলিয়ে ৩৬০ ডিগ্রি। তাহলে দেখো, ২৪ ও ১৮ এর মধ্যে পার্থক্য ৯০ ডিগ্রি। একইভাবে ১৮ ও ১২; ১২ ও ৬ এবং ৬ ও ২৪ এর মধ্যে পার্থক্য ৯০ ডিগ্রি করে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একে ভেঙ্গে আরো ছোট করে নাও।**

**৫। এবার ধ্রুবতারা থেকে খাড়া উপরের দিকে আরেকটি লাইন টেনে নাও। এটি অনেক সময় আগের লাইনের সাথে মিলে যেতে পারে। এই লাইনটি হবে আমাদের আদর্শ।**

**কাজ শেষ! এবার হিসাব।**

**১। আদর্শ রেখা থেকে ঘণ্টার কাঁটা কত দূরে আছে দেখে নাও। হিসাবটা করো ডিগ্রির হিসাবে। মনে রাখবে, প্রতি ১৫ ডিগ্রির পার্থক্য ১ ঘন্টা করে হবে।**

**২। আজকের তারিখ দেখো। এটি মার্চের ৬ তারিখ হলে, তাহলে যে সময় পাচ্ছো সেটিই প্রকৃত সময়। যেমন মনে করো, ঘণ্টার কাঁটা ঠিক উপরের দিকে আছে, মানে আদর্শ রেখার সাথে মিশে আছে, তাহলে বুঝতে হবে এখন মধ্য রাত বা রাত ১২ টা (জানোইতো ২৪ টা মানে আসলে রাত ১২টা)। ঘণ্টার কাঁটা যদি ৩০ ডিগ্রি ডানে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ২২ টা (রাত ১০টা) বাজে।**

**৩। অন্য তারিখের ক্ষেত্রে একটি সূত্র মনে রাখতে হবে।**

**প্রকৃত সময় = সপ্তর্ষীর সময় – ২ দ্ধ মার্চ ৬ এর পরে অতিবাহিত মাসের সংখ্যা**

**এ সময়ের সাথে প্রকৃত সময়ের ৩০ মিনিট পর্যন্ত হেরফের হতে পারে।**

**এবার তোমার জন্যে একটি পরীক্ষাঃ**

**চিত্রঃ মার্চের ৩ তারিখে অবস্থা এরকম হলে এখন কয়টা বাজে?**

**বের করতে পারলে জানাও। সমস্যা হলেও জানাতে পারো।**

**সূত্রঃ টাইম অ্যান্ড ডেট ডট কম।**

**দিক নির্ণয়ে আদম সুরত**

**আমরা নানা সময় দিক নির্ণয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যাই। সামান্য বুদ্ধি খরচ করলেই অনেকভাবে খুব সহজে দিক নির্ণয় করা যায়। এর আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম কীভাবে সূর্য দেখে অথবা হাতঘড়ি দিয়ে দিক নির্ণয় করা যায়। ওই দুটো ছিল দিনের বেলার জন্যে। আজ জানাবো রাতের বেলায় দিক নির্ণয়ের একটি কৌশল। আজকে আমরা ব্যবহার করব আদম সুরত। অবশ্য, এর চেয়েও সহজেই কাজটি করা যায় ধ্রবতারা দিয়ে।**

**প্রাথমিক ধারণাঃ**

**নিশ্চয় ভাবছো, আদম সুরত আবার কী? আদম বা মানুষের সুরতের (আকৃতি) মতো কিছু কি? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। সাধারণ মানুষের কাছে আদম সুরত নামে পরিচিত আকাশের তারাদের এই নকশার অপর নাম কাল পুরুষ। ইংরেজি নাম অরায়ন (ঙৎরড়হ)। পুরো আকাশকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মোট ৮৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এই অঞ্চলসমূহের প্রতিটিতে উপস্থিত উজ্জ্বল তারাগুলো আকাশের বুকে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর মতো দেখায়। এদের মধ্যে আদম সুরত অন্যতম উজ্জ্বল নকশা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এই নকশা ও অঞ্চলগুলোর নাম তারাম-লী (ঈড়হংঃবষষধঃরড়হ)। আদম সুরতও এমনই একটি তারাম-লী। আর, হ্যাঁ, একে সত্যিই আদম বা মানুষের মতো দেখায়। এর মাঝের তিনটি তারার নাম অরায়ন বেল্ট। এদেরকে বর্ধিত করে বাম দিকে টেনে নিলেই পাওয়া যায় রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক।**

**চিত্রঃ রাতের আকাশে আদম সুরত**

**প্রয়োজনী পরিবেশঃ**

**১। মেঘমুক্ত আকাশ। চাঁদ থাকলেও অসুবিধা নেই। আদম সুরত এত বেশি উজ্জ্বল যে চাঁদের আলো এক মলিন করতে পারে না।**

**২। বছরের প্রায় তিন মাস ধরে আদম সুরতকে দেখা যায় না। মাস তিনটি হল মে, জুন ও জুলাই। এপ্রিল মাসে এটি পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে যায়। আগস্টের দিকে আবার ভোরের পূর্ব আকাশে দেখা দিতে শুরু করে। এখন যেহেতু সময়টা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের, তাই একে ভোরের আকাশে খুঁজে পাবে। একে পাওয়া যাবে দক্ষিণ-পূর্ব-পূর্ব দিকে। তবে ফেব্রুয়ারি মাসে একে সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। রাত নামার একটু পরেই এটি প্রায় মাথার উপর (কিছুটা দক্ষিণে) চলে আসে।**

**কাজের ধারাঃ**

**কৌশল-১: আদম সুরত যখন প্রায় মাথার উপর থাকবে।**

**খেয়াল করে দেখো, অরায়ন বেল্টের তিনটি উজ্জ্বল তারকার নিচে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কয়েকটি তারকা আছে। একে বলা হয় অরায়নস সোর্ড বা অরায়নের তরবারি। অরায়ন প্রায় মাথার উপর থাকলে (একটু দক্ষিণে) এর তরবারির নিচের দিক মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকবে।**

**কৌশল-২: আদম সুরত দিগন্তের কাছকাছি থাকলেঃ**

**এবার আমরা কাজে লাগাবো অরায়ন বেল্টের তিনটি তারকাকে। এদেরকে গ্রাম দেশে তিন তারা নামেও ডাকা হয়। রাতের আকাশে এই তিনটিই একমাত্র উজ্জ্বল তারা যারা একটি সরল রেখা গঠন করে। এদের সবচেয়ে ডানের তারাটার নাম মিনটাকা। তুমি পৃথিবীর যেখানেই থাকো, এই তারাটি সব সময় প্রায় সত্যিকারের পূর্ব দিকে উদিত হবে। পূর্ব থেকে সর্বোচ্চ বিচ্যুতি হতে পারে মাত্র ১ ডিগ্রি। পশ্চিমে অস্ত যাবার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।**

**তবে এ কৌশল কাজ করবে যদি উদয় বা অস্তের খুব কাছাকাছি (৩০ মিনিটের কম) সময়ের ক্ষেত্রে। দিগন্তের উপরের দিকে থাকলে এটা পূর্ব বা পশ্চিম থেকে দক্ষিণে সরতে থাকবে। এটা থেকেও দিক অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।**

**পাশাপাশি বেল্টের তিন তারাও দিগন্তের কাছাকাছি থাকলে পূর্ব পশ্চিম রেখা বরাবর থাকবে। দিগন্ত থেকে উপরে থাকলে এটিসহ পুরো আদম সুরতই কিছুটা দক্ষিণে সরে যাবে।**

**একটি সমস্যা ও সমাধানঃ এখন মনে করো তুমি আদম সুরতকে দিগন্ত থেকে অনেকটা উপরে দেখলে। কীভাবে বুঝবে এটা দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে নাকি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে? এটা বোঝা কঠিন নয়। আদম সুরত যখন পূর্ব দিকে থাকবে তখন তিন তারার মধ্যে মিনটাকা থাকবে সবার উপরে। আর পশ্চিম দিকে থাকলে মিনটাকা থাকবে সবার নিচে। এটা থেকেও পুর্ব পশ্চিমের মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।**

**পুনশ্চঃ নিশ্চয় জানো, তবু বলছি। কোনো একটি দিক বের করার পর অন্য দিকগুলো কীভাবে জানবে? সোজা কাজ। পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান থাকে দক্ষিণ,বাঁয়ে উত্তর আর পেছনে পশ্চিম। পশ্চিমে তাকালে ডানে উত্তর আর বাঁয়ে দক্ষিণ। আজকে এ পর্যন্তই। পরের সংখ্যায় হাজির হব দিক নির্ণয়ের আরেকটি উপায় নিয়ে।**

**সূত্রঃ ন্যাচারাল নেভিগেটর ডট কম, এসএস ন্যাভিগেশন ডট উইবলি ডট কম।**

**সূর্য দেখে দিক নির্ণয়**

**অনেক সময় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে আমাদেরকে পূর্ব-পশ্চিম নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়। যেদিকে মনে হয় উত্তর, অন্যরা দেখি সেদিকে ফিরেই নামাজ পড়ে। পরে মেনে নিতে হয়, না, এদিকে পশ্চিমই। কিন্তু মুরুব্বিদের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে মিলিয়ে নিলে কেমন হয়? চলো তাহলে তারই সহজ একটি উপায় দেখে নিই। দিক আমরা কেন ভুলে যাই, সেটা নাহয় ব্যাপনের নিউরো সায়েন্টিস্টদের জন্যেই তোলা থাকল।**

**দিক নির্ণয়ের এই কৌশলটি আমার মতে সবচেয়ে সহজ। কারণ, বাস্তবে করতে গিয়ে আমি নিজেই অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার সাথে করতে পেরেছি। চলো দেখে ফেলি।**

**প্রয়োজনীয় পরিবেশঃ উন্মুক্ত সূর্যালোক**

**প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ**

**১। একটি খুঁটি, লাঠি বা ছড়ি (১ ফুট লম্বা হলেই যথেষ্ট)**

**২। (আবশ্যিক নয়) ৩-৪টি ছোট ছড়ির টুকরো (৬ ইঞ্চি উচ্চতার)**

**কার্যপ্রণালীঃ**

**১। একটি মসৃণ ও সমতল স্থানে চলে যাও। জায়গাটিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতি থাকতে হবে। এমন জায়গা বাছাই করতে হবে যাতে অন্তত ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে জায়গাটি ছায়ার দখলে না যায়**

**২। ভূমির সাথে খাড়াভাবে বড় খুঁটিখানা পুতে দাও।**

**৩। খুঁটির ছায়ার একেবারে প্রান্তে একটি দাগ দিয়ে রাখো**

**অথবা, ছোট একখানা খুঁটি বসিয়ে দাও।**

**৪। ৫-১০ মিনিট অপেক্ষা করো (বসে বসে ব্যাপনের অপঠিত আর্টিকেলগুলো পড়ো)। এবার এসে দেখবে, ছায়ার প্রান্তভাগ আগের জায়গা থেকে সরে গেছে।**

**৫। ৩ ও ৪ নং ধাপ অন্তত ৩-৪ বার করে যাও**

**৬। এবারে খেয়াল করো, সবগুলো খুঁটি বা দাগ একটি সরল রেখা তৈরি করেছে। এই রেখাটিই পূর্ব-পশ্চিম দিক নির্দেশ করছে। পশ্চিম দিক হচ্ছে যেদিকে প্রথম দাগ বা ছোট খুঁটিটি ছিল। আর, যেদিকে শেষ খুটিখানা বসিয়েছো সেদিকেই পূর্ব দিক।**

**এবার যদি তুমি পূর্ব দিকে মুখ কর দাঁড়াও, তার অর্থ হবে তোমার বাঁয়ে উত্তর দিক এবং ডানে দক্ষিণ।**

**এটা কিভাবে কাজ করে?**

**আমরা জানি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হচ্ছে। এ কারণেই সূর্যকে দিনভর পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এই জন্যে সূর্য যতই পশ্চিম দিকে যেতে থাকে তার ছায়া ততোই পূর্ব দিকে সরতে থাকে। এখানে এ তথ্যটিই কাজ এলাগানো হচ্ছে। অবশ্য আমরা জানি, সূর্য সব সময় ঠিক পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় না বা ঠিক পশ্চিম দিকে অস্তও যায় না। বছরজুড়ে নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে বা উত্তরে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের ঘটনা ঘটে।**

**তবুও এ কৌশল কাজ করে, কারণ সূর্যের গতিপথ যেদিকেই থাকুক, ছায়া পূর্ব-পশ্চিম বরাবরই থাকে।**

**তো! কৌশলটি খাটিয়ে তাক লাগিয়ে দাও বড়দের, বন্ধুদের, এমনকি নিজেকে!**

**পুনশ্চঃ দিক নির্ণয়ের আরো কিছু সহজ উপায় আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো রাতের আকাশে ধ্রুবতারা (ঘড়ৎঃয ঝঃধৎ, চড়ষধৎরং) খুঁজে বের করা যা সব সময় উত্তর দিক বরাবর থাকে। পরবর্তীতে আমরা ঐসব পন্থাগুলো বিস্তারিত জানবো।**

**ষষ্ঠ অধ্যায়: আপেক্ষিকতা**

**আপেক্ষিকতার সহজ পাঠ**

**একবিংশ শতকের একেবারে শুরুর দিকের কথা। ১৯০০ সালে আইনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বের হলেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে পরিবারের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। বিশেষ করে তাঁর বাবা ছেলের ভবিষ্যত্ নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। আইনস্টাইন জার্মানির নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই ১৮৯৬ সালেই। ১৯০১ সালে পেলেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্ব। কিছু দিন পর সে দেশের সহকারী প্যাটেন্ট পরীক্ষক পদে অস্থায়ী চাকরি হল। চাকরিতে স্থায়ী হতে হতে চলে এল ১৯০৩ সাল। তার আগের বছরই বাবা চলে গেলেন পরপারে। ১৯০৫ সালে যে তাঁরই ছেলের হাতে চার চারটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ হল, সেটাতো দেখলেনই না, বরং দেখে গেলেন একজন ব্যর্থ ও বেকার সন্তান।**

**আপেক্ষিক তত্ত্বের শুরু যেভাবেঃ**

**এক সময় আলোর বেগকে অসীম মনে করা হলেও এমপেডোক্লেস, ইবনে হাইসাম, গ্যালিলিওসহ অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করতেন। পরিমাপ করার চেষ্টাও অনেকেই করেছিলেন। তবে সবার আগে উলেলেখযোগ্য সাফল্য পান ড্যানিশ জ্যোতির্বিদ ওলে ক্রিস্টেনসন রোমা (১৬৭৬)। বৃহস্পতির উপগ্রহদের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন। পরবর্তীতে ম্যাক্সওয়েল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ বের করে পান একটি ধ্রুব মান। এই ধ্রুব মান আলোর বেগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হল, আলোর বেগ আসলেই ধ্রুব। পর্যবেক্ষকের বেগ পরিবর্তন হলেও পরিমাপ করেই একই মান (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) পাওয়া যাবে সব সময়। এটা মেনে নিলে ইথার নামক বস্তুর কোনো দরকার পড়ে না।**

**কেউ যখন এই তথ্য মেনে নিতে সাহস করলেন না, তখন আইনস্টাইন সেটা কাজে লাগিয়েই বদলে দিলেন জগত্ সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণা। ১৯০৫ সালে প্রকাশ করলেন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (ঝঢ়বপরধষ ঃযবড়ৎু ড়ভ ৎবষধঃরারঃু)। নির্দিষ্ট বেগে গতিশীল পর্যবেক্ষকের মাপা সময়, দৈর্ঘ্য ও ভরের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে। ১০ বছর পর প্রকাশিত হয় সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (এবহবৎধষ জবষধঃারঃু)। এখানে বলা হল মহাকর্ষের কথা। কালক্রমে এই তত্ত্বই হয়ে ওঠে পদার্থবিদ্যার অন্যতম স্তম্ভ। গ্রহদের চলাচলা, নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু, ব্ল্যাক হোল, মহাবিশ্বের জন্ম-মৃত্যু, আকার-আকৃতি ও ভবিষ্যত ইত্যাদি সম্পর্কে অনুমান করা হয় এরই ভিত্তিতে।**

**১. বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব:**

**নিউটন প্রমাণ করেছিলেন, পরম স্থির বস্তু বলতে কিছু নেই। প্ল্যাটফর্মকে স্থির ধরে যেমন ট্রেনকে গতিশীল মনে করা যাবে, তেমনি ট্রেনকে স্থির মনে করে প্ল্যাটফর্মকে গতিশীল ধরলেও সূত্রগুলোর নড়চড় হবে না। তবে নিউটন সময়কে পরম ভাবতেন। ভাবতেন, যে কোনো বেগে চলা বা স্থির পর্যবেক্ষকের কাছেও কোনো নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার মধ্যবর্তী সময় একই হবে। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন ভিন্ন কথা। স্থির বা গতিশীল জায়গায় বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে- এটা বলার পাশাপাশি তিনি আলোর বেগের ধ্রুবতাকে আপেক্ষিক তত্ত্বের ২য় স্বীকার্য বানিয়ে নিলেন।**

**১.১. সময় কেন আপেক্ষিক?**

**সম বেগে চলা বস্তুর বেগ, অতিক্রান্ত দূরত্ব ও অতিক্রান্ত সময়ের মধ্যে সম্পর্ক জানা যায় ঝ = াঃ সূত্রটি থেকে। এখানে ঝ অতিক্রান্ত দূরত, া হল বেগ, আর ঃ হল সময়। আলোর ক্ষেত্রে আমরা সূত্রটিকে লিখতে পারি ঝ = পঃ, যেখানে প হল আলোর বেগ (সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল)। এখন মনে করুন, আপনি কোনো এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে একটি টর্চ জ্বাললেন। টর্চের আলো প বেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে । এখন ধরুন, আপনি নিজেও সেকেন্ডে ২০ মিটার বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এখন তাহলে টর্চের আলোর বেগ বেড়ে হবার কথা প+২০। কিন্তু মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা বলছে, এই বেগ প ই থাকবে। ফলে ঝ = পঃ এবং ঝ = (প+২০)ঃ সমান হয়ে যাচ্ছে, যা সম্বভব নয়। অতএব আইনস্টাইন ভাবলেন, সমীকরণের বাম পক্ষকে ঠিক রাখার স্বার্থে ডান পক্ষের সময়কে (ঃ) পরিবর্তনশীল ভাবতে হবে। সময়ের এই আপেক্ষিকতাকেই বলা হয় কাল দীর্ঘায়ন (ঃরসব ফরষধঃরড়হ)।**

**সময়ের আপেক্ষিকতার ফলাফল:**

**বেশি গতিতে চলা দর্শকের সময় স্থির দর্শকের তুলনায় ধীরে চলবে। ফলে একই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় গতিশীল দর্শক যা মাপবেন, স্থির দর্শক মাপবেন তার চেয়ে বেশি। ছোটখাট বেগের জন্যে এই পার্থক্য একেবারেই উপেক্ষা করার মতো। যেমন কেউ সেকেন্ডে ২০ কিমি. বেগে ১ বছর চললেও স্থির দর্শকের তুলনায় মাত্র ০.০৭ সেকেন্ড সময় কম অতিবাহিত হবে। এ জন্যেই দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর মুখোমুখি হই না। এবং এ কারণেই এটি আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির বিপরীত। তবে বেগ বেশি হলে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য হয়। যেমন,আলোর ৯৫ শতাংশ গতিতে চলা দর্শকের তুলনায় স্থির দর্শকের সময় প্রবাহিত হবে তিন গুণ। আলোর ৯৯ শতাংশ বেগে চললে স্থির দর্শকের সময় প্রবাহিত হবে প্রায় ৭ গুণ। কণা-পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার সার্নে অতিপারমাণবিক কণাদেরকে এত বেশি বেগও দেওয়া সম্ভব হয়।**

**পৃথিবীর চারপাশে ঘূর্ণনরত ২৪টি স্যাটেলাইটগুলোর কল্যাণে আমরা জিপিএস এর সুবিধা উপভোগ করছি। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যাবহার না করলে জিপিএস সঠিক ফলাফল দিতে পারত না। স্যাটেলাইটে থাকা ঘড়ি ঘণ্টায় ১৪ হাজার কিলোমিটার বেগে ঘুরছে। এরা দিনে দুবার করে প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। এর ফলে এদের কাল দীর্ঘায়নের প্রভাবে পৃথিবীর ঘড়িরে সাথে এদের সময়ের পার্থক্য হয় দিনে ৭ মাইক্রো সেকেন্ড। এক মাইক্রো সেকেন্ড হল ১ সেকেন্ডের ১০ লাখ ভাগের এক ভাগের সমান। সময়ের তারতম্য অবশ্য মহাকর্ষের প্রভাবেও হয়। এবং তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। যাই হোক, সেটা আমরা পরে বলছি।**

**১.২. দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন:**

**বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের এ অংশ অনুসারে, গতিশীল অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যাবে। কাল দীর্ঘায়নের মতোই এই বিষয়টিও দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চোখে পড়ে না, কারণ অতি উচ্চ গতির জন্যেই শুধুই এই প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়। মনে করুন, একটি ২০০ মিটারের বস্তু আলোর ১০ শতাংশ বেগে চলছে। তাহলে স্থির পর্যবেক্ষক এর দৈর্ঘ্য মেপে পাবেন এক মিটার কম। মানে ১৯৯ মিটার।**

**দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন ও কাল দীর্ঘায়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি দীর্ঘ দিনের রহস্যের সমাধান হয়। রহস্যটি ছিল অতিপারমাণবিক কণিকা মিউওনদের নিয়ে। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর বহিঃস্থ বায়ুম-লের দিকে উৎপন্ন হয় এই কণিকাগুলো। এরা খুব অস্থিতিশীল। অন্য কণিকাতে রূপান্তরিত হয়ে যায় খুব দ্রুত। গড় আয়ু মাত্র ২.২ মাইক্রো সেকেন্ড। এর অর্থ হল, সামান্য কিছু মিউওনই ভূমিতে পৌঁছতে পারার কথা। কিন্তু একাধিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি মিউওন চলে আসে ভূমিতে। তাহলে কীভাবে আসে?**

**ব্যাখ্যা হল, আমাদের তুলনায় ওদের সময় চলে ধীরে। আবার বহিঃস্থ বায়ুম-ল থেকে ভূমির দূরত্ব যায় ছোট হয়ে। আমাদের হিসাবে ওরা অন্য কণায় রূপান্তরিত হবার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় না পেলেও ওদের হিসাবে এই সময় ঠিকই পাওয়া যায়। পাশপাশি ওদের হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম পথ পাড়ি দিতে হয় বলে আরেকটি বাড়তি সুবিধাও পায় ওরা। ফলে ধ্বংস হবার আগেই ভূমিতে পৌঁছে যায় ওরা।**

**১.৩. ভরের আপেক্ষিকতা ও ভর-শক্তি সমতুল্যতাঃ**

**আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার প্রিয় সমীকরণ কোনটি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর পাওয়া যাবে ঊ=সপ২। সূত্রটি বলছে, পদার্থ (ভর) ও শক্তি আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটিকে আরেকটিতে রূপান্তরযোগ্য। ভর (স) মানেই শক্তি (ঊ), আর শক্তি মানেই ভর। আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন এই জিনিস দুটিকে জোড়া দিয়েছে আলোর বেগ (প)। গতিশীল যে কোনো জিনিসেরই থাকে গতি শক্তি (শরহবঃরপ বহবৎমু)। গতির জন্যে বস্তু যে শক্তি লাভ করে, তাকেই বলে গতি শক্তি। আপনি যত দ্রুত ছুটবেন, আপনার গতি শক্তিও হবে তত বেশি। কিন্তু আইনস্টাইনের সূত্র যেহেতু বলছে, শক্তি আর ভর একই জিনিস, তাই শক্তি (গতি শক্তি রূপে) বাড়া মানে, ভরও বাড়া।**

**তাই যে কোনো বস্তুর গতি বাড়লে তার ভরও বাড়বে (গতি শক্তি বাড়বে বলে)। ধরুন স্থির অবস্থায় কারো ভর ৭০ কেজি। তিনি যদি আলোর অর্ধেক বেগে গতিশীল হন, তাহলে তার ভর বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৮১ কেজি। আবার আলোর ৮০ শতাংশ বেগে চললে তার ভর হয়ে যাবে প্রায় ১১৭ কেজি।**

**১.৪. আলোর চেয়ে বেশি বেগ সম্ভব নয়ঃ**

**এই নীতির বিরুদ্ধে এক বার আমার মাথায় একটি দুষ্ট বুদ্ধি খেলেছিল। ভাবলাম, এমন একটি ট্রেন বানাব, যার বেগ হবে আলোর ৮০ শতাংশ। এর পর এটার ছাদে আরেকটা গাড়িকে উঠিয়ে দিয়ে তার বেগ আলোর ২০ শতাংশের বেশি করতে পারলেইতো কেল্লা ফতে! শুনতে খুবই সোজা মনেই। কিন্তু বাস্তবে কোনোভাবেই গাড়িটির বেগ আলোর ২০ শতাংশেও নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেন?**

**প্রথমত, এত বেশি বেগে যাওয়া মানেই আপনার সময় অনেক ধীরে চলবে। কাল দীর্ঘায়নের প্রভাব ঠিক এমনভাবে হবে, যাতে কোনোভাবেই আপনি ঝ = াঃ সূত্রটিকে এড়িয়ে বেগকে আলোর ওপরে নিতে পারবেন না। দ্বিতীয় কারণটি আরো জোরালো এবং বাস্তব। মনে করুন একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আপনি নির্দিষ্ট বেগে দৌড়াচ্ছেন। বেগ একটু বাড়ালেই আমি আপনার ব্যাগে কিছু পাথর রেখে দিচ্ছি। এর ফলে, আবার বেগ বাড়াতে গেলে আপনাকে আগের চেয়ে বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে। তবুও যদি আপনি বেগ বাড়ান, আমি আগের মতোই আরও কিছু পাথর ব্যাগে রেখে দেব। ফলে ক্রমেই বেগ বাড়াতে হলে আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণে শক্তি খরচ করতে হবে। এভাবে বাড়তে বাড়তে একটি নির্দিষ্ট বেগের কাছে গেলে আপনার ওজোন (ভর) এত বেশি হয়ে যাবে যে, এর বেশি সমান বেগ অর্জন করতে হলে আপনাকে খরচ করতে হবে অসীম পরিমাণ শক্তি। এই নির্দিষ্ট বেগটিই হল আলোর বেগ। আলোর বেগ অর্জন করতে হলে অসীম পরিমাণ শক্তি লাগবে বলেই ভরবিশিষ্ট কোনো বস্তুর জন্যে এই বেগ অর্জন করা সম্ভব নয়।**

**তবে আলোর কণারা এই বেগে ছুটতে পারে, কারণ স্থির অবস্থায় এরা ভরশূন্য। আইনস্টাইন এদের নাম দিয়েছিলেন ফোটন। তাত্ত্বিকভাবে অবশ্য এমন বস্তু থাকা সম্ভব, যার বেগ আলোর চেয়ে বেশি হবে। শর্ত হল, এটিকে শুরু থেকেই আলোর চেয়ে বেশি বেগ নিয়ে ছুটতে থাকতে হবে। কম বেগ নিয়ে শুরু করে তার পরে আলোর ওপরে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের কাল্পনিক কণাকে বলা হয় ট্যাকায়ন।**

**২. সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বঃ**

**বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে কথা বলা হয়েছে শুধু সম বেগ নিয়ে। ত্বরণ (বেগ বৃদ্ধি) নিয়ে গতিশীল দর্শকের ক্ষেত্রে কী প্রতিক্রিয়া হবে তা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। ১৯০৫ সাল থেকেই আইনস্টাইন তাই বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বকে সার্বিক করার কাজে লেগে যান। এটি প্রকাশ করেন ১৯১৫ সালে।**

**২.১. সমতুল্যতার নীতিঃ**

**বিশেষ তত্ত্বে আপেক্ষিকতার মৌলিক স্বীকার্য যে কাজটি করেছিল, এখানে সে কাজটি করে সমতুল্যতার নীতি। এই নীতি অনুসারে, ত্বরণ আর মহাকর্ষ আসলে একই কথা। মনে করুন, আপনি মহাশূন্যের মধ্যে এমন একটি লিফটে আছেন, যেখান মহাকর্ষ অনুপস্থিত। ফলে এখানে উপর বা বা নিচ বলতে কিছু নেই। আপনি মুক্তভাবে ভেসে আছেন। একটু পর লিফটখানা সমত্বরণে চলা শুরু করল। এখন কিন্তু হঠাৎ করে আপনি ওজোন অনুভব করবেন। আপনি লিফটের এক প্রান্তের দিকে একটি টান অনুভব করবেন। এখন এ দিকটিকেই আপনার কাছে মেঝে মনে হবে! আপনি এখন হাত থেকে একটি আপেল ছেড়ে দিলে এটি মেঝের দিকে চলে যাবে। আসলে এখন আপনার মতোই লিফটের ভেতরের সব কিছুর ত্বরণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আসলে লিফটটা মোটেই গতিশীল নয়, বরং এটি একটি সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় আছে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে ট্রেনের ভেতরে বসে যেমন আপনি বলতে পারেন না যে আপনি সম বেগে চলছেন কি না, তেমনি লিফটের ভেতরে বসেও আপনি বুঝতে পারবেন না আসলে আপনি সুষম ত্বরণে চলছেন, নাকি কোনো সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আছেন। আইনস্টাইনের এই চিন্তার ফলাফলই হল সমতুল্যতার নীতি।**

**২.২. স্থান-কালের বক্রতাঃ**

**সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল কাজই হল মহাকর্ষ নিয়ে। নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব অনুসারে, গ্রহরা সূর্যের আকর্ষণে এর চারদিকে ঘুরে। আর আইনস্টাইনের মতে, সূর্যের মতো বস্তুরা এর চারপাশের স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয় বলেই গ্রহরা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলে। এটা বোঝার জন্যে অনেক সময় একটি চাদরের কথা কল্পনা করা হয়। মনে করুন, একটি চাদরের চার কোণা চার দিকে বেঁধে রাখা হল। এবার আপনি চাদরের মাঝ বরাবর একটি বল রাখলে চাদরের মাঝখানে টোল পড়বে। সূর্য আচরণ করে এই বলটির মতোই। এবার আপনি আরও ছোট ছোট কিছু বল চাদরের প্রান্তে রেখে দিলে এরা গ্রহদের মতোই বড় বলটির চারপাশে ঘুরবে। মাঝখানে যত বড় বল রাখবেন, এটি তত বেশি তলিয়ে যাবে। একে বলা হয় মহাকর্ষীয় কূপ (মৎধারঃু বিষষ)। কূপের গভীরতা যত বেশি হবে, এটা থেকে পালাতে হলে ততই বেশি বেগের প্রয়োজন হবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বেগটি হল সেকেন্ডে প্রায় সাত মাইল।**

**আলোর ভর নেই বলে নিউটনীয় মহাকর্ষ আলোর ওপর কতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের মহাকর্ষে স্থান-কাল বেঁকে যায় আলোও সেই বক্র স্থান-কাল বেয়ে চলে। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯১৯ সালে সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের দ্বারা নক্ষত্রের আলোর বেঁকে যাওয়ার ঘটনা প্রমাণিত হয়। নিউটনের মহাকর্ষ থেকে ব্ল্যাক হোলের ভাবনা তৈরি হলেও, তাঁর তত্ত্ব অনুসারে ভরহীন আলোকে মহাকর্ষ প্রভাবিত করতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোলের ধারণা হারিয়ে যায়। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে ফিরে আসে ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোলের ভেতরে আলো এতটা বেশি বেঁকে থাকে যে এটি বাইরে আসার পথ পায় না। তাই ব্ল্যাক হোল আমরা দেখি না।**

**২.৩. মহাবিশ্বের আকৃতি ও ভবিষ্যতঃ**

**সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের তিনটি সম্ভাব্য আকৃতি থাকতে পারে। উন্মুক্ত (ড়ঢ়বহ), বদ্ধ (পষড়ংবফ) ও সমতল (ভষধঃ)। উন্মুক্ত মহাবিশ্বের আকৃতি হবে ঘোড়ার জিনের মতো, বদ্ধ মহাবিশ্ব হবে গোলকের মতো। আর সমতল মহাবিশ্ব হবে এক খ- কাগজের পৃষ্ঠার মতো। স্কুলের জ্যামিতি বইয়ে আমরা পড়েছি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি। এ কথা আসলে শুধু সমতল জিনিসের জন্যেই সত্যি। আপনি যদি পৃথিবীর মতো গোলাকার কোনো জিনিসের পৃষ্ঠে কোনো ত্রিভুজ আঁকেন, তার তিন কোণ মিলে ১৮০ ডিগ্রির বেশি হবে। আবার ঘোড়ার জিনের আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে তা হবে ১৮০ ডিগ্রির কম। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে মহাবিশ্ব সমতল। তবে হতে পারে, সেটা অল্প তথ্যের প্রভাব। আপনি যদি পৃথিবীর সামান্য অংশ নিয়ে চিন্তা করেন, তবে তাকেওতো সমতলই মনে হবে।**

**সমতল মহাবিশ্ব**

**মহাবিশ্বে যে পরিমাণ পদার্থ আছে তার মহাকর্ষীয় প্রভাবে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণের হার কমে যেতে থাকবে। এই প্রক্রিয়া চলবে অসীম সময় ধরে। এ ক্ষেত্রে সমতল মহাবিশ্বের সাইজ হবে অসীম।**

**উন্মুক্ত মহাবিশ্বঃ**

**এ ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। এর সাইজ হবে অসীম , কোনো সীমানা (নড়ঁহফধৎু) থাকবে না। আকৃতি হবে ঘোড়ার জিনের মতো।**

**বদ্ধ মহাবিশ্বঃ**

**প্রসারণ থামানোর জন্যে যেটুকু পদার্থ লাগবে, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ পদার্থ আছে। এ ক্ষেত্রেও মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই , তবে সাইজ হবে সসীম। অনেকটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো।**

**২.৪. মহাকর্ষীয় কাল দীর্ঘায়নঃ**

**শুধু উচ্চ বেগের জন্যেই নয়, কাল দীর্ঘায়ন ঘটে মহাকর্ষের জন্যেও। এমনকি তুলনামূলকভাবে ছোট ভরের বস্তু পৃথিবীও যথেষ্ট কাল দীর্ঘায়ন ঘটায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠে সময় চলে এক গতিতে, মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় আরেক গতিতে। জিপিএস এর মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে প্রায় ২০ হাজার কিলোমিটার ওপরে থাকা ঘড়ির সাথে ভূমির কাল দীর্ঘায়নের পার্থক্য মাথায় রাখতে হয়। এই উচ্চতায় মহাকর্ষ চার গুণ দুর্বল। ফলে সময়ের কাঁটা ভূমির তুলনায় দ্রুত চলে ওখানে। দিনে পার্থক্য হয় ৪৫ মাইক্রো সেকেন্ড। বেগের কারণে স্যাটেলাইটের ঘড়ি আবার ৭ মাইক্রোসেকেন্ডের মতো ধীরে চলে (আগে উল্লিখিত)। ফলে নেট ফল হল, স্যাটেলাইটের ঘড়ির ৩৮ সেকেন্ড এগিয়ে থাকে। কাল দীর্ঘায়নের প্রভাব না মাপলে প্রতি দিন জিপিএস থেকে পাওয়া অবস্থান সরে যেত ১০ কিমি. করে!**

**২.৫. ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে স্থান কালঃ**

**ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রে কী আছে? কৌতূহল উদ্দীপক হলেও প্রশ্নটির উত্তর বড় কঠিন। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, ব্ল্যাক হোলের মধ্যে থাকা সব পদার্থ গুটিয়ে একটি অতি ঘন বিন্দুতে রূপ নেবে। এই বিন্দুর নাম সিঙ্গুলারিটি। এই বিন্দুতে স্থান-কালের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এটাই পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কারণ, অবহেলা করা হচ্ছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নীতি। আসলে এই বিন্দু সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রয়োজন কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি নামের নতুন তত্ত্ব, যা মহাকর্ষ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বকে জোড়া দেবে।**

**সূত্র:স্পেস আনসারস ডট কম, ফিজিক্স সেন্ট্রাল ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া, স্পেস ডট কম, হাইপার ফিজিক্স।**

**সময় কেন পেছনে চলে না**

**ধরুন আপনার সামনে হঠাত্ করে একটি ডিম ভেঙে গেল। ডিমটার জন্যে আপনার খুব মায়া হল। ইচ্ছা হল, একে আবার জোড়া লাগিয়ে ফেলতে। কিন্তু চাইলেই কি কাজটি সহজে করে ফেলা সম্ভব? আসলে ভাঙা ডিম জোড়া লাগানোর সমস্যা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের জন্ম কৌশলও।**

**কখনও ভেবে দেখেছেন, একটি ডিমকে কত সহজে- এক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে ফেলা যায়। অথচ, উল্টো কাজটি কেন এত সহজে করা যায় না? কাজ কি আসলে খুব বেশি? ডিমের খোলস, কুসুম আর সাদা অংশটুকুইতো জোড়া লাগাতে হবে, ব্যস! কিন্তু বলা যত সহজ, কাজটা মোটেই ততটা সহজ নয়। কিন্তু কেন? প্রকৃতির কোনো সূত্র কি ডিমকে জোড়া লাগতে বাধা দেয়? কাজটা কি আসলেই অসম্ভব?**

**না। পদার্থবিদ্যা বরং বলছে, আাামাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ঘটতে পারে উল্টো দিকেও। সময়ের গতিকে পেছনের দিকে চিন্তা করলেও। কিন্তু তবু কেন ভাঙা ডিম বা চায়ের কাপ জোড়া লাগাতে ব্যর্থ? ঘটনাগুলো কেন পেছন দিকে চলে না, সব সময় চলতে থাকে ভবিষ্যতের পানে? প্রশ্নটিকে খুবই সাদামাটা মনে হয়। কিন্তু এর উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে মহাবিশ্বের জন্মের সময় পর্যন্ত, যেতে হবে পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতেও।**

**অন্য অনেক ঘটনার মতোই এখানেও শুরুতে চলে আসবে নিউটনের কথা। ১৬৬৬ সালে প্লেগের কবলে পড়ে তাঁকে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসতে হয় লিংকনশায়ার গ্রামের তাঁর মায়ের কাছে। বিরক্ত ও বিচ্ছিন্ন নিউটন নিজের চিন্তাকে ঢেলে দেন পদার্থবিদ্যা নিয়ে ভাবনায়। ফসল, তিনটি গতির সূত্র এবং মহাকর্ষ। দৈনন্দিন পৃথিবীর পরিচিত বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যায় অবিশ্বাস্য রকম সফল তাঁর সূত্রগুলো। আপেল কেন মাটিতে পড়ে, পৃথিবী কেন সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা জানা হয়ে গেল। তবে সূত্রগুলোর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি যদি সময়কে উল্টো দিকেও চিন্তা করেন, যেমন ধরুন পৃথিবী এখন সূর্যের চারদিকে যেভাবে ঘুরছে তার উল্টো দিকে ঘুরতে লাগল, মানে পেছন দিকে চলতে থাকল, অথবা, পশ্চিম থেকে পূবের বদলে পৃথিবী আবর্তন করতে থাকল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, যার ফলাফল হত সূর্য উঠবে পশ্চিমে আর ডুববে পূবে, তবুও নিউটনের সূত্রগুলো কাজ করে আগের মতোই। ফলে নিউটনের সূত্র অনুসারে ভাঙা ডিমও জোড়া লাগতে পারে।**

**এটি ভালো একটি সমস্যা। কিন্তু আরও সমস্যা হল, নিউটনের পরেও বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানীরা যে সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন, তাদের প্রায় সবগুলোর একই সমস্যা। সময় বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে, নাকি অতীতের দিকে তার কোনো গুরুত্বই নেই সূত্রগুলোর কাছে। এরা বরং গুরুত্বের সাথে দেখে যে আপনি কি বাম হাতী নাকি ডান হাতী। কিন্তু আমরাতো সূত্রদের মতো নই। আমাদের কাছে সময়ের অতীতের বা ভবিষ্যতের দিকের প্রবাহের ফলতো এক নয়।**

**এই সমস্যাটিকে সবার আগে গুরুত্বের সাথে নেন অস্ট্রিয় পদার্থবিদ লুডভিগ বোলজম্যান। তিনি ঊনবিংশ শতকের মানুষ। এখন আমরা যা জানি তার অনেক কিছুই তখন ছিল বিতর্কের বিষয়। এমনকি সব কিছু যে পরমাণু দিয়ে গঠিত- এই কথায়ও সকল পদার্থবিদের আস্থা ছিল না। সে সময় অবস্থা এমন ছিল যে পরমাণুর ধারণা যাচাই করারও কোনো উপায় ছিল না।**

**বোলজম্যানের বিশ্বাস ছিল পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। ফলে তিনি এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হলেন। যেমন, আগুন কেন জ্বলে, আমাদের ফুসফুস কীভাবে কাজ করে, বা বাতাস পেলে চা কেন ঠা-া হয়ে যায়? তার বিশ্বাস জন্মাল যে তিনি পরমাণুর ধারণা কাজে লাগিয়েই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন। তার কথায় আস্তা রাখলেন অল্প কিছু বিজ্ঞানী। বাকিরা তাকে পরিত্যাগ করে একঘরে করে ফেলল।**

**তিনি থেমে থাকলেন না। প্রথমে ভাবলেন উত্তপ্ত পানি নিয়ে। প্রথমে মনে হতে পারে, এমন চিন্তার সাথে সময়ের সম্পর্ক কী। কিন্তু বোলজম্যানের গবেষণা থেকে জানা যাবে যে একের সাথে অন্যের সম্পর্ক আছে।**

**ঐ সময়েই পদার্থবিদ্যার জগতে প্রবেশ করল তাপগতিবিদ্যার ধারণা। এটি ব্যাখ্যা করে তাপের গতি প্রকৃতি। তাপগতিবিদ্যার কারণেই বর্তমানে থেকেই আমরা বুঝতে পারি ফ্রিজ কীভাবে গরম খাবারকে ঠান্ডা করে। সে সময় বোলজম্যানের বিরোধীরা ভেবেছিল, তাপকে অন্য কিছু দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাপ শুধুই তাপ, অন্য কিছু নয়। এ ধারণা দূর করতে কাজে লেগে পড়লেন তিনি।**

**তিনি ভাবলেন, তাপ উত্পন্ন হয় বস্তুর অভ্যন্তরে থাকা পরমাণুর এলোমেলো গতির ফলে। আর তাপগতিবিদ্যাকেও এসব পরমাণুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি সম্পূর্ণ সঠিক হলেও বাকি জীবনটা কেটে গেলে এই ধারণা অন্যদের বোঝাতে বোঝাতে। তিনি শুরুতে এনট্রপির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। তাপগতিবিদ্যা অনুসারে জগতের সব বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু এনট্রপি জড়িয়ে আছে। যখনই এতে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে, এর এনট্রপি বেড়ে যায়। যেমন আপনি যদি একটি গ্যাসের মধ্যে একটি আইস কিউব ডুবিয়ে একে গলতে দেন, তবে গ্যাসের এনট্রপি বেড়ে যাবে। মূলত এনট্রপি হল, এলোমেলো অবস্থার একটি পারিমাপ। যে সিস্টেম যত এলামেলো তার এনট্রপি তত বেশি। একটি সাজানো গোছানো রুমের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে খেলাধূলা করতে থাকলে একটু পরই রুমের এনট্রপি বেড়ে যাবে।**

**এনট্রপির বৃদ্ধিকে পদার্থবিদ্যার অন্য কিছুর সাথে মেলানো যায় না। এটা শুধু এক দিকেই চলতে পারে। এনট্রপি কখনও কমে না, সব সময় বেড়ে চলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। কেউ জানে না, কেন।**

**বোলজম্যানের সহকর্মীরা আবারও ভাবলেন, এনট্রপির অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধিকে অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বোলজম্যান মানলেন না। নেমে পড়লেন কারণ অনুসন্ধানে। ফলাফল হিসেবে আমরা পেলাম এনট্রপির সম্পূর্ণ নতুন এক জ্ঞান। এটা এমনই যুগান্তকারী ছিল যে তার সমাধিতেও লিখে রাখা হয় তার আবিষ্কৃত সূত্রখানা।**

**তিনি আবিষ্কার করলেন, একটি বস্তুতে যে শক্তি এবং পরমাণুগুলো আছে তাদেরকে যত উপায়ে বিন্যস্ত করা যায় তারই একটি পরিমাপ হল এনট্রপি। এনট্রপি বেড়ে যাবার অর্থ হল বস্তুর অভ্যন্তরে পরমাণুগুলো আরো বেশি এলোমেলো বা অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, এ কারণেই পানিতে রাখলে বরফ গলে যায়। পানি যখন তরলে পরিণত হয়, তখন কঠিন অবস্থার তুলনায় এর অণুগুলোর বিন্যস্ত হবার উপায় অনেক বেড়ে যায়। আর অণুগুলোর মধ্যে বিনিময়কৃত তাপ শক্তিও আরও বেশি উপায়ে সজ্জিত হবার সুযোগ পায়। বরফ কঠিন অবস্থায় থাকার চেয়ে তরল অবস্থায় চলে যাবার জন্যে অনেক বেশি উপায় খুঁজে পায়।**

**একইভাবে আপনি যদি কফির কাপে একটু ক্রিম ঢেলে দেন, এটি পুরো পুরো কাপে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ সেটাই হল অধিক এনট্রপির অবস্থা। এই ক্রিম একটি জায়গায় থাকার বদলে ছড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বেশি সংখ্যক উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারে। বোলজম্যানের মতে এনট্রপি হল একটি সম্ভাবনা। অল্প এনট্রপির বস্তু সুবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে বলে সে রকম থাকার সম্ভাবনা কম। বেশি এনট্রপির বস্তু তুলনামূলকভাবে অপরিচ্ছন্ন বা অবিন্যস্ত থাকে বলে তার সম্ভাবনা বেশি। এনট্রপি সব সময় বাড়ে, কারণ বস্তুর জন্য অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকা সহজ।**

**মজার বিষয় হল, এই এনট্রপির মাধ্যমে অ্যারো অব টাইম বা সময়ের সামনে চলাকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু পুরো মহাবিশ্বের এনট্রপি সব সময় বেড়ে চলেছে, তাই কোনো ঘটনাকে পেছন দিকে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।**

**আমরা ডিমকে জোড়া লাগতে দেখি না, কারণ ভাঙা অংশগুলো বিন্যস্ত করার অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে, যার প্রায় সবগুলোই আবার ভাঙা ডিমই ফিরিয়ে দেবে। তার এনট্রপির ব্যাখ্যা থেকে আমরা এটাও ব্যাখ্যা করতে পারি যে কেন আমরা অতীতকে মনে রাখতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতকে নয়। ভাবুন তো কেমন হত যদি আপনার স্মৃতিতে একটি ঘটনা গাঁথা আছে। ঘটনাটি ঘটল তার পরে। এর পর আপনি স্মৃতি হারিয়ে ফেললেন। আপনার মস্তিষ্কে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা বেশ কম। বোলজম্যানের মতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতকে আলাদা মনে হয়, কারণ জগতের এনট্রপি বাড়ছে। নাছোড়বান্দা শত্রুরা কিন্তু এতে একটি খুঁত পেয়ে গেলেন।**

**বোলজম্যান বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যেতে থাকলে এনট্রপি বাড়ার কারণ হল বস্তুর মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর আচরণের সম্ভাবনা। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুরাতো পদার্থবিদ্যার নিয়মের বাইরে যেতে পারবে না। আর সেই নিয়ম মতেতো অতীত আর ভবিষ্যতে নেই কোনো বিভেদ। তাহলেতো ভবিষ্যতে গেলে যেমন এনট্রপি বাড়বে, তেমনি বাড়বে অতীতে যেতে পারলেও।**

**এর সমাধান করতে বোলজম্যান কয়েকটি উপায়ের কথা বলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সেরাটি হল পাস্ট হাইপোথিসিস। এটি অনুসারে, কোনো এক দূর অতীতে মহাবিশ্বের এনট্রপি ছিল খুবই কম। এটি সঠিক হলে তার যুক্তির খুঁতটি আর থাকে না। অতীত ও ভবিষ্যতকে ভিন্ন দেখায়, কারণ ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের এনট্রপি অনেক কম। ফলে ডিম ভাঙে, জোড়া লাগে না। কিন্তু এই ব্যাখ্যা তৈরি করে আরেকটি আরেকটি নতুন সমস্যা। স্বল্প এনট্রপি থাকা যদি কঠিনই হয় তাহলে দূর অতীতেই এত কম এনট্রপি ছিল কেন?**

**এ সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারলেন না। ভাবলেন, ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞান তাকে অচিরেই ভুলে যাবে। হতাশ হয়ে ১৯০৬ সালে তিনি নিজেকে রশিতে ঝুলিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তিনি যদি আর মাত্র এক দশক বেচেঁ থাকতেন, তবেই নিজের ধারণার সাফল্য দেখে যেতে পারতেন। পদার্থবিদরা তাঁর দেওয়া পরমাণুর ধারণা মেনে নিলেন। নতুন আবিষ্কার থেকে এও দেখা গেল যে পাস্ট হাইপোথিসিসের পক্ষেও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।**

**বিংশ শতকে এসে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা গেল পাল্টে। জানা গেল, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। বোলজম্যানের সময়কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস ছিল, আমাদের মহাবিশ চিরন্তন ও স্থির, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। কিন্তু ১৯২০ এর দশকে এসে দেখা গেল যে অধিকাংশ গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দূরে সরছে। আস্তে আস্তে প্রমাণ দাঁড়িয়ে গেল, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এক সময় সব কিছু খুব নিবিড় ছিল। পরের দশকগুলোতে জানা হয়ে গেল যে একটি অতি উত্তপ্ত ও ঘনীভূত অবস্থা থেকে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের। এক সময় এটি প্রসারণের ফলে শীতল হতে হতে আজকের এ অবস্থায় এসেছে।**

**একে পাসট হাইপোথিসিসের পক্ষে একটি প্রমাণ মনে হল। বলা হল, ’আচ্ছা, ঠিক আছে। আদি মহাবিশ্বের এনট্রপি তাহলে অনেক কম ছিল’। তবে ১৪ শ কোটি বছর আগের সেই সময়টিতে কেন এনট্রপি কম ছিল তা জানা গেল না। মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে মহাবিশ্বের আদি বিস্ফোরণ ও প্রসারণের সাথে নিম্ন এনট্রপির সম্পর্ক কী? বিস্ফোরণতো বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে। তাছাড়া সেই আদি ও উত্তপ্ত অবস্থায়তো পদার্থ ও শক্তির বিন্যস্ত হবার বহু ভিন্ন উপায় থাাকার কথা।**

**একটি বিশাল শূন্য স্থানের কথা বল্পনা করুন, যার কেন্দ্রে আছে সূর্যের ভরের সমান একটি গ্যাসীয় মেঘ। মহাকর্ষের আকর্ষণে গ্যাসগুলো ক্রমশ জড় হয়ে পরিণত হবে নক্ষত্রে। এনট্রপি যদি সব সময় বেড়েই চলে, তাহলে এটি কী করে সম্ভব? গ্যাসগুলো যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তখনইতো বরং এরা বেশি সংখ্যক উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারত।**

**গুচ্ছবদ্ধ থাকার গুরুত্ব:**

**আসলে মহাকর্ষ এনট্রপিকে এমন একটি উপায়ে প্রভাবিত করে, যা বিজ্ঞানীরা এখনও ভালোভাবে জানতে পারেননি। বেশি ভারী বস্তুদের ক্ষেত্রে ঘন ও সুষম থাকার চেয়ে গুচ্ছবদ্ধ থাকলেই এনট্রপি বেশি হয়। ফলে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও গ্রহদের মহাবিশ্বের এনট্রপি উত্তপ্ত ও ঘনীভূত মহাবিশ্বের চেয়ে বেশি। সমস্যা কি তাহলে শেষ হল? জর্জ বার্নাড শ একবার বলেছিলেন, ’বিজ্ঞান একটি সমস্যার সমাধান করে আরো দশটি নতুন সমস্যা তৈরি করে।’**

**এখানেও তাই। বিগ ব্যাং এর সময়কালের সেই উত্তপ্ত ও ঘন মহাবিশ্বের এনট্রপি কম থাকায় এমন অবস্থায় মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনাতো খুব কম। তাহলে এমন একটি অনিশ্চিত অবস্থা নিয়ে মহাবিশ্বের জন্মই বা কীভাবে হল? একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে বিগ ব্যাং এর আগেও কিছু একটা ছিল, যা আদি মহাবিশ্বের এনট্রপির স্বল্পতার জন্য দায়ী।**

**কসমোলজিস্ট শন ক্যারোল ও তাঁর এক সাবেক ছাত্রের মতে প্রতিনিয়ত মূল মহাবিশ্ব থেকে শিশু মহাবিশ্বের জন্ম হচ্ছে, যারা প্রসারিত হয়ে আমাদের মহাবিশ্বের রূপ নিচ্ছে। এই শিশু মহাবিশ্বরা কম এনট্রপি নিয়েও থাকতে পারে। বিন্তু মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের সামগ্রিক এনট্রপি সব সময় বেশিই থাকবে। এটা সত্য হলে এর অর্থ হবে, মহাবিশ্বের এনট্রপি কম মনে হবার কারণ হল, আমরা বড় চিত্রটি দেখছি না। এটা সত্য অ্যারো অব টাইমের জন্যেও। ক্যারোলের মতে, অনেক দূরের অতীত অনেক দূরের ভবিষ্যতের মতোই দেখাবে। কিন্তু ক্যারোলের এই মত সার্বজনীন নয়।**

**এর একটি সমস্যা হল আমাদের জ্ঞাত পদার্থবিদ্যার সেরা সূত্রগুলোও বিগ ব্যাং পর্যন্ত গিয়ে অচল হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের আদি সূচনা কী করে হয়েছিল তা বুঝতে না পারলে এর নিম্ন এনট্রপির ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দুই প্রধান স্তম্ভ কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। প্রথমটির কাজ পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র জিনিসদের নিয়ে, আর পরেরটির কাজ হল গ্রহ, নক্ষক্ষ বা তার চেয়ে বড় বস্তুদের নিয়ে। কিন্তু দুটোকে ঐকতানে আনা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আদি মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে দুটোকে মিলিয়ে একটি সার্বিক তত্ত্ব ’থিওরি অব এবরিথিং’ তিরি করতেই হবে।**

**অ্যারো অব টাইমের ব্যাখ্যা পেতে তাই সেই চূড়ান্ত সূত্রটির বড় দরকার। কিন্তু সেই সূত্র বহু দিন ধরে সোনার হরিণ হয়ে আছে। সেই সূত্রের কিছু প্রস্তাবনা আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হল স্টিং থিওরি। এই তত্ত্ব অনুসারে, অতিপারমাণবিক কণিকারা আসলে স্ট্রিং এর কম্পন মাত্র। এই তত্ত্বের আরো বক্তব্য হল আমাদের চেনা তিন মাত্রার চেয়ে বাস্তবে মাত্রা আছে আরো বেশি, যেগুলো খুব ক্ষুদ্র জায়গায় িেপঁচয়ে আছে। আরেকটি বক্তব্য হলো, মহাবিশ্ব আছে বহু, যার প্রতিটিতে হয়ত কাজ করে আলাদা আলাদা সূত্র। কিন্তু সময় সামনে চলার ব্যাখ্যা নেই এখানেও। পদার্থবিদ্যার অন্য মৌলিক সূত্রের মতো এটিও অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।**

**ফলে অ্যারো অব টাইমের ব্যাখ্যা পাবার ব্যাপারে অ্যারো অব টাইমের ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ মেরিনা কোর্টেস তাই আরো ভাল কিছুর সন্ধানে আছেন। কানাডার পেরিমিটার ইনস্টিটিউটের লী স্মোলিনের সাথে যৌথভাবে তিনি স্ট্রিং তত্ত্বের বিকল্প উপায়ে আরো মৌলিক জায়গা থেকে সময়ের সামনে চলার ব্যাখ্যা খুঁজছেন।**

**তাদের মতে মহাবিশ্ব এক গুচ্ছ অনন্য ঘটনার সমাবেশ নিয়ে গঠিত। কোনো ঘটনাই দুবার ঘটে না। প্রত্যেক ঘটনাই কেবল তার পরেরটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধারণা বোলজম্যানের ধারণার বিপরীত, যেখানে অ্যারো অব টাইম ছিল সম্ভাবনার সূত্র থেকে আসা একটি দূর্ঘটনা।**

**তবে সত্যি ব্যাপার যাই হোক, সময়ের সম্মুখ গতির ব্যাখ্যা পেতে হলে মহাবিশ্বের শুরুর দিকের নিম্ন এনট্রপির ব্যাখ্যা পেতেই হবে। দরকার হবে থিওরি এবরিথিং এর। সেটা স্ট্রিং থিওরিই হোক আর কোর্টেসদের প্রস্তাবনাই হোক।**

**সূত্র: বিবিসি সায়েন্স, স্টিফেন হকিং/অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম।**

**মহকর্ষের ইতিহাস**

**আগে পরিচিত একটি কৌতুক বলি।**

**শিক্ষকঃ হাসান, বলতো ফল পাকলে নিচে পড়ে কেন?**

**হাসানঃ স্যার, উপরেতো খাওয়ার কেউ নেই, তাই।**

**আমরা হাসানের মত অবৈজ্ঞানিক নই। তাহলে বলুন তো, ফল নিচে পড়েছে কেন? তুমি নিশ্চয় বলবে, এর জন্যে দায়ী ফলের তুলনায় পৃথিবীর শক্তিশালী মহাকর্ষীয় আকর্ষণ। কারণ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে।**

**আসলেই কি তাই? মহাকর্ষের আধুনিক মতবাদ কী বলে? প্রাচীন কালের মানুষরাই বা কী ভাবত একে নিয়ে? আমরা এখন যা জানি তাও কি চিরদিন সঠিক থাকবে? এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই আজকের বিজ্ঞানের ইতিহাসে মহাকর্ষের গল্পের আসর।**

**ফল বা অন্য কোন বস্তু উপর থেকে কেন নিচের দিকে পড়ে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রাচীন কালের মানুষেরা অদ্ভুত সব মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। অন্য অনেক কিছুর মতই এখানেও এরিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) নাক না গলিয়ে পারেননি। তিনি বলতেন, কারণ ছাড়া কোন প্রতিক্রিয়া বা গতির সৃষ্টি হয় না। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু এর পর ভারী বস্তু নিচে পড়ে কারণ হিসেবে বললেন, ভারী বস্তু যেমন মাটি, পাথর ইত্যাদির ধর্মই হচ্ছে নিচের দিকে নামা। ফলে এরা পৃথিবী তথা মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে নেমে আসা। পৃথিবীর কেন্দ্রই হচ্ছে তাদের প্রকৃত গন্তব্য। উল্লেখ্য, তখন পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলা হত। এখন আমরা জানি, মহাবিশ্বের কেন্দ্রই নেই। কেন? সেটা আরেক দিন জানি, কেমন?**

**আবার অপর দিকে তাঁর মতে আগুন বা এই জাতীয় হালকা বস্তুদের ধর্মই হচ্ছে উপরের দিকে ওঠা। ফলে এরিস্টটলের মতে ভারী বস্তুর পতনের পেছনে পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের কোন হাত ছিল না। এরা নিজদের ভারের কারণেই মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে।**

**রোমান ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি ভিট্রুভিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ৮০- ১৫) বলেছিলেন, মহাকর্ষ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ব্রক্ষ্মগুপ্ত (৫৯৮-প্রায় ৬৬৫) বলেছিলেন, পৃথিবীর আকার গোলকের মত। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। নবম শতকের আরব গণিতবিদরা এই মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল হামদানী ও আল বিরুনী। তাঁরা ব্ররক্ষ্মপুত্রের মত একই সুরে গেয়ে উঠলেন,**

**‘পৃথিবীর পৃষ্ঠ সব দিকে একই রকম, পৃথিবীর সব মানুষ এতে খাঁড়াভাবে দাঁড়ায়। প্রকৃতির সূত্র মেনে ভারী বস্তুর নিচের দিকে নেমে আসে। পানির ধর্ম যেমন প্রবাহিত হওয়া, আগুণের ধর্ম যেমন জ্বালানো, তেমনি পৃথিবীর ধর্ম হচ্ছে বস্তুকে নিজের দিকে টানা ও ধরে রাখা।‘**

**চিত্রঃ পৃথিবীর বুকে আমরা যেভাবে দাঁড়াই ও চলাফেরা করি।**

**এই ধারণাগুলো ঠিক থাকলেও মহাকর্ষের আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পেতে হতে আরো কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৭৪২) দেখলেন, এরিস্টটল যা বলে গেছেন তার উল্টো ফল পাওয়া যাচ্ছে। নিচের দিকে নেমে আসার সময় বস্তুর বেগ বেড়ে যেতে থাকে। একই শতকের শেষের দিকে রবার্ট হুক (১৬৩৫-১৭০৩) একটি প্রস্তাব দেন যে মহাকর্ষ নামে একটি বল আছে যা বস্তুর দূরত্বের সাথে বিপরীত বর্গীয় সূত্রের মাধ্যমে সম্পর্কিত। বিপরীত বর্গীয় সূত্র ফিজিক্সে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এর অর্থ হচ্ছে দূরত্ব বাড়ার সাথে কোন কিছুর মান তার বর্গের হারে কমে যায়। যেমন দূরত্ব ২ গুণ হলে মান ৪ ভাগের এক ভাগ হয়, দূরত্ব ৩ গুণ হলে মান ৯ ভাগের এক ভাগ হয়। আলো, মহাকর্ষ, শব্দ ইত্যাদি বেশ কিছু ক্ষেত্রে শক্তি বা বল এই সূত্র মেনে চলে।**

**হুকের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে নিউটন তাঁর নিজের গতি সূত্র কাজে লাগিয়ে কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) গ্রহের সূত্রগুলোকে গাণিতিকি রূপ দান করেন। এর আগে টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তিনি সৌরজগতের গ্রহদেরকে বহু দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে বিশাল তথ্য জড় করেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে কেপলার ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের বদলে সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাকে আরেকটু এগিয়ে নেন।**

**চিত্রঃ কেপলার সর্বপ্রথম গ্রহদের গতিকে মোটামুটি সঠিক সূত্রে আবদ্ধ করেন**

**প্রাথমিকভাবে নিউটনের সূত্র ছিল এ রকমঃ**

**মহাকর্ষ বল ∝**

**অর্থ্যাৎ, এখন আমরা যা জানি, মহাকর্ষ বলের মান বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ও তাদের নিজস্ব কেন্দ্র থেকে পরস্পরের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।**

**সমানুপাতিককে সমান করতে হলে একটি ধ্রুবকের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বলের সত্যিকারের মান জানতে হলে বস্তুদ্বয়ের ভর ও দূরত্ব জানার পাশাপাশি সমানুপাতিক ধ্রুবকও জানতে হবে। ১৭৯৭ সালে হেনরি ক্যাভেন্ডিশ (১৭৩১-১৮১০) সর্বপ্রথম এই ধ্রুবকটির মান বের করেন। একেই আমরা বর্তমানে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (এ) বলি যার মান ৬.৬৭৩ দ্ধ ১০-১১ একক।**

**১৬৮৭ সালে নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া প্রকাশ করেন। এখানে তিনি মহাকর্ষকে বিপরীত বর্গীয় সূত্র হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি এতে বলেন, আমার মনে হচ্ছে যেই বল গ্রহদেরকে তাদের কক্ষপথে ধরে রাখছে তা তারা যেই কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরছে তা থেকে দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক হবে। চাঁদকে পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে থাকতে যে বল লাগবে তার সাথে তিনি এটার তুলনা করেন। দেখা গেল, দুই ক্ষেত্রেই কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মহাকর্ষ আবিষ্কারের সাথে আপেল পড়ার গল্পটি যে বানানো তাতে খুব বেশি সন্দেহ নেই।**

**আস্তে আস্তে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র স্বীকৃতি পেয়ে গেল। আমরা খালি চোখে মাত্র পাঁচটি গ্রহ দেখতে পাই- বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এত দিন কেউ এর বাইরের কোন গ্রহের খোঁজ জানত না। ১৭৮১ সালে আবিষ্কৃত হল সপ্তম গ্রহ ইউরেনাস। আবিষ্কারক হলেন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল (১৭৩৮-১৮২২)। ইউরেনাস আবিষ্কৃত হতে সূত্রের প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু ইউরেনাসের গতির প্রকৃতিকে নিউটনের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রয়োজন হল আরেকটি গ্রহের। গাণিতিক হিসাব থেকে এই প্রয়োজন অনুভব করলেন দুজন বিজ্ঞানী। একজন ইংরেজ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ জন কাউচ অ্যাডামস (১৮১৯-১৮৯২)। অপরজন ফরাসী গণিতবিদ উরবেই লা ভেরিয়ে (১৮১১-১৮৭৭)। তাঁদের হিসাবের ভিত্তিতে জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহান গ্যালে (১৮১২-১৯১০) ১৮৪৬ সালে নেপচুন গ্রহ খুঁজে বের করেন। এই আবিষ্কার ছিল নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের এক বিশাল সাফল্য।**

**চিত্রঃ আইজ্যাক নিউটন, মহাকর্ষের প্রথম গুরু**

**বর্তমানেও নিউটনের সূত্র তার সাফল্য ধরে রেখেছে। মহাশূন্যে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে প্রয়োজন হয় নিউটনের সূত্রের। পড়ন্ত বস্তুর গতি, অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। এর সকল ব্যবহার নিয়ে বলতে গেলেই বড় একটি আর্টিকেল হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা একটু সামনে যাই। এত বেশি সফল যে সূত্র তার কি কোন ভুল থাকতে পারে? দেখা যাক!**

**নিউটনের মহাকর্ষ থিওরি আবিষ্কারের সাথে সাথে মহাকর্ষের ইতিহাস শেষ- এমনটি ভাবলে মস্ত বড় ভুল হবে। সেক্ষত্রে মনে হবে এটাই মহাকর্ষের সত্যিকার রূপ। তা কিন্তু নয়। প্রায় দুশো বছর নিজের অবস্থান অক্ষত রাখলেও ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এসে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের দুর্বলতা ধরা পড়ল। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধের কক্ষপথের আচরণ নিউটনের সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, নিউটনের সূত্র ঠিকই আছে। সম্ভবত বুধের চেয়েও সূর্যের আরও কাছে আরেকটি গ্রহ আছে যার প্রভাবে বুধের কক্ষপথ অদ্ভুত আচরণ করছে। সেই কাল্পনিক গ্রহের নাম ছিল ভালকান।**

**আমি এসএসসি লেভেলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সময় দেখেছিলাম,বিজ্ঞান বিভাগের বাইরের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের ভূগোল অংশে ১০ম গ্রহ (এখন বাদ পড়লেও তখন প্লুটো ৯ম গ্রহ ছিল) হিসেবে ভালকানের নাম লেখা। আফসোস হয়েছিল, এই নতুন গ্রহের নাম বিজ্ঞান বিভাগের সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে নেই কেন? এখন আর সে আফসোস নেই। চিরুনী অভিযান চালিয়েও ভালকানকে পাওয়া গেল না। ভালকান নেই। তাহলে নিউটনের সূত্র কি ভুল বা অসম্পূর্ণ?**

**হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের ২য় অংশ। ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের পর এবার এল জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সাধারণ (সার্বিক) আপেক্ষিক তত্ত্ব। এখানে আইনস্টাইন মহাকর্ষকে একটি বলের পরিবর্তে স্থান-কালের বক্রতা হিসেবে তুলে ধরলেন। জটিল এই তত্ত্বের বক্তব্য অনুসারে ভর তার আশেপাশের স্থান ও কালকে বাঁকিয়ে ফেলে। এই নতুন ধারণার মাধ্যমে বুধ গ্রহের কক্ষপথের অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ১৯১৯ সালে এটি আরেকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই তত্ত্বের বক্তব্য অনুসারে ভরের স্থান কাল যদি বেঁকে যায়, তাহলে সাধারণভাবে সূর্যের পেছনে থাকা মহাজাগতিক বস্তু দেখা না গেলেও সূর্যগ্রহণের সূর্যের আলোর অনুপস্থিতে পেছনের অনুজ্জ্বল বস্তু দেখা যাবে। ১৯১৯ সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন এটি প্রমাণ করেন। লেন্সের মত আলোকে বাঁকিয়ে ফেলে বলে এই প্রভাবকে বলে গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং।**

**আস্তে আস্তে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব নিউটনের জায়গা দখল করল। এর মাধ্যমে ব্ল্যাক হোলের ধারণা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আমরা জানি, ব্ল্যাক হোলের মুক্তি বেগ আলোর চেয়ে বেশি। তাই এখান থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু আলো যদি কণা না হয়, তাহলে মহাকর্ষ আলোকে কিভাবে আটকে রাখবে?**

**ব্ল্যাক হোলের ধারণা ফিজিক্সের বই থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। আইনস্টাইনের বরাতে তা আবার জায়গা পাকাপোক্ত করল। এক্ষেত্রে আলো মহাকর্ষের কবলে পড়া বক্র স্থান অনুসরণ করায় বের হতে পারে না। তাই ব্ল্যাক হোল দেখা যায় না।**

**চিত্রঃ আধুনিক ধারণা অনুসারে মহাকর্ষ হল স্থান- কালের বক্রতা**

**সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব আরও বলল, মহাকর্ষের উৎসের কাছাকাছি অঞ্চলে দূরের চেয়ে সময় ধীরে চলবে। ১৯৫৯ সালে এই বক্তব্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। পরীক্ষাটির নাম পাউন্ড-রেবকা এক্সপেরিমেন্ট। বর্তমানে স্যাটেলাইট ঘড়ি সঠিকভাবে কাজ করতে হলে এই সূত্র থেকে পাওয়া মানের জন্যে সংশোধন করে নিতে হয়। না হলে পৃথিবীর সময় ও উপগ্রহ থেকে পাওয়া সময় গরমিল দেখা দেবে।**

**আরো বেশ কিছু অকাট্য প্রমাণ বগলে পুরে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সর্বশেষ ২০১৬ সালে এটি পেল এর সর্বশেষ বড় স্বীকৃতি। এর পূর্বাভাস অনুসারে পাওয়া গেল মহাকর্ষ তরঙ্গ, যা চলে আলোর বেগে।**

**তাহলে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বকে সঠিক বলে রায় দিয়ে আমরা আজকের আলোচনা শেষ করতে পারি? না। এটিও দুর্বলতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান দুটি থিওরির এটি একটি। অপরটি হল কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এদের মধ্যে সম্পর্ক দা-কুমড়ার মত। দুজনেই সঠিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির পেছনে দুটিই অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দুজন দুল আলাদা রাজ্যের রাজা। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের রাজত্ব পারমাণবিক জগতে। এটি হল ক্ষুদ্র জগৎ। আর বড় স্কেলের জগত যেমন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদির জায়গায় কাজ করে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। একের রাজ্যে অন্যের স্থান নেই।**

**চিত্র কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের জগৎ**

**কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস দুটি সূত্রকে একমত হতেই হবে। সেই সাধারণ (কমন) সূত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি। এই থিওরি বের করা বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানীদের বড় একটি স্বপ্ন।**

**আমরা সেই থিওরির অপেক্ষায় আছি। এটি আবিষ্কারের সাথে সাথেই হয়ত মহাকর্ষের ইতিহাসের তাত্ত্বিক দিকেরও সমাপ্তি ঘটবে। কে জানে!**

**সূত্রঃ ইংরেজি উইকিপিডিয়া (হিস্ট্রি অব গ্র্যাভিটেশনাল থিওরি; পাউন্ড রেবকা এক্সপেরিমেন্ট, নেপচুন)**

**কাল দীর্ঘায়নে মহাকর্ষের কারসাজি**

**পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসিয়ে রাখা একটি রকেট নিয়ে চিন্তা করতে করতেই কাল দীর্ঘায়নে মহাকর্ষের প্রভাব বুঝে ফেলা যায়। আমরা একটু পরেই তা করব। তবে তার আগে কিছু কথা বলে রাখা জরুরী।**

**এরিস্টটল মনে করতেন, স্থান ও কাল দুটোই পরম। কোনো ঘটনা কোথায় এবং কখন ঘটেছে সে সম্পর্কে সকল পর্যবেক্ষক একমত হবেন। নিউটন এসে পরম স্থানের ধারণাকে বিদায় জানিয়ে দেন। আইনস্টাইন বিদায় দেন পরম সময়কেও। তবে পরম সময়ের কফিনে মাত্র একটি পেরেক ঠুকে তাঁর মন ভরেনি। ১৯০৫ সালে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছিলেন, আলোর কাছাকাছি বেগে গতিশীল অভিযাত্রীর সময় চলবে তুলনামূলক অনেক ধীরে। ১৯১৫ সালের প্রকাশ করেন আরো যুগান্তকারী একটি তত্ত্ব। এটাই হল মহাকর্ষের সর্বাধুনিক তত্ত্ব। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (এবহবৎধষ ঃযবড়ৎু ড়ভ ৎবষধঃরারঃু)। অবশ্য উচ্চ গতির মতো মহাকর্ষও যে কাল দীর্ঘায়ন ঘটাতে সিদ্ধহস্ত সেটা তিনি ১৯০৭ সালে লেখা ও ১৯০৮ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেই অনুমান করেন।**

**দুই আপেক্ষিক তত্ত্বেই একটি করে মৌলিক নীতি মেনে চলা হয়। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে সেটি হল আপেক্ষিকতার মৌলিক স্বীকার্য। এর বক্তব্য হল, মুক্তভাবে গতিশীল সকল পর্যবেক্ষকের কাছে বিজ্ঞানের সূত্রগুলো একই থাকবে, বেগ যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এখানে ত্বরণ সম্পর্কে কিছু বলা হয় না। আর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মৌলিক নীতিটি হল, সমতুল্যতার নীতি (চৎরহপরঢ়ষব ড়ভ বয়ঁরাধষবহপব)। এই নীতির বক্তব্য হল, ‘যথেষ্ট ক্ষুদ্র স্থানের অঞ্চলে অবস্থান করে এটা বলা সম্ভব নয় যে আপনি কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থিরাবস্থায় আছেন, নাকি শূন্য স্থানে সুষম হারের ত্বরণ (বেগ বৃদ্ধি) নিয়ে চলছেন। ‘**

**এই গুরুগম্ভীর কথা বুঝতে অসুবিধা হলে সমস্যা নেই। বরং চলুন একটি উদাহরণ দেখি।**

**মনে করুন, আপনি মহাশূন্যের মধ্যে এমন একটি লিফটে আছেন, যেখান মহাকর্ষ অনুপস্থিত। ফলে এখানে উপর বা বা নিচ বলতে কিছু নেই। আপনি মুক্তভাবে ভেসে আছেন। একটু পর লিফটখানা সমত্বরণে চলা শুরু করল। এখন কিন্তু হঠাৎ করে আপনি ওজোন অনুভব করবেন। আপনি লিফটের এক প্রান্তের দিকে একটি টান অনুভব করবেন। এখন এ দিকটিকেই আপনার কাছে মেঝে মনে হবে! আপনি এখন হাত থেকে একটি আপেল ছেড়ে দিলে এটি মেঝের দিকে চলে যাবে। আসলে এখন আপনার মতোই লিফটের ভেতরের সব কিছুর ত্বরণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আসলে লিফটটা মোটেই গতিশীল নয়, বরং এটি একটি সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে স্থির অবস্থায় আছে। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে ট্রেনের ভেতরে বসে যেমন আপনি বলতে পারেন না যে আপনি সম বেগে চলছেন কি না, তেমনি লিফটের ভেতরে বসেও আপনি বুঝতে পারবেন না আসলে আপনি সুষম ত্বরণে চলছেন, নাকি কোনো সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আছেন। আইনস্টাইনের এই চিন্তার ফলাফলই হল সমতুল্যতার নীতি।**

**সমতুল্যতার নীতি এবং এর ওপরের উদাহরণটি সত্য হলে বস্তুর জড় ভর (ওহবৎঃরধষ সধংং) ও মহাকর্ষীয় ভরকে (এৎধারঃধঃরড়হধষ সধংং) অবশ্যই একই জিনিস হতে হবে। বল প্রয়োগের ফলে কতটুকু ত্বরণ হবে তা নির্ভর করে জড় ভরের ওপর। এই ভর নিয়েই কথাই বলা হয়েছে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রে। আর অন্য দিকে মহাকর্ষীয় ভরের কথা আছে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রে। আপনি কতটুকু মহাকর্ষীয় বল অনুভব করবেন তা নির্ভর করে এই ভরের ওপর।**

**আমরা সমতুল্যতার নীতি জানলাম। আইনস্টাইনের যুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবার একটি থট এক্সপেরিমেন্ট (যে পরীক্ষা বাস্তবে করা যায় না, চিন্তা করে করে বুঝতে হয়) করতে হবে। এটা আমাদেরকে দেখাবে মহাকর্ষ সময়কে কীভাবে প্রভাবিত করে।**

**মহাশূন্যে অবস্থিত একটি রকেটের কথা চিন্তা করুন। চিন্তার সুবিধার জন্যে মনে করুন রকেটটি এত বড় যে এর শীর্ষ থেকে তলায় আলো পৌঁছতে এক সেকেন্ড লাগে। অর্থ্যাৎ এর দৈর্ঘ্য ১, ৮৬,০০০ মাইল। আরও মনে করুন, রকেটের সিলিং ও মেঝেতে একজন করে দর্শক আছেন। দুজনের কাছেই অবিকল একই রকম একটি করে ঘড়ি আছে যা প্রতি সেকন্ডে একটি করে টিক দেয়।**

**মনে করুন সিলিং এর দর্শক ঘড়ির টিকের অপেক্ষায় আছেন। টিক পেয়েই তিনি মেঝের দর্শকের দিকে একটি আলোক সঙ্কেত পাঠালেন। পরে ঘড়িটি আবারও টিক (সেকেন্ডের কাঁটায়) দিলে তিনি আরেকটি সঙ্কেত পাঠালেন। এ অবস্থায় প্রতিটি সঙ্কেত এক সেকেন্ড পর মেঝের দর্শকের কাছে পৌঁছায়। সিলিং এর দর্শক এক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শকও এক সেকন্ডের ব্যবধানে সঙ্কেত দুটি পাবেন।**

**মহাশূন্যে মুক্তভাবে ভেসে না চলে রকেটখানা যদি পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানের মধ্যে থাকত তাহলে কী ঘটত? নিউটনীয় থিওরি অনুসারে এই ঘটনায় মহাকর্ষের কোনো হাত নেই। সিলিং এর দর্শক এক সেকেন্ডের ব্যবধানে সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শকও এক সেকেন্ডের মধ্যেই তা পাবেন। কিন্তু সমতুল্যতার নীতি ভিন্ন কথা বলে। চলুন দেখা যাক, নীতিটি কাজে লাগিয়ে আমরা মহাকর্ষের বদলে সুষম ত্বরণ নিয়ে চিন্তা করে কী পাই। নিজের মহাকর্ষ থিওরি তৈরি করতে আইনস্টাইন সমতুল্যতা নীতিকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন এটা হল তার একটি উদাহরণ।**

**তো এখন তাহলে মনে করুন রকেটটি ত্বরণ নিয়ে চলছে (অর্থ্যাৎ, প্রতি মুহূর্তে এর বেগ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি এর ত্বরণের মান ক্ষুদ্র, না হলে আবার এটি আলোর বেগের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে!)। রকেটটি উপরের দিকে গতিশীল বলে প্রথম সঙ্কেতটিকে আগের চেয়ে (যখন রকেট স্থির ছিল) কম দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। কাজেই সঙ্কেতটি এখন এক সেকেন্ড পার হবার আগেই পৌঁছে তলায় যাবে। রকেটটি যদি নির্দিষ্ট বেগে (ত্বরণহীন) চলত, তাহলে আগে-পরের সব সঙ্কেত এক সেকেন্ড পরপরই পৌঁছত। কিন্তু এখানে ত্বরণ আছে বলে প্রথমে যখন সঙ্কেত পাঠানো হয়েছিল রকেট এখন তার চেয়ে দ্রুত চলছে। কাজেই দ্বিতীয় সঙ্কেতকে আরও কম দূরত্ব পার হতে হবে। ফলে এটি পৌঁছতেও আরও কম সময় লাগবে। কাজেই মেঝের দর্শক দুই সঙ্কেতের মাঝে সময় ব্যবধান পাবেন এক সেকেন্ডের চেয়ে কম। অথচ সিলিং এর দর্শক তা পাঠিয়েছেন ঠিক এক সেকেন্ড পরে। হয়ে গেল সময়ের গরমিল।**

**ত্বরণপ্রাপ্ত রকেটের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটা নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগছে না। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, সমতুল্যতার নীতি বলছে, রকেটটি যদি কোনো মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রেও স্থির থাকে তবু একই ঘটনা ঘটবে। অর্থ্যাৎ, রকেটটি যদি ত্বরণপ্রাপ্ত নাও হয় (যেমন ধরুন এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠে উৎক্ষেপণের জন্যে বসিয়ে রাখা আছে) তাহলেও সিলিং এর দর্শক এক সেকেন্ড পর দুটো সঙ্কেত পাঠালে মেঝের দর্শক তা পাবেন এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যেই। এবার অদ্ভুৎ লাগছে, তাই না!**

**হয়ত মাথায় প্রশ্ন আসবে, এর অর্থ তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে- মহাকর্ষ কি সময়কে বিকৃত করছে, নাকি ঘড়িকে অচল করে দিচ্ছে? ধরুন, মেঝের দর্শক উপরে উঠে সিলিং এর দর্শকের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন। দেখা গেল, দুটো ঘড়ি অবিকল একই রকম। তারা এও নিশ্চিত যে দুজনে এক সেকেন্ড বলতে সমান পরিমাণ সময়কেই বোঝেন। মেঝের দর্শকের ঘড়িতে কোনো ঝামেলা নেই। এটি যেখানেই থাকুক, তা তার স্থানীয় সময়ের প্রবাহই মাপবে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের বলছে, ভিন্ন বেগে চলা দর্শকের জন্যে সময় ভিন্ন গতিতে চলে। আর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে, একই মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন উচ্চতায় সময়ের গতি আলাদা। সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, মেঝের দর্শক এক সেকেন্ডের চেয়ে কম সময় পেয়েছেন, কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছে সময় অপেক্ষাকৃত ধীরে চলে। মহাকর্ষ ক্ষেত্র শক্তিশালী হলে এই প্রভাবও হবে বেশি। নিউটনের গতি সূত্রের মাধ্যমে বিদায় নিয়েছিল পরম স্থানের ধারণা। এবার আপেক্ষিক তত্ত্ব পরম সময়কেও বিদায় জানিয়ে দিল।**

**১৯৬২ সালে এই অনুমান পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। একটি ওয়াটার টাওয়ারের উপরে ও নিচে দুটি অতি সূক্ষ্ম ঘড়ি বসানো হয়। দেখা গেল নিচের ঘড়িটিতে (যেটি পৃথিবীর পৃষ্ঠের বেশি কাছে আছে) সময় ধীরে চলছে, ঠিক সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমনটি অনুমান করেছিল তেমনই। এই প্রভাব খুব ক্ষুদ্র। সূর্যের পৃষ্ঠে রাখা কোনো ঘড়িও পৃথিবীর পৃষ্ঠের তুলনায় মাত্র এক মিনিট পার্থক্য দেখাবে। কিন্তু পৃথিবীর ওপরের বিভিন্ন উচ্চতায় সময়ের এই ক্ষুদ্র পার্থক্যই বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্যাটেলাইট থেকে আসা সঙ্কেতের মাধ্যমে আমাদের ন্যাভিগেশন সিস্টেমকে ঠিক রাখার জন্যে এর প্রয়োজন হয়। এই প্রভাব উপেক্ষা করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অবস্থান বের করলে ভুল হয়ে যাবে কয়েক মাইল!**

**সময়ের প্রবাহের পার্থক্য ধরা পড়ে আমাদের শরীরেও। এমন এক জোড়া যমজের কথা চিন্তা করুন, যাদের একজন বাস করছে পাহাড়ের চূড়ায় এবং আরেকজন সমুদ্র সমতলে। প্রথম জনের বয়স অপরজনের চেয়ে দ্রুত বাড়বে। দুজনে আবার দেখা করলে দেখা যাবে একজনের বয়স আরেকজনের চেয়ে বেশি। এই ক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য খুব ক্ষুদ্র হবে হবে। তবে এদের একজন যদি আলোর কাছাকাছি গতিতে মহাকাশযানে করে দীর্ঘ ভ্রমণ করে ফিরে আসে তাহলে দেখা যাবে যমজের চেয়ে তার বয়স অনেক বেশি পরিমাণে কম হচ্ছে।**

**বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বে পৃথিবী থেকে দূরে গিয়ে অনেক বেশি বেগে ভ্রমণ করে এলে আপনার বয়স অপেক্ষাকৃত কম হবে। আর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বে আপনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে দূরে অবস্থান করলে বয়স দ্রুত বাড়বে। একটি প্রভাব আপাত দৃষ্টিতে আরেকটি থেকে উল্টোভাবে কাজ করে। অবশ্য বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব কার্যকর হবার জন্যে আপনাকে রকেটে চড়ে মহাশূন্যেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি যদি পৃথিবীতেই একটি অসম্ভব দ্রুতগামী ট্রেনে চড়েও ভ্রমণ করেন তবু ট্রেনের বাইরে থাকা আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনার বয়স কম হবে।**

**একে বলা হয় টুইন প্যারাডক্স। তবে মাথার মধ্যে পরম সময়ের ধারণাকে স্থান দিলে তবেই একে প্যারাডক্স (পরস্পর বিরোধী বা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা) মনে হবে। আপেক্ষিক তত্ত্বে একক পরম সময় বলতে কিছু নেই। বরং প্রত্যেক দর্শক তার নিজের মতো করে সময় মাপেন। এটা মেনে নিলেই আর কোনো প্যারাডক্স থাকে না।**

**সূত্রঃ স্টিফেন হকিং ও লিওনার্দ ম্লোদিনোর লেখা ও এই লেখকের অনূদিত প্রকাশিতব্য বই আ ব্রিফার হিস্টরি অব টাইম অবলম্বনে।**

**মহাকর্ষ তরঙ্গঃ কেন, কিভাবে?**

**পাওয়া গেছে মহাকর্ষ তরঙ্গ- এ খবর এত দিনে পুরানো হয়ে গেছে। খবরটিতো সেই ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ তারিখের। প্রায় বছরখানেক ধরে নানা বিচার-বিশ্লেষণের পর লাইগো টিম ঘোষণা দিল- হ্যাঁ, সত্যিই পাওয়া গেছে মহাকর্ষের ঢেউ। এখন সময় এসেছে খবরটির গভরে পৌঁছানোর। এখানে আমরা দেখার চেষ্টা করবো কিভাবে পাওয়া গেল এই মহাকর্ষ তরঙ্গ।**

**আমরা ছোটবেলায় মহাকর্ষে সাথে পরিচিত হই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে। মহাবিশ্বের যে কোন দুটি একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে যেই আকর্ষণ বলের মান তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এখানে কিন্তু মহাকর্ষের উপর সময়ের কোন প্রভাব ছিল না। কারণ, নিউটোনিয়ান মহাকর্ষ অনুসারে, মহাকর্ষ কোন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হতে সময়ের প্রয়োজন হয় না। পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন জায়গায় হঠাৎ কোন বিশাল ভরের বস্তু গজিয়ে উঠলে সেটা ততক্ষণাৎ পৃথিবীর উপর বল প্রয়োগ করবে। অদ্ভুৎ ঠেকছে, তাই না?**

**অদ্ভুৎ ঠেকেছিল আইনস্টাইনের কাছেও। তিনি ১৯০৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব। এর ১০ বছর পর, ১৯১৫ সালে প্রকাশ করেন জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রকে একেবারে অকার্যকর না হলেও সেকেলে বা বানিয়ে দিয়েছিল। মহাকর্ষ কোন বল নয় বরং ভর কতৃক তৈরি স্থান-কালের বিকৃতি। এটি সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় ও প্রমাণ তোমরা ব্যাপনের ৩য় সংখ্যায় ব্ল্যাক হোলের গভীরে সিরিজের প্রথম পর্বে দেখেছিলে। এখানে আমরা মূল আলোচনায় যাবার আগে দেখে নেবো, কিভাবে মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা আইনস্টাইনের মাথায় এল।**

**১৯১৬ সালে আইনস্টাইন আগের বছর প্রকাশিত সার্বিক আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে এই তরঙ্গের পূর্বাভাস প্রদান করেন। কারণ, সূত্র বলছে, মহাকর্ষেরও একটি বেগ থাকা উচিত। কেন? আমরা জানি, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে আট মিনিট ২০ সেকেন্ডের মত সময় লাগে। তাহলে সূর্য থেকে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড আগে যে আলো নির্গত হয়েছে সেটা আমরা দেখবো। বুদ্ধিমানরা হেঁইয়ালি করে বলতে চাইবে, রাত হলেতো আর সেই আলো দেখবো না। ঠিক, এবং আরেকটি বিষয় খেয়াল করো, আমরা যে মুহূর্তে সূর্যকে পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে যেতে থাকি (সাগর সৈকতে গিয়ে নিশ্চয় দেখেছো সূর্য কিভাবে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে) সূর্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড আগেই দিগন্ত থেকে পগারপার হয়েছিল।**

**এসব বলার মানে কী? ধরো কোন কারণে, সূর্য এই মুহূর্তে কোন কারনে উধাও হয়ে গেল- হতে পারে এটি কোন ওয়ার্মহোল অন্য কোন স্থান-কালে চলে গেল বা কোন কারণে এটি চুরমার হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ধূলি-কণায় পরিণত হল। তাহলে আমরা কখন সেটি সম্পর্কে জানতে পারবো? ঠিক ধরেছো, ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবার ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর পর্যন্ত আমরা একে পৃথিবীর আকাশে জ্বলজ্বল করতে দেখবো। কারণ, আমরা কোন বস্তুকে দেখি তখনই যখন এটি থেকে নির্গত আলো আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। অন্য দিকে, মঙ্গলের অধিবাসীরা (যদি থাকতো) এই ঘটনা দেখবে ১২ মিনিট পরে। প্লুটোবাসীরা দেখবে ৪ ঘণ্টা পরে।**

**এই জন্যেই,তোমরা জানো, মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা মহাকাশের যত গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তত অতীতকে দেখতে থাকি। কারণ আলো আসতেতো সময়ের প্রয়োজন হয়।**

**আচ্ছা, এবার প্রশ্ন হল, প্রায় ৮ মিনিট পর আমরা হঠাৎ করে দেখবো, সূর্য হাওয়া হয়ে গেছে। দিন দুপুরে আকাশ হয়ে গেছে অন্ধকার। এখন, সূর্যের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীওকি একইভাবে তার নিজ কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে? অন্য গ্রহ-উপগ্রহদেরইবা কী হবে? কক্ষপথ টিকে থাকবে না ল-ভ- হয়ে যাবে? বা টিকলে কতক্ষণ টিকবে? মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। যদি সাথে সাথে সূর্যের অনুপস্থিতির প্রভাব পরে তাহলে বুঝতে হবে মহাকর্ষ প্রযুক্ত হতে সময়ের প্রয়োজন নেই। তার অর্থ হবে মহাকর্ষের বেগ অসীম যা বিশেষ আপেক্ষিকতার বিপরীত। কোন কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না।**

**তাই আইনস্টাইন বললেন, মহাকর্ষ চলে আলোর বেগে। এখানে কেউ হয়তো কনফিউজড হচ্ছো। আলোর সমান বেগে কেউ আবার যেতে পারে নাকি! হ্যাঁ ভাই, পারে। আলো এক প্রকার তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ। যে কোন তড়িৎচুম্বক তরংগই আলোর বেগে চলে। যেতা সম্ভব নয় তা হল আলোর বেগকে ক্রস করা। লাইগোর এই সাফল্যের আগেও জ্যোতির্বিদরা মহাকর্ষের বেগ পরিমাপ করেছেন যা আলোর বেগের খুবই কাছাকাছি হয়েছিল।**

**এই বেগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে একটি ছিল বৃহস্পতি গ্রহ। দূরবর্তী কোয়াসার থেকে আসা আলো বৃহস্পতির নিকট দিয়ে আসার সময় কিভাবে বেঁকে যায় সেটা পরিমাপ করে মহাকর্ষের বেগ পাওয়া যায় আলোর বেগের ৮০ পারসেন্ট থেকে ১২০ পারসেন্ট এর মধ্যে। যাই হোক, তার মানে হঠাৎ করে সূর্য হারিয়ে গেলে আমরা শুধু অন্ধকারই হয়ে যাবো না, কক্ষপথও হারিয়ে ফেলবো। ছুটে যাবো অজানার দিকে। হয়তো গ্রহরা মারামারিতে লিপ্ত হবে। বছর গণনা করার কোন উপায় থাকবে না- অবশ্যই যদি কেউ বেঁচে থাকার করার জন্যে।**

**মহাকর্ষের বেগের প্রস্তাবনার স্বার্থেই তাই আইনস্টইনন মহাকর্ষ তরঙ্গের পূর্বাভাস দিলেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত প্রস্তাবনা অনুসারে, বিশাল ভরের বস্তুরা (যেমন নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোল) একে অপরকে ঘিরে গোত্তা খাওয়ার সময় স্থান-কালকে এমনভাবে বিকৃত করবে যে সেটা তরঙ্গ আকারে উৎস হতে ছড়িয়ে পড়বে। ব্যাপারটা অনেকটা পুকুরে ছুঁড়ে মারা ঢিল কুলে ঢেউ পৌঁছে দেবার সাথে তুলনীয়।**

**আইনস্টাইনের মৃত্যুর ২০ বছর পরে,১৯৭৪ সালেও মহাকর্ষ তরঙ্গের একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এই সালে বিজ্ঞানীরা একটি বাইনারি পালসার আবিষ্কার করেন যাতে অতি ঘন ও ভারী দুটি তারকা একে অপরকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছিল। এদের গতি-প্রবণতা ঠিক সেই রকমই ছিল যা মহাকর্ষ তরঙ্গের প্রস্তাবনার সাথে মিলে যায়। পরে জ্যোতির্বিদরা এদের কতৃক বেতার নির্গমণ বিশেষণ করেও তরঙ্গের ঘোটনার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। তবে এসব প্রমাণ ছিল পরোক্ষ বা নিতান্তই গণিত-নির্ভর। চাই একেবারে চাক্ষুস প্রমাণ!**

**এটাই পাওয়া গেল গেল বছর, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখে। ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের দুটি ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ থেকে নির্গত মহাকর্ষ তরঙ্গ ধরে ফেলল লাইগোর সেনসর। যদিও এই তরঙ্গ অতি শক্তিশালী, এটি পৃথিবীতে পৌঁছতে এর শক্তি অনেক গুণ হারিয়ে ফেলে। এবং, এই তরঙ্গ লাইগোর সেনসরে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে স্থান-ক্লালের বিকৃতি একটি পরমাণুর এক হাজার ভাগের এক ভাগ ছোট হয়ে যায়! তাহলে লাইগো এটা কিভাবে শনাক্ত করল?**

**একটি পরমাণুর ব্যাস মাত্র ০.১ ন্যানোমিটার বা ১০-৮ সেন্টিমিটার। পকৃতপক্ষে, সরাসরি মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করার জন্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটনেরও ১০০০ ভাগের চেয়ে ক্ষুদ্র দূরত্বের উঠা-নামা পরিমাপ করতে হয়েছিল। লাইগো (খওএঙ) মানে হচ্ছে লেসার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনার ওয়েভ অবজারভেটরি।**

**এই যন্ত্রের ডিটেকটরগুলোবসানো আছে আমেরিকার লুইজিয়ানা ও ওয়াশিংটনে। প্রত্যেকটিতে আছে একটি আড়াই মাইল বা ৪ কিলোমিটার লম্বা ইংরেজি এল অক্ষর (খ) আকৃতির কাঠামো। খ এর গোড়া থেকে থেকে দুই বাহুরইপ্রান্তের দিকে লেজার রশ্মি নেমে আসে এবং প্রান্তে থাকা দর্পণের দায়িত্ব হচ্ছে তা প্রতিফলিত করা। যদি, দুই প্রান্ত থেকে প্রতিফলিত রশ্মি একই সময়ে শীর্ষে ফিরে আসে তাহলে তারা একে অপরকে নাকচ করে দেয়। ফলে সিস্টেমের লাইট ডিটেকটরে কোন সঙ্কেত তৈরি হয় না।**

**এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কোন একটি রশ্মি যদি দেরি করে,বুঝতে হবে এটি মহাকর্ষ তরঙ্গের খপ্পরে পড়তে পারে। লাইগোর ডিটেক্টর মাড়িয়ে যাওয়া কো মহাকর্ষ তরঙ্গ খুব দৃশ্যমানভাবে বস্তুর সাথে ক্রিয়া করে না। এটি খ এর এক বাহুকে সামান্য প্রসারিত এবং অপরটিকে সামান্য পরিমাণ ছোট বানিয়ে দেবে। সামান্য এখানে আক্ষরিক অর্থেই একেবারে ক্ষুদ্র। আগে বলেছি এটা হচ্ছে প্রোটনের ব্যাসের ১ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান।**

**কিন্তু লাইগো নাছোড়বান্দার মত এর পেছনে লেগি রইল। এর যন্ত্রের সংবেদনশীলতা এত তীব্র যে এটি ৪.২৫ আলোকবর্ষ দূরের সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরির দূরত্বও মানুষের চুলের লেভেলেও পরিমাপ করতে পারে। এই ভাষ্য লাইগোর নির্বাহী পরিচালক ও ক্যালটেকের (ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিটিউট অব টেকনোলজি) গবেষক ডেভিড রিজের। লাইগো হচ্ছে ইতিহাসে পরিমাপের সবচেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র।**

**ছবিঃ লাইগোর ল্যাবে কর্মরত একজন টেকনিশিয়ান।**

**এত সূক্ষ্ম পরিমাপ চাট্টিখানি কথা নয়। লাইগোর লেজার রশ্মি ডিটেকটরের বাহু ধরে নিচের দিকে এগিয়ে যায় প্রায় বায়ুশূন্য পরিবেশে। আর আলো প্রতিফলিত করার দর্পণগুলোর চারটি বাহু আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সরল দোলক থেকে ঝুলতে থাকে। এটা করা হয় এ জন্যে যাতে পৃথিবীতে সৃষ্ট কোন কম্পন না নড়াচড়া মহাকর্ষ তরঙ্গকে বিঘ্নিত না করে।**

**২০০২ থেকে ২০১০ এর মধ্যে লাইগো প্রথম এই তরঙ্গের সন্ধানে রত হয়। তরঙ্গটি শনাক্ত করার জন্যে ডিটেকটরের বহু খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে হয়েছে। এরপর ৫ বছরের বিরতি নিয়ে টিমের সদস্যরা যন্ত্রকে নতুন করে ডিজাইন ও উন্নত করেন, যাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্সড লাইগো। এই নতুন যন্ত্র আগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি সংবেদী। এটি দিয়ে কাজ শুরু হয় ২০১৫ সালের সেপ্টম্বরে। সাফল্য ধরা দেয় পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণেই। এত সহজে শনাক্ত করা যাওয়া থেকে আরো বোঝা যাচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে এমন আরো মহাকর্ষ তরঙ্গ পাওয়া যাবে।**

**লাইগো প্রোজেক্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিপ থর্ন বলেন, ‘আশা করছি, সামনের দিনগুলোতে আমরা আরো কিছু দেখবো’।**

**সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখে পাওয়া তরঙ্গ লাইগোর দুটি ডিটেকটরেই প্রায় ৭ মিলিসেকেন্ড আগে-পরে ধরা পড়ে। এই যৌথ ডিটেকশন থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল এটা স্থানীয় কোন বিষয় নয়- মহাজাগতিকই বটে। কিন্তু এরপরেরো সম্ভাব্য যত প্রকার ব্যাখ্যা আসতে পারে তা নিয়ে টিম কাজ করে গেল দিনের পর দিন।**

**লাইগোর মুখপাত্র গ্যাব্রিয়েলা গনজালেস বলেন, ‘সুপার কম্পিউটার মডেল থেকে প্রাপ্ত দুটি ব্ল্যাক হোলের সংঘাতের সাথে প্রাপ্ত সঙ্কেত খুব ভালোভাবে মিলে যায়’।**

**ব্ল্যাক হোল দুটি ভর যথাক্রমে সূর্যের ২৯ ও ৩৬ গুণ। মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট ব্ল্যাক হোলের ভর ৬২ সৌরভরের সমান। ভর কমে যাবার কারণ, কিছু এনার্জিযে মহাকর্ষ তরঙ্গ আকারে নির্গত হল। এটার পরিমাণ সত্যিই বিশাল। এই তরঙ্গের উৎস ছিল দক্ষিণ আকাশে লার্জ ম্যাজেলানিক ক্লাউডের (একটি গ্যালাক্সি) দিকে।**

**লাইগো প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকান ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে এবং ক্যালটেক ও এমআইটিউর বিজ্ঞানীরা আছেন এর পরিচালনার দায়িত্বে।**

**সূত্রঃ স্পেস ডট কম, লাইগো ডট ক্যালটেক ডট এজু, হাইপারটেক্সটবুক ডট কম, ইংরেজি উইকিপিডিয়া**

**সপ্তম অধ্যায়: কণাপদার্থবিদ্যা**

**পঞ্চম মৌলিক বলের সন্ধান**

**আমরা এতদিন জানতাম, মহাবিশ্বের নিপুণ কাঠামো টিকে আছে চারটি মৌলিক বলের কল্যাণে। এরা হল মহাকর্ষ, তড়িচ্চুম্বকীয় এবং সবল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল।**

**কিন্তু গত এপ্রিলে হাঙ্গেরির এক দল পদার্থবিদ সর্বপ্রথম সম্ভাব্য নতুন আরেকটি (পঞ্চম) মৌলিক বলের প্রমাণ পান। এই বলটির মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা মহাবিশ্বের অনেকগুলো রহস্যের সমাধান হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ডার্ক ম্যাটার রহস্যের সমাধানেরও ইঙ্গিত। ব্যপারটি ইদানিং আবারও আলোচনায় এল।**

**গত ১৪ আগস্ট ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইরভাইন) একটি দল একই মতের পক্ষ নিয়ে একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। তাঁরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সেই ফলাফলগুলো বিচার করে দেখলেন যে সত্যিই নতুন একটি বলের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। প্রধান গবেষক জোনাথন ফেং বলেন, “সত্য হয়ে থাকলে এটা হবে একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার। আরো পরীক্ষার মাধ্যমে যদি এর সত্যতা পাওয়া যায় তবে পঞ্চম বলের এই আবিষ্কার মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল পাল্টে দেবে। মৌলিক বলদের একীভবন ও ডার্ক ম্যাটার গবেষণার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা থাকবে ”**

**বিষয়টি প্রথম হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এর এক দল গবেষকের নজরে আসে। তাঁরা উচ্চ-শক্তির প্রোটন রশ্মিকে লিথিয়াম-৭ এর দিকে নিক্ষেপ করলে ধ্বংসাবশেষের সাথে খুবই হালকা একটি অতিপারমাণবিক কণিকা পাওয়া যায়। তাঁরা এটাকে তখন একটি নতুন ধরনের বোসন কণিকা মনে করেছিলেন। এটা ছিল ইলেকট্রনের চেয়ে মাত্র ৩০ গুণ ভারী। কণাপদার্থবিদ্যার স্ট্যান্ডার্ড মডেলে এর কোনো পূর্বাভাস ছিল না। মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড মডেলের এক গুচ্ছ সমীকরণই সবচেয়ে মোক্ষম ভূমিকা পালন করছে।**

**স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে, প্রত্যেকটি মৌলিক বলেরই নিজ নিজ বোসন কণিকা রয়েছে। সবল বলের বাহক হচ্ছে গ্লুয়ন, তড়িচ্চুম্বকীয় বলকে বহন করে আলোক কণা বা ফোটন এবং ড ও ত বোসন করে দুর্বল নিউক্লিয় বল বহনের কাজ। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দুর্বলতা হল, আমরা এখনো মহাকর্ষের জন্যে কোনো বোসন কণিকা খুঁজে পাইনি। তবে অনুমান করা হচ্ছে মহাকর্ষের ক্ষেত্রে বল বহনের কাজটি করবে গ্র্যাভিটন নামক কণাটি। একে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ডার্ক ম্যাটারের ব্যাখ্যা দিতেও ব্যর্থ স্ট্যান্ডার্ড মডেল।**

**হাঙ্গেরির দলটি প্রথমে মনে করেছিলেন, এই কণিকাটি হয়ত কোনো ধরনের ডার্ক ফোটন হবে। ডার্ক ম্যাটারের ক্রিয়া বহনকারী কল্পিত কণিকাকে বলা হয় ডার্ক ফোটন। তাঁদের গবেষণা প্রকাশের পর থেকেই বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।**

**ফেং বলে, ‘উনারা দাবি করতে পারেননি যে এটা নতুন একটি মৌলিক বলের ফলে হয়েছে। তাঁদের মতে এই বাড়তি জিনিসটি ছিল একটি নতুন কণিকার প্রতিক্রিয়া, কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না যে এটা কি বস্তুকণা (সধঃঃবৎ ঢ়ধৎঃরপষব) ছিল নাকি বলবাহী (ভড়ৎপব-পধৎৎুরহম) কণা ছিল।‘**

**বিষয়টি আরো বিস্তারিত জানতে ফেং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে প্রাথমিক উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করেন। পরীক্ষা করে দেখেন এই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষাগুলোও। এরপরই শক্তিশালী তাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল যে এই নতুন প্রতিক্রিয়ার পেছনে বস্তুকণা বা ডার্ক ফোটন- কারোরই হাত নেই। বরং তাঁদের হিসাব- নিকাশ থেকে দেখা গেল যে এটা প্রকৃতির পঞ্চম বলের নিজস্ব বোসন হতে পারে। ডার্ক ম্যাটারসহ মহাবিশ্বের রহস্যময় নানান কিছুর ব্যাখ্যা এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।**

**কাল্পনিক নতুন এই বোসনকে আপাতত বলা হচ্ছে প্রোটোফোবিক এক্স। এর বিস্ময়কর দিক হল, এটি শুধু ইলেকট্রন এবং নিউট্রনের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তাও খুবই স্বল্প পাল্লায়, যার ফলে একে শনাক্ত করা খুবই কঠিন ছিল।**

**আরেক গবেষক টিমোথি টেইট বলেন, ‘এর আগে এই একই বৈশিষ্ট্যধারী কোনো বোসন কণিকা পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েনি। একে আমরা কখনো কখনো এক্স বোসন বলে থাকি, যেখানে এক্স অর্থ হল ‘অজানা’।‘**

**এই গবেষণাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মে মাসে। তখন এটি প্রকাশিত হয় প্রি-প্রিন্ট সাইট ধৎঢরা.ড়ৎম এ। কিন্তু এখন এর পিয়ার রিভিউ সম্পন্ন হবার পর এটি ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস এর মতো জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।**

**তাহলে এখন পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত তা হল, আমরা একটি বিস্ময়কর কণা পেলাম যাকে স্ট্যান্ডার্ড মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তাত্ত্বিক হিসবা-নিকাশ বলছে এটি প্রকৃতির পঞ্চম মৌলিক বলের বাহক হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু এ বিষয়ে পরীক্ষামূলক প্রমাণ এখনো যথেষ্ট হয়নি। তবে সারা বিশ্বের গবেষকরা এর পেছনে লেগেছেন, যার ফলে আশা করা হচ্ছে এক বছরের মধ্যেই রেজাল্ট পাওয়া যাবে।**

**ফেং বলেন, “কণিকাটি খুব হালকা হবার কারণে এর প্রতিক্রিয়াও খুব দুর্বল। তবে সারা বিশ্বে গবেষকদের অনেকগুলো দল ছোট ছোট পরীক্ষাগারে কাজ করছেন। প্রাথমিক সেই ইঙ্গিতের কারণে সবাই এখন অন্তত এটুকু জানেন যে কোথায় খুঁজতে হবে।“ কণিকাটি ভারী না হলেও প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত এমন হালকা কণিকা তৈরি করার মতো প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের হাতে আছে।**

**কী হবে যদি সত্যিই পাওয়া যায় এই পঞ্চম বল? আমরা এখনো সেটা থেকে বেশ দূরে আছি। তবে ফেং বলছেন যে বলটি তড়িচ্চুম্বকীয় এবং দুর্বল ও সবল নিউক্লিয় বলের সাথে যুক্ত হয়ে একটি সুপার ফান্ডামেন্টাল বল গঠন করতে পারে- যে বলটি এর নিজস্ব কণা ও বলের মাধ্যমে ডার্ক সেক্টরে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।**

**তিনি আরো বলেন, ‘হতে পারে এই দুটি সেকটর অজানা কোনো উপায়ে একে অপরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলছে।‘ হাঙ্গেরির এই পরীক্ষার ফলে হয়ত আমরা এই ডার্ক সেক্টরের বলকেই প্রোটোফোবিক বল হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। অন্য দিকে আবার ডার্ক ম্যাটারের প্রকৃতি বোঝার জন্যে পরিচালিত গবেষণার সাথেও এই ফলাফলের মিল রয়েছে। স্টার ওয়ারস মুভি সিরিজের দি ফোর্স এর অন্ধকার (ডার্ক) ও আলোকীয় অংশের সাথেও মিল আছে এর।**

**পুনশ্চ-১: এখন পর্যন্ত জানা মৌলিক বলসমূহ**

**প্রথম হল মহাকর্ষ। নিউটনের পর আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে মহাকর্ষের উন্নত রুপ প্রদান করেন ১৯১৫ সালে। তত্ত্বটি প্রযোজ্য মহাবিশ্বের বড়ো স্কেলের কাঠামোর ক্ষেত্রে। এখানে মহাকর্ষকে তুলে ধরা হয়েছে স্থান- কালের বক্রতা হিসেবে।**

**দ্বিতীয় প্রকার মৌলিক বল হল তড়িচ্চুম্বকীয় বল। বৈদ্যুতিক চার্জধারী কণারা এই বলের মাধ্যমে কাজ করে। অণু ও পরমাণুর জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে এই বল।**

**তৃতীয় মৌলিক বল সবল নিউক্লিয় বলের (সংক্ষেপে শুধু সবল বল) কাজ হল পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠনকারী কণাগুলোকে একত্রে ধরে রাখা। আর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্যে দায়ী হল চতুর্থ মৌলিক বল দুর্বল নিউক্লিয় বল।**

**ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে ও ওয়েরেস্টেডদের হাত ধরে ১৮৩০ এর দশকে তড়িৎ ও চুম্বক বলকে একীভূত করা সম্ভব হয়। ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল বল দুটির সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্ব (ফিল্ড থিওরি) প্রকাশ করেন। ম্যাক্সওয়েল দেখেছিলেন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সব সময় একটি নির্দিষ্ট বেগে চলে। সেই বেগটি হয়ে দাঁড়াল আলোর বেগে সমান। আলোর বেগ ধ্রুব কেন তা তখন মাথায় না ঢুকলেও সেই ধ্রুবতা কাজে লাগিয়েই ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন স্থান- কালকে একত্র করে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব তৈরি করেন। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব সন্ধি করলেও সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব এখনো অন্য বলদের সাথে একমত হয়নি। ভাইল, কালুজা এবং স্বয়ং আইনস্টাইন নিজেও এর পেছনে সময় দিয়ে গেছেন, কিন্তু সফলতার মুখ মেলেনি এখনো।**

**অন্য দিকে ১৯৬০ এর দশকে শেলডন গ্যাশো, আব্দুস সালাম ও স্টিভেন উইনবার্গের হাত ধরে তড়িচ্চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লিয় বলকে একত্র করার থিওরি পাওয়া যায়। ১৯৭৩ সালে আসে তাঁদের মতের পক্ষে পরীক্ষামূলক প্রমাণ। সমন্বিত তত্ত্বটিকে এখন ইলেকট্রৈউইক থিওরি বলা হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে তাঁরা এ জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম সার্নের গবেষণাগারে ডাব্লিও এবং জেড বোসন তৈরি করা সম্ভব হয়।**

**ইলেকট্রোউইক থিওরিকে সবল বলের সাথে একই সাথে ব্যাখ্যা করার জন্যে গ্ল্যাশো ও জর্জি প্রথম একটি গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি দেন। পরে সালাম ও জোগেশ পাটিও একই রকম মডেল দাঁড় করান। তৈরি হয় এরকম আরীও নানান মডেল। তবে এসব মডেলের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পেতে খুব উচ্চ শক্তির পরীক্ষার প্রয়োজন বলে তা এখনো সম্ভব হয়নি।**

**কিন্তু মহাকর্ষ এখনো অন্যদের সাথে সন্ধি করার কোনো রকম মানসিকতা দেখাচ্ছে না। এ অবস্থায় আরেকটি বল পাওয়া গেলে থিওরি অব এবরিথিং প্রস্তুত করতে খাটুনি একটু বাড়বে বৈকি। অবশ্য আগেই আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি যে একে অন্যদের সাথে মিলিয়ে নেওয়া মহাকর্ষের মতো কঠিন হবে না।**

**পুনশ্চ-২: নতুন মৌলিক বলটি সম্পর্কে এখনই শতভাগ নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। অনেক সময়ই এমন হয় যে তথ্য-উপাত্তকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারার অভাবে ভুল জিনিসকে প্রমাণিত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যেমন কিছু দিন আগেই গুঞ্জন উঠেছিল যে নতুন একটি মৌলিক কণিকা খুঁজে পাওয়া গেছে। আগস্টের শুরুতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সার্ন অফিসিয়ালি জানিয়ে দিয়েছে, তথ্যটা সঠিক নয়। আপাতত কোনো মৌলিক বল পাওয়া যায়নি।**

**২০১১ সালে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে সার্নের গবেষণাগারে দুই দুইবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়, আলোর চেয়ে বেশি বেগ পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সন্দেহ যায়নি। পরে ২০১২ সালের মার্চে এসে দেখা যায়, পরীক্ষায় ভুল ছিল।**

**তবে মৌলিক বল খুঁজে পাবার এ ব্যাপারটি সেরকম নয় বলেই মনে হয়। অন্তত এর ভাবসাব দেখে তাই মনে হচ্ছে। কারণ এটি প্রতিষ্ঠিত কোনো কিছুর সরাসরি বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। তাই আমরা চেয়ে থাকি নতুন কিছুর আশায়।**

**সূত্রঃ আর্থস্কাই ডট অরগ, সায়েন্স অ্যালার্ট, আরকাইভ ডট অরগ, ইংরেজি উইকিপিডিয়া: ইউনিয়ায়েড ফিল্ড থিওরি।**

**এক ঢিলে পাঁচ পাখি**

**[পদার্থবিদ্যার নতুন মডেলে পাঁচ সমস্যার সমাধান]**

**বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম সফল তত্ত্ব স্ট্যা›ডার্ড মডেল। আমাদের মহাবিশ্বের সুনিপুণ কাঠামো টিকে আছে চারটি মৌলিক বলের সমন্বয়ে। এদের তিনটিকেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল খুব দারুণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এরা হল তড়িৎচুম্বকীয় এবং দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় বল। এছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড মডেল পরিচিত সব অতিপারমাণবিক কণিকাদেরকে তালিকাভূক্ত করেছে সুসংগঠিতভাবে।**

**১৯৬০ এর দশকের বহু বিজ্ঞানীর মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এই মডেলটি। উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল গেল ম্যান, উইনবার্গ, গ্ল্যাাশো ও সালামের। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে ঈশ্বর-কণার (হিগস বোসন) র্পূব অনুমান করেন। ২০১২ সালে হিগস বোসন কণা আবিষ্কৃত হলে প্রমাণিত হয় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। এছাড়াও এই মডেলের ঘোষণা অনুসারেই ১৯৯৫ সালে পাওয়া যায় টপ কোয়ার্ক নামক কণিকা। ২০০০ সালে পাওয়া যায় আরেকটি কণিকা- টাউ নিউট্রিনো। ফলে কণা-পদার্থবিজ্ঞানীদের আস্থার প্রতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে মডেলটি।**

**এতক্ষণ প্রশংসা করলাম। এবার এর দুর্বলতার ব্যাপারে কিছু বলি। আগেই বলেছি স্ট্যান্ডার্ড মডেল তিনটি বলকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল আরেকটি বল মহাকর্ষকে এটি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মহাবিশ্বের মোট ভরের প্রায় ৮৪ শতাংশ হল ডার্ক ম্যাটার। অথচ স্ট্যান্ডার্ড মডেল এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে অক্ষম। মহাবিশ্বে পদার্থের তুলনায় প্রতিপদার্থে পরিমাণ কেন নগণ্য, তাও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ তত্ত্বটি। জšে§র ১০-৩৬ সেকেন্ড পরে মহাবিশ্ব অতি তীব্র বেগে প্রসারিত হয়েছিল। এ ঘটনার নাম স্ফীতি (ওহভষধঃরড়হ)। এর ব্যাখ্যায়ও নতজানু মডেলটি। এছাড়াও স্ট্রং সিপি প্রবলেম ও নিউট্রিনো স্পন্দন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না তত্ত্বটির কাছে। সেজন্যেই বিকল্প তত্ত্বের বড় প্রয়োজন। সম্প্রতি এ রকমই মডেল প্রস্তাব করেছেন ফ্রান্সের প্যারিস-স্যাক্লে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক গিয়েরমো বায়েসতেরোস। মডেলটির নাম স্ম্যাশ (ঝগঅঝঐ)।**

**এ মডেলটিও কিছুটা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে। তবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চেয়ে একটু লম্বা। স্ট্যান্ডার্ড মডেল নির্মিত এক গুচ্ছছ কণা ও বল নিয়ে। এই কণা ও বলগুলোর মাধ্যমেই মহাবিশ্বের সকল মৌলিক উপাদানের ব্যখ্যা দেওয়া হয়। স্ট্যান্ডার্ড মডেল এখন পর্যন্ত কোনো পরীক্ষায়ই ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু এর দুর্বলতাগুলো একেবারে চোখে পড়ার মতো। তার মানে স্ট্যান্ডার্ড মেেডলে কিছু একটার কমতি আছে। সুইস ফেডারেল ইনস্টটিটিউট অব টেকনোলজির মিখাইল শাপোশনিকভ বলেন, ’আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমাদের নতুন কিছু কণা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হল ঠিক কতগুলো নতুন কণা প্রয়োজন?’ সুপারসিমেট্রি বা অতিপ্রতিস্যাম্যসহ কিছু কিছু মডেল আছে, যাতে শত শত নতুন কণা প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই কণাগুলোর কোনোটিকেই কখনও শনাক্ত করার যায়নি। ব্যর্থ লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডারের মতো যন্ত্রও। কিন্তু নতুন এই স্ম্যাশ মডেল অনুসারে মাত্র ছয়টি নতুন কণার প্রয়োজন। তিনটি নিউট্রিনো, একটি ফার্মিয়ন ও একটি ক্ষেত্র (ঋরবষফ), যাতে আছে বাকি দুটি কণা।**

**মডেলের সহ-প্রস্তাবক ও জার্মান ইলেকট্রন সিনকোট্রোন এর গবেষক আন্দ্রে রিংবাল্ড বলেন, ’এটি আসলে অনেকগুলো মডেলের সমন্বিত রূপ।’ ২০০৫ সালে শাপোশনিকভের দেওয়া মডেলের ভিত্তিতে এটি প্র¯‘ত করা হয়েছে। আমাদের পরিচিত তিনটি নিউট্রিনোর সাথে আরও তিনটি নতুন নিউট্রিনো যুক্ত করে চারটি মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন শাপোশনিকভ। সমস্যাগুলো হল ডার্ক ম্যাটার, স্ফীতি, নিউট্রিনোর ধর্ম সম্পর্কে কিছু রহস্য এবং ব¯‘র উৎপত্তি (ড়ৎরমরহং ড়ভ সধঃঃবৎ)।**

**এর সাথে একটি ক্ষেত্রকে জুড়ে দিয়ে সমস্যাগুলোকে একটু ভিন্ন উপায়ে সমাধান করতে চায় নতুন স্ম্যাশ মডেল। এই ফিল্ড বা ক্ষেত্রে আছে দুটো কণা- অ্যাক্সায়ন ও ইনফ্লাটন। প্রথমটি দরকার ডার্ক ম্যাটারের জন্যে, আর পরেরটি ব্যাখ্যা করবে ইনফ্লেশন বা স্ফীতিকে। শুধু তাই নয়, স্ম্যাশ সমাধান করবে পঞ্চম আরেকটি সমস্যাও। এটা হল, মহাবিশ্বে প্রতিপদার্থের তুলনায় পদার্থের পরিমাণ বেশি কী কারণে?**

**রিংবাল্ড বলেন, ’এই তত্ত্বের সবচেয়ে ভালো দিক হল, আগামী ১০ বছর বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই একে পরীক্ষা করা যাবে। আপনি যে কোনো সময় নতুন তত্ত্ব বানাতেই পারেন, কিন্তু যদি এমন হয় যে তাকে ১০০ বছরেও বা কখনোই পরীক্ষা করা যাবে না, তবে সেটা সত্যিকারের বিজ্ঞান নয়।’ স্ম্যাশ অনুসারে, অ্যাক্সায়নরা হবে ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় এক হাজার কোটি গুণ বড়। এ আকারের কণা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে সক্ষম যন্ত্র নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়াতে ইতোমধ্যেই গবেষণা হচ্ছে। একই রকম যন্ত্র নির্মিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতেও। এখন শুধুই অপেক্ষা। হয় এই মডেলটি সঠিক প্রমাণিত হবে। নয়ত আমাদেরকে খুঁজতে হবে নতুন কোনো মডেল।**

**সূত্র: নিউ সায়েন্টিস্ট, উইকিপিডিয়া।**

**মহাশূন্যে কোয়ান্টাম বিজড়নের নতুন রেকর্ড**

**আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্যেই আইনস্টাইন সবচেয়ে বেশি পরিচিত-সেটা ঠিক আছে। তবে পদার্থবিদ্যার অপর ভিত কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়ও রয়েছে তাঁর মৌলিক অবদান। তাঁর নোবেলও পাওয়া এখানেই। তবু কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও মেনে নেননি। স্বীকার করেননি এর অসম্ভব অদ্ভুত বক্তব্যগুলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে তাঁর একাধিক ব্যাঙ্গাত্বক বক্তব্য আছে। এরই একটি হলো তাঁর ভাষায় ’স্পুকি অ্যাকশন অ্যাট অ্যা ডিসটেন্স’ বা ’দূর থেকে ভ’তুড়ে কা-’। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটি বৈশিষ্ট্য হলো কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট বা কোয়ান্টাম বিজড়ন। এটার উদ্ভট ফলাফল নিয়েই তাঁর এই বক্তব্য।**

**কথাটার মানে হলো, দুটি বিজড়িত কণা অনেক দূরে অবস্থান করেও পরস্পর নির্ভরশীল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। একে অপর থেকে যত দূরেই থাকুক, একের অবস্থান, ভরবেগ, ঘূর্ণন ইত্যাদি পুরোপুরি অন্যের ওপর নির্ভর করে। হোক তারা শত শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অব¯ি’ত। মনে করুন, কোনো স্ফটিক থেকে একটি লেজার রশ্মি নিক্ষিপ্ত হলো, যা একটিমাত্র ফোটন কণাকে ভেঙে দুটো বিজড়িত কণায় পরিণত করতে পারে। এখন দুটো ফোটন যদি দুদিকে রওয়ানা হয়ে যায়, পৌঁছে যায় লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরেও, তবু একটির যেকোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা মাত্রই অপরটির বৈশিষ্ট্য জানা যাবে। যেমন একটি যদি স্পিন-আপ কণা হয়, তবে নিশ্চিত করে বলা যাবে, অপরটি হলো স্পিন-ডাউন কণা। যদি জানা যায়, একটি ঘুরছে ঘড়ির কাঁটার দিকে, তবে সাথে সাথে বলে দেওয়া যাবে, অপরটি ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে। তাদের দূরত্ব এক সেন্টিমিটার হোক কিংবা তারা মহাবিশে^র দুই আলাদা প্রান্তেই থাকুক সেটা বিবেচ্য নয়। এখানেই আইনস্টাইনের ঘোর আপত্তি। তাঁর মতে, একটি কণার কিছু ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে অন্যটির ওপর পড়তে পারে না।**

**কারণ, (আপাত দৃষ্টিতে) লঙ্ঘিত হচ্ছে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অন্যতম একটি নীতি। কোনো তথ্যই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পদার্থবিদ জন বেল তাঁর ’বেল অসমতা’র মাধ্যমে প্রমাণ করেন, কণারা এমন পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত আচরণ করতে পারে। যদিও তারা থাকে বহু বহু দূর। যে দূরত্বে আলোর চেয়ে দ্রুত কোনো তথ্য পৌঁছতে পারার কোনো কথা নয়। উপরন্ত প্রমাণ করেন, এমন ঘটনা ঘটতে কোনো সময়ই লাগে না। ফলে দূরত্ব কোনো প্রভাবই রাখতে পারে না এক্ষেত্রে। আসলে, কোয়ান্টাম বিজড়ন আপেক্ষিকতা নীতির বিরুদ্ধে যায় না। কারণ, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে, কোনো স্থান থেকে অন্য স্থানে আলোর চেয়ে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আর কোয়ান্টাম বিজড়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রেরণ করা হয় না। এ কৌশল কাজে লাগিয়ে ঠিক আলোর চেয়ে দ্রুত তথ্য প্রেরণের কাজ সম্ভব নয়।**

**চিত্র: জন বেল**

**পরবর্তীতে অসংখ্য পরীক্ষায় বেল অসমতার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথম পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন স্টুয়ার্ট ফ্রিডম্যান ও জন ক্লোজার। ১৯৭২ সালে। ১৯৮২ সালে অ্যালেইন অ্যাসপেক্ট আরেকটি পরীক্ষায় একই কথা প্রমাণ করেন। কিন্তু পরীক্ষাগুলোতে একটি ত্রুটি থেকেই যাচ্ছিল। ২০১৫ সালে সেটারও সমাধান হয়। ২০১৫ সালে আরকেটি মজার ব্যাপারও ঘটে। একটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, বিজড়ন ঘটার জন্যে দুটি কণার দরকার নেই। একটিমাত্র কণাও এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে পারে। এক্ষেত্রে একটিমাত্র কণার তরঙ্গ সমীকরণ বিশাল দূরত্ব জুড়ে বিস্তৃত থাকে। কিন্তু আসলে এটি কখনোই একের অধিক জায়গায় থাকে না। আসলে এর তরঙ্গ সমীকরণ বিশাল জায়গাজুড়ে বিস্তৃত থাকলেও পরিমাপ করা মাত্রই তরঙ্গ ফাংশন ভেঙে পড়ে। একটি অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়।**

**গত ১৬ জুন এ বিষয়ে ’সায়েন্স’ ম্যাগাজিনে নতুন একটি অগ্রগতির ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সফলভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে বিজড়িত ফোটনের সঞ্চালন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। সেটাও সম্পন্ন করা গেছে ১২০৩ কিলোমিটারের মতো বড় দূরত্বে। এর আগে এ পরীক্ষা মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে সফলভাবে সম্পন্ন করা গিয়েছিল। এ কাজে ব্যবহার করা হয় মিসিয়াস নামের কোয়ান্টাম-নিয়ন্ত্রিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। বিজড়িত ফোটন ব্যবহার করে চীনে অব¯ি’ত তিনটি আলাদা গ্রাউন্ড স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি স্টেশন নিজেরা প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরত্বে এবং উপগ্রহ থেকে ৫০০ থেকে ২০০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, দূরত্ব ফোটনের বিজড়নে কোনো ছেদ ঘটাতে পারে না।**

**গবেষণা দলের প্রধান জুয়ান ইনের মতে, লেজার রশ্মি ও উপগ্রহ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বৈশি^ক কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের অপেক্ষাকৃত ভালো মাধ্যম হতে পারে এ কৌশল। আগে থেকেই হ্যাকিং-মুক্ত ও সুপারকম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে এ নীতির ব্যবহার ছিল। তাত্ত্বিক অগ্রগতির পাশাপাশি তাই এ অর্জনের দ্রুত ব্যবহারিক প্রয়োগও সম্ভব।**

**সূত্র: ফিজ ডট অরগ, স্পেস ডট কম, সায়েন্স অ্যালার্ট।**

**আলোয় আলোয় সংঘাত!**

**যেসব কণিকাদের প্রতিকণা মূল কণিকা থেকে আলাদা, তাদের সাক্ষাতের পর কণা শক্তিতে রূপান্তরতি হয়। আপনি বলেছেন, ফোটন যদি নিজেই নিজের প্রতিকণা হয় তাহলে তো এরা পরস্পরের সাথে মিলে শক্তি তৈরি করে ফেলার কথা। এখানে মনে রাখতে হবে, ফোটন এমন একটি মৌলিক কণা, যেটি কিনা আবার তড়িৎচুম্বকীয় বলের বাহক এবং তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের কোয়ান্টাম। আমাদের পরিচিত আলোও এক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ। আর আমরা জানি, আলো এক ধরনের শক্তি। ফলে ফোটন নিজেই শক্তির একটি রূপের একক। নতুন করে এটি তাই শক্তিতে রূপান্তরিত হবার বিষয়টি অপ্রাসংগিক। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, সেক্ষেত্রে ফোটন ফোটন সংঘর্ষের ফল কী হবে?**

**যেসব কণিকারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিকণা তাদের সংঘর্ষে সাধারণত বিপরীত ঘটনা ঘটে। বিশেষ বিশেষ কিছু অবস্থায় তারা মিলিত হয়ে কিছু ব¯‘কণা ও তাদের নিজস্ব প্রতিকণার জোড় তৈরি করে। মনে রাখতে হবে, ফোটন কিন্তু ব¯‘ কণা নয়, বরং বলবাহী কণা। একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রতি-ইলেকট্রনের (পজিট্রন) সংঘর্ষে যেমন এক জোড়া বা তারও বেশি ফোটন তৈরি হতে পারে, তেমনি এক জোড়া ফোটনের সংঘর্ষে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড় তৈরি হতে পারে। পরি¯ি’তির ওপর নির্ভর করে অন্য কণাও তৈরি হতে পারে। কণাপদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারগুলোতে এটা অহরহ ঘটে। মহাবিশে^র সৃষ্টির শুরুতে শক্তিরই আধিক্য ছিল। ছিল ফোটনের ছড়াছড়ি। এক সময় মহাবিশে^র তাপমাত্রা কমে এলে ফোটন-ফোটন সংঘর্ষে ব¯‘ কণা তৈরি শুরু হয়। শুরু হয় পদার্থ তৈরি।**

**ত্বরকযন্ত্রের কণা গতি পায় কোথায়?**

**পারমাণবিক কণিকাদেরকে দ্রুত বেগে ছুট লাগানোর দৈত্য লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডারের (খঐঈ) নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। এর মাধ্যমেই ২০১২ সালে পাওয়া যায় হিগস বোসন নামক কণা।কিন্তু এলএইচসি একা নয়। পৃথিবীতে কণা ত্বরকযন্ত্র আছে ৩০ হাজারেরও বেশি। এলএইচসির মতো এদের অধিকাংশ মেশিনেই কণার গতি বাড়িয়ে আলোর বেগের খুব কাছে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন কণার মধ্যে ঘটানো হয় সংঘর্ষ। উদ্দেশ্য, মহাবিশ্বের মৈৗলিক উপাদানের খোঁজ করা। এছাড়াও দুধ ও পটেটো চিপসের প্যাকেট বন্ধ করার মতো নানামুখী কিছু কাজেও ত্বরকযন্ত্র কাজে আসে।**

**আমেরিকার নিউইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে আছে একখানা অতি উন্নত কণা ত্বরকযন্ত্র। এর নাম ন্যাশনাল সিঙ্কোট্রোন লাইট সোর্স টু (ঘঝখঝ ওও)।এখানে চলে বিচিত্র সব কাজ- কারবার। এই যেমন ধরো উন্নত মেডিসিন বা কম্পিউটার চিপ তৈরি থেকে শুরু করে আমাদের দেহের এবং মাটির অণু নিয়ে বিশ্লেষণ পর্যন্ত।**

**এনএসএলএস টু যন্ত্রে কণিকাদেরকে প্রচ- বেগে গতিশীল করা হলে এদের থেকে বের করে আনা যায় শক্তি, যা দিয়ে চালানো যায় নানা রকম পরীক্ষা। আলোর বেগের কাছোকাছি বেগে ছোটা ইলেকট্রনরা যখন বিভিন্ন জায়গায় মোড় নেয়, সে সময় এরা এক্সরের মতো বিভিন্ন বিকিরণরূপে শক্তি হারায়। এর এক্সরে অনেক বেশি তেজস্বী, যা আমাদের দাঁতের ডাক্তারদের কাছে থাকা এক্সরে মেশিনের চেয়ে একশো কোটি গুণ শক্তিশালী।**

**এই বিশাল তেজস্বী আলো ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর উপর ফেলে পরমাণুর মতো ছোট্ট অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ চালানো সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কণা ত্বরকযন্ত্রগুলোতে কণাকে কীভাবে এত শক্তি দেওয় হয় যে এরা আলোর ৯৯.৯৯ ভাগ গতিতে ছুটতে পারে।**

**প্রথমত, ইলেকট্রন গানের সাহায্যে ইলেকট্রনের রশ্মি উৎপন্ন করা হয়। এরপর একে পাঠানো হয় লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর বা রৈখিক ত্বরকযন্ত্রের (লিনাক) ভেতরে। লিনাকের মধ্যে তড়িচ্চুম্বক ও মাইক্রোওয়েভ বেতার কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে ইলেকট্রনের গতি বৃদ্ধি করা হয়। এদেরকে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য স্থানের মধ্যে রাখার ব্যবস্খা করা হয়, যাতে অন্য কণার সাথে সংঘর্ষে এদের গতি কমে না যায়। আসল কাজ শুরু হয় এবার। ইলেকট্রন প্রবেশ করে বুস্টার রিং এর মধ্যে। এখানে চুম্বক ও বেতার কম্পাঙ্ক এদের গতি বাড়িয়ে আলোর বেগের ৯৯.৯৯ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর এদেরকে স্টোরেজ রিং নামক একটি বৃত্তাকার বলয়ের মধ্যে আনা হয়। এখানে এরা চালিত হয় এক গুচ্ছ চুম্বক দ্বারা।**

**নীল চুম্বকদের কাজ হচ্ছে ইলেকট্র্নের গতিকে বাঁকিয়ে দেওয়া, হলুদ চুম্বকদের কাজ ইলেকট্রনের পথকে একমুখী ও ভিন্নমুখী করা। লাল ও কমলা চুম্বকরা দূরে অবস্থিত ইলেকট্রনদেরকে নিকটে নিয়ে আসে। আরো ছোট চুম্বকদের কাজ হল রশ্মিকে একই রেখায় ধরে র রাখা। স্টোরেজ রিং এর ভেতরেই অতি উজ্জল ও একমুখী রশ্মি উৎপাদনের ব্যাবস্থা থাকে। স্টোরেজ রিং এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ইলেকট্রনের গতি কমে যায়, যার ফলে ক্ষয় হয় কিছু শক্তি। এই ক্ষয়কৃত শক্তিকে এক্সরেসহ বিভিন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণে পরিণত রূপান্তরিত করা যায়। এই রশ্মিকে রিং এর ধার ঘেঁষে নিচের দিকে চালিত করা হয়।এ পথেই এটি গিয়ে সংঘর্ষ করে পরীক্ষাধীন বস্তুর সাথে।**

**এলএইচসির পরিধি এত বিশাল যে অনেকে কাজ করার সময় ট্রাইসাইকেলযোগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যান।**

**যন্ত্র কথন: অ্যালাইস**

**লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডারের (খঐঈ) সাতটি ডিটেক্টরের একটি অ্যালাইস (অখওঈঊ)। পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিগ ব্যাঙ এর ঠিক পরে কোয়ার্ক-গ্লুওন প্লাজমা নামে এক ধরনের পদার্থ গঠিত হয়েছিল। আর এই পদার্থদের শনাক্ত করার কাজেই নিয়োজিত আছে ডিটেক্টরটি। ভূগর্ভের ৫৬ মিটার নিচের একটি প্রকোষ্ঠে অব¯ি’ত এই ডিেেটক্টরে কাজ করছেন ৩০ টি বেশি দেশের দেড় হাজারের অধিক বিজ্ঞানী।**

**এ বছরের এপ্রিলে অ্যালাইস কোলাবরেশনের মুখপাত্র নির্বাচিত হন ইতালীয় পদার্থবিদ ফেদেরিকো অ্যান্তিনোরি। দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে। নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন ১৫৪ টি ইনস্টিটিউটের পনের শ এরও বেশি পদার্থবিদের গবেষণায়।**

**১৯৯৩ সালে সার্নে অ্যালাইস এক্সপেরিমেন্ট গঠিত হয়। শুরু থেকেই তিনি এর সদস্য। এ পর্যন্ত পালন করেছেন অনেকগুলো বড় বড় দায়িত্বও। মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত তিনি ফিজিক্স কোওর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সময়কালে অ্যালাইস এক্সপেরিমেক্ট থেকে অনেকগুলো বড় বড় সাফল্যের দেখা মেলে। যেমন, ২০১৫ সালে অ্যালাইস যন্ত্রে অন্য যেকোনো ত্বরকযন্ত্রের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে লেড আয়নের সংঘর্ষ ঘটানো হয়। তারও আগে তিনি হেভি আয়ন ফার্স্ট ফিজিক্স টাস্ক ফোর্স এর কোওর্ডিনেটর ছিলেন। ২০০৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন কোলাবরেশনের ডেপুটি মুখপাত্র। অ্যালাইস ট্রিগার প্রকল্পেরও প্রথম কোওর্ডিনেটর ছিলেন তিনি। ২০১১ সাল পর্যন্ত এখানে থাকা অবস্থায় তিনিই নির্ধারণ করতেন, পরীক্ষায় কী কী থাকবে। সার্বিকভাবে অ্যালাইসের কার্যক্রম শুরুতেও তাঁর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ।**

**এর আগে অ্যান্তিনোরি ইতালির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (আইএনএফএন) -এ কাজ করেছিলেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মির শুরু করা নিউক্লিয়ার গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। সার্ন, ফার্মিল্যাবসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ হয় এখানে। সেই সূত্রেই অ্যান্তিনোরির সাথে সার্নের সম্পর্ক।**

**সূত্র: সার্ন, আইএনএফএন ডট আইটি, ইংরেজি উইকিপিডিয়া।**

**পরিশিষ্ট**

**তথ্যসূত্র**

**বই:**

**১. খরফফষব, অহফৎব.ি ওহঃৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় গড়ফবৎহ অংঃৎড়হড়সু**

**২. উধারবং, চধঁষ. অনড়ঁঃ ঞরসব**

**৩. ঞযড়ৎহব, করঢ়. ইষধপশ ঐড়ষব ধহফ ডধৎসযড়ষবং, ঊরহংঃবরহ’ং ঙঁঃৎধমবড়ঁং খবমধপু.**

**৪. কযধষরষর, ঔরস, অষ. ইষধপশ ঐড়ষবং, ডড়ৎসযড়ষবং ধহফ ঞরসব গধপযরহবং.**

**৫. অহমবষড়, অ, ঔড়ংবঢ়য, ঊহপুপষড়ঢ়বফরধ ড়ভ ঝঢ়ধপব ধহফ অংঃৎড়হড়সু.**

**৬. ঝপযধধভ, ঋৎবফ. ঞযব ইৎরমযঃবংঃ ঝঃধৎং.**

**৭. ঝপযধধভ, ঋৎবফ. ঞযব ৫০ ইৎরমযঃবংঃ ঝরমযঃং রহ অংঃৎড়হড়সু ধহফ ঐড়ি ঃড় ঝবব ঞযবস.**

**৮. জববং, গধৎঃরহ. ঔঁংঃ ঝরী ঘঁসনবৎং, ঞযব উববঢ় ঋড়ৎপবং ঃযধঃ ঝযধঢ়ব ঃযব টহরাবৎংব.**

**৯. ঐধশিরহম, ড, ঝঃবঢ়যবহ. ঞযব টহরাবৎংব রহ ধ ঘঁঃংযবষষ.**

**১০. ঝঃবরহ, উ, ঔধসবং. ঈড়ংসরপ ঘঁসনবৎং, ঘঁসনবৎ ঃযধঃ উবভরহব ঙঁৎ টহরাবৎংব.**

**১১. কধশঁ, গরপযরড়. ঊরহংঃবরহ’ং ঈড়ংসড়ং**

**১২. কধশঁ, গরপযরড়. ইবুড়হফ ঊরহংঃবরহ**

**১৩. কধশঁ, গরপযরড়. চধৎধষষবষ ডড়ৎষফং অ ঔড়ঁৎহবু ঞযৎড়ঁময ঈৎবধঃরড়হ, ঐরমযবৎ উরসবহংরড়হং,অহফ ঞযব ঋঁঃঁৎব ঙভ ঞযব ঈড়ংসড়ং.**

**ওয়েব লিঙ্ক:**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িষরাবংপরবহপব.পড়স/ম০০/৩৩৬৪৬-ঁহরাবৎংব-বফমব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/খরংঃথড়ভথাবযরপষবথংঢ়ববফথৎবপড়ৎফং**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িঁহরাবৎংবঃড়ফধু.পড়স/১৩৮০৮/যড়-িপধহ-মধষধীরবং-ৎবপবফব-ভধংঃবৎ-ঃযধহ-ঃযব-ংঢ়ববফ-ড়ভ-ষরমযঃ/**

**ক্স বিন.সরঃ.বফঁ**

**ক্স যঃঃঢ়://সধঃয.ঁপৎ.বফঁ/যড়সব**

**ক্স িি.িযঁননষবংরঃব.ড়ৎম**

**ক্স িি.িংঢ়ধপব.পড়স**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/হড়-ঃযব-ঁহরাবৎংব-রং-হড়ঃ-বীঢ়ধহফরহম-ধঃ-ধহ-ধপপবষবৎধঃবফ-ৎধঃব-ংধু-ঢ়যুংরপরংঃং**

**ক্স যঃঃঢ়://ঢ়যুং.ড়ৎম/হবংি/২০১৬-১০-ঁহরাবৎংব-ৎধঃবড়ৎ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িঁহরাবৎংবঃড়ফধু.পড়স/৩৬৩০২/ধঃড়সং-রহ-ঃযব-ঁহরাবৎংব/#**

**ক্স যঃঃঢ়://বধৎঃযংশু.ড়ৎম/?ং=ঃধননু**

**ক্স যঃঃঢ়://বধৎঃযংশু.ড়ৎম/ংঢ়ধপব/ঃধননুং-ংঃধৎ-সড়ৎব-বিরৎফহবংং**

**যঃঃঢ়://িি.িঃবফ.পড়স/ঃধষশং/ঃধনবঃযধথনড়ুধলরধহথঃযবথসড়ংঃথসুংঃবৎরড়ঁংথংঃধৎথরহথঃযবথঁহরাবৎংব/ঃৎধহংপৎরঢ়ঃ?ষধহমঁধমব=বহ#ঃ-৩৬৪০৫৭**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/কওঈথ৮৪৬২৮৫২**

**ক্স যঃঃঢ়://পড়ড়ষপড়ংসড়ং.রঢ়ধপ.পধষঃবপয.বফঁ/ধংশ/৫-ঐড়-িষধৎমব-রং-ঃযব-ঝঁহ-পড়সঢ়ধৎবফ-ঃড়-ঊধৎঃয-**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িঢ়ড়ঢ়ঁষধৎসবপযধহরপং.পড়স/ংঢ়ধপব/ফববঢ়-ংঢ়ধপব/হবংি/ধ২৭২৬০/ংসধষষবংঃ-ংঃধৎ-বাবৎ-ফরংপড়াবৎবফ-নু-ধংঃৎড়হড়সবৎং/**

**ক্স িি.িধিরঃনঁঃযিু.পড়স**

**ক্স যঃঃঢ়ং://নৎরধহশড়নবৎষবরহ.পড়স/২০১৫/১২/১৬/রং-ঃযব-ংঁহ-ষড়ংরহম-সধংং/**

**ক্স যঃঃঢ়://ংড়ষধৎ-পবহঃবৎ.ংঃধহভড়ৎফ.বফঁ/ঋঅছ/ছংযৎরহশ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িধংঃৎড়হড়সুপধভব.হবঃ/য়ধফরৎ/য়১৪৯১.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িধংঃৎড়হড়সু.পড়স/হবংি/২০১৩/০৩/যঁননষব-ঢ়রহং-ফড়হি-ধমব-ড়ভ-ড়ষফবংঃ-শহড়হি-ংঃধৎ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িহবংিপরবহঃরংঃ.পড়স/ধৎঃরপষব/২১১৮৫৯৫-রহঃবৎমধষধপঃরপ-পড়ষষরংরড়হ-নরৎঃযবফ-ধ-ংঢ়ধৎশষরহম-ৎরহম-ড়ভ-ুড়ঁহম-ংঃধৎং/**

**ক্স যঃঃঢ়://ংশু.নরংযড়ি.পড়স/২০১৬/০৩/নষপধশ-যড়ষব-২.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িহবংিপরবহঃরংঃ.পড়স/ধৎঃরপষব/ফহ১৪৯৬৮-ভরৎংঃ-ঢ়ঁষংধৎ-রফবহঃরভরবফ-নু-রঃং-মধসসধ-ৎধুং-ধষড়হব/?ভববফওফ=ড়হষরহব-হবংিথৎংং২০**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ংপরবহঃরংঃং-সরমযঃ-যধাব-ভরহধষষু-ফবপড়ফবফ-ঃযব-ংঃৎধহমব-ংরমহধষং-পড়সরহম-ভৎড়স-ঢ়ঁষংধৎং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/চঁষংধৎ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িপভধ.যধৎাধৎফ.বফঁ/হবংি/ংঁ২০১৬৪৩**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/উধৎশথসধঃঃবৎ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/উধৎশথঢ়যড়ঃড়হ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ৎবংবধৎপযবৎং-রিষষ-ংড়ড়হ-ংঃধৎঃ-ঃড়-ংবধৎপয-ভড়ৎ-ধ-ফধৎশ-ঢ়যড়ঃড়হ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/৩৩৭৫০-ভরভঃয-ভড়ৎপব-ড়ভ-হধঃঁৎব-ফধৎশ-সধঃঃবৎ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://ঢ়যুং.ড়ৎম/হবংি/২০১৬-১১-হধ৬৪-সুংঃবৎরড়ঁং-ফধৎশ-ঢ়যড়ঃড়হ.যঃসষ**

**ক্স িি.িঁহরাবৎংবঃড়ফধু.পড়স/১০৪৪৮৬/যড়-িনরম-রং-ড়ঁৎ-ংড়ষধৎ-ংুংঃবস/**

**ক্স ইংরেজি উইকিপিডিয়াঃ ঘবঢ়ঃঁহব, ঊৎরং, কঁরঢ়বৎ নবষঃ; ঙড়ৎঃ পষড়ঁফ; ঘবি ঐড়ৎরুড়হং**

**ক্স যঃঃঢ়://ংড়ষধৎ-পবহঃবৎ.ংঃধহভড়ৎফ.বফঁ/যরফফবহ-ঢ়রপ/ঢ়যড়ঃড়ংঢ়যবৎব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িংঢ়ধপবধহংবিৎং.পড়স/ংড়ষধৎ-ংুংঃবস/ফড়বং-ঃযব-ংঁহ-ৎড়ঃধঃব/**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ংপরবহঃরংঃং-লঁংঃ-ৎবাবধষবফ-ধ-ংঁৎঢ়ৎরংরহম-ংবপৎবঃ-ধনড়ঁঃ-ঃযব-ংঁহ-ং-যরফফবহ-পড়ৎব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/কবঢ়ষবৎ%২৭ংথষধংিথড়ভথঢ়ষধহবঃধৎুথসড়ঃরড়হ#ঐরংঃড়ৎু**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঔড়যধহহবংথকবঢ়ষবৎ#চৎধমঁবথ.২৮১৬০০.ঊ২.৮০.৯৩১৬১২.২৯**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঞুপযড়থইৎধযব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িহধংধ.মড়া/ধঁফরবহপব/ভড়ৎংঃঁফবহঃং/শ-৪/ংঃড়ৎরবং/হধংধ-শহড়ংি/ৎরহম-ধ-ৎড়ঁহফ-ঃযব-ংধঃঁৎহ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ংড়ষধৎ-রিহফ-রং-নষধংঃরহম-বধৎঃয-ং-ড়ীুমবহ-ড়হঃড়-ঃযব-ংঁৎভধপব-ড়ভ-ঃযব-সড়ড়হ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/গড়ড়হ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://ংপরবহপব.হধংধ.মড়া/যবষরড়ঢ়যুংরপং/ভড়পঁং-ধৎবধং/সধমহবঃড়ংঢ়যবৎব-রড়হড়ংঢ়যবৎব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/১৬৮৯৫-যিধঃ-রং-সধৎং-সধফব-ড়ভ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ডধঃবৎথড়হথগধৎং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/গঅঠঊঘ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/চষধহবঃংথনবুড়হফথঘবঢ়ঃঁহব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/৩৩৪৮০-ঢ়ষধহবঃ-হরহব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/চষধহবঃথঘরহব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ধংঃৎড়হড়সবৎং-যধাব-ভড়ঁহফ-ধ-সধংংরাব-বীড়ঢ়ষধহবঃ-ঃযধঃ-ং-যড়ঃঃবৎ-ঃযধহ-সড়ংঃ-ংঃধৎং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/কঊখঞ-৯ন**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংধষড়হ.পড়স/২০১৭/০৬/০৬/ধংঃৎড়হড়সবৎং-ফরংপড়াবৎ-ধ-ঢ়ষধহবঃ-ংড়-যড়ঃ-ঃযধঃ-রঃ-মষড়ংি-ষরশব-ধ-ংঃধৎ/**

**ক্স যঃঃঢ়://হধঃঁৎব.পড়স/ধৎঃরপষবং/ফড়র:১০.১০৩৮/হধঃঁৎব২২৩৯২**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/বি-লঁংঃ-ভড়ঁহফ-ধ-যধনরঃধনষব-ুড়হব-ড়হ-ধহ-বীড়ঢ়ষধহবঃ-১৪-ষরমযঃ-ুবধৎং-ধধিু**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/সববঃ-ংড়ষধৎ-বীঢ়ৎবংং-ঃযব-ংঢ়ধপব-ঃৎধরহ-পড়হপবঢ়ঃ-ঃযধঃ-পধহ-মবঃ-ঃড়-সধৎং-রহ-ঃড়ি-ফধুং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/অঢ়ঢ়ধৎবহঃথসধমহরঃঁফব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িরধহৎরফঢ়ধঃয.পড়স/নৎরমযঃবংঃ.যঃস**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঊীঃৎধঃবৎৎবংঃৎরধষথংশরবং#গবৎপঁৎু**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িয়ঁড়ৎধ.পড়স/ঞযব-ংশু-রং-নষঁব-ড়হ-বধৎঃয-ডযধঃ-পড়ষড়ৎ-রং-ঃযব-ংশু-ড়হ-ড়ঃযবৎ-ঢ়ষধহবঃং-রহ-ড়ঁৎ-ংড়ষধৎ-ংুংঃবস**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িধহংবিৎং.পড়স/ছ/ডযধঃথপড়ষড়ৎথরংথঃযবথংশুথড়হথঃযবথঢ়ষধহবঃথগবৎপঁৎু**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/খরংঃথড়ভথহবধৎবংঃথংঃধৎংথধহফথনৎড়হিথফধিৎভং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িঃরসবধহফফধঃব.পড়স/ঃরসব/বধৎঃয-ৎড়ঃধঃরড়হ.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঊধৎঃয'ংথৎড়ঃধঃরড়হ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ধংঃৎড়হড়সবৎং-ভরহফ-ধ-ফধু-ড়হ-বধৎঃয-রং-মবঃঃরহম-ষড়হমবৎ-বধপয-পবহঃঁৎু**

**ক্স যঃঃঢ়://পঁৎরড়ঁং.ধংঃৎড়.পড়ৎহবষষ.বফঁ/ঢ়যুংরপং/৩৭-ড়ঁৎ-ংড়ষধৎ-ংুংঃবস/ঃযব-সড়ড়হ/ঃযব-সড়ড়হ-ধহফ-ঃযব-বধৎঃয/১৪৭-ঃযব-সড়ড়হ-ংষড়ংি-ঃযব-বধৎঃয-ং-ৎড়ঃধঃরড়হ-নঁঃ-যড়-িভধংঃ-ধিং-রঃ-ংঢ়রহহরহম-নরষষরড়হং-ড়ভ-ুবধৎং-ধমড়-রহঃবৎসবফরধঃব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িঁহরাবৎংবঃড়ফধু.পড়স/৪৭১৮১/বধৎঃযং-ৎড়ঃধঃরড়হ/**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ঃযরং-নরুধৎৎব-সধঢ়-ড়ভ-ঃযব-ড়িৎষফ-রং-ংড়-ধপপঁৎধঃব-রঃ-ভড়ষফং-রহঃড়-ধ-মষড়নব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িরিৎবফ.পড়স/২০১৬/১১/বিরৎফ-মষড়নব-ভড়ষফরহম-সধঢ়-রংহঃ-ঢ়বৎভবপঃ-পষড়ংব/**

**ক্স রসধমব.মংভপ.হধংধ.মড়া/ঢ়ড়বঃৎু/ধংশ/ধ১০৮৪০.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িননপ.পড়.ঁশ/হবংি/ঁশ-ংপড়ঃষধহফ-যরমযষধহফং-রংষধহফং-৩৮০৬৩৬৬২?ঝঞযরংঋই**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িসবঃড়ভভরপব.মড়া.ঁশ/ষবধৎহরহম/ৎধরহনড়ংি/ভড়মনড়ি**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িঃরসবধহফফধঃব.পড়স/ধংঃৎড়হড়সু/ঃবষষ-ঃরসব-নু-ংঃধৎং.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িহধঃঁৎধষহধারমধঃড়ৎ.পড়স/হবংি/২০১০/০৯/ভরহফরহম-ংড়ঁঃয-রিঃয-ড়ৎরড়হং-ংড়িৎফ**

**ক্স যঃঃঢ়://ংংহধারমধঃরড়হ.বিবনষু.পড়স/ভরহফরহম-ফরৎবপঃরড়হ-রিঃযড়ঁঃ-ধ-পড়সঢ়ধংং.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িহধঃঁৎধষহধারমধঃড়ৎ.পড়স/ভরহফ-ুড়ঁৎ-ধিু-ঁংরহম/ংঃধৎং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/অষনবৎঃথঊরহংঃবরহ#চধঃবহঃথড়ভভরপব**

**ক্স যঃঃঢ়://যুঢ়বৎঢ়যুংরপং.ঢ়যু-ধংঃৎ.মংঁ.বফঁ/যনধংব/চধৎঃরপষবং/সঁড়হধঃস.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://ঢ়যুংরপংপবহঃৎধষ.পড়স/বীঢ়ষড়ৎব/ৎিরঃবৎং/রিষষ.পভস যঃঃঢ়://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/২৪৩০৯-ংযধঢ়ব-ড়ভ-ঃযব-ঁহরাবৎংব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঐরংঃড়ৎুথড়ভথমৎধারঃধঃরড়হধষথঃযবড়ৎু**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ঘবঢ়ঃঁহব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/চড়ঁহফ%ঊ২%৮০%৯৩জবনশধথবীঢ়বৎরসবহঃ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/৩১৯১৩-যড়-িংপরবহঃরংঃং-ফবঃবপঃবফ-মৎধারঃধঃরড়হধষ-ধিাবং-ষরমড়.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/খওএঙ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িষরমড়.পধষঃবপয.বফঁ/ঢ়ধমব/যিধঃ-ধৎব-মি**

**ক্স যঃঃঢ়://যুঢ়বৎঃবীঃনড়ড়শ.পড়স/ভধপঃং/গরপযধবষচযরষষরঢ়.ংযঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://বধৎঃযংশু.ড়ৎম/ংঢ়ধপব/ঢ়যুংরপরংঃং-পড়হভরৎস-ধ-ঢ়ড়ংংরনষব-৫ঃয-ভড়ৎপব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/হব-িংঃঁফু-পড়হভরৎসং-ঢ়যুংরপরংঃং-সরমযঃ-যধাব-ংঢ়ড়ঃঃবফ-ধ-ভরভঃয-ভড়ৎপব-ড়ভ-হধঃঁৎব**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ঢ়যুংরপরংঃং-ঃযরহশ-ঃযবু-সরমযঃ-যধাব-লঁংঃ-ফবঃবপঃবফ-ধ-ভরভঃয-ভড়ৎপব-ড়ভ-হধঃঁৎব**

**ক্স যঃঃঢ়://ধৎীরা.ড়ৎম/ধনং/১৬০৮.০৩৫৯১**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/টহরভরবফথভরবষফথঃযবড়ৎু#ঐরংঃড়ৎু**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ইধৎুড়মবহবংরং**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িহবংিপরবহঃরংঃ.পড়স/ধৎঃরপষব/২১১০৫৯১-ঢ়যুংরপং-ঃবিধশ-ংড়ষাবং-ভরাব-ড়ভ-ঃযব-নরমমবংঃ-ঢ়ৎড়নষবসং-রহ-ড়হব-মড়/**

**ক্স যঃঃঢ়ং://ঢ়যুং.ড়ৎম/হবংি/২০১৫-১১-হরংঃ-ঃবধস-ংঢ়ড়ড়শু-ধপঃরড়হ-ফরংঃধহপব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://িি.িংঢ়ধপব.পড়স/৩১৯৩৩-য়ঁধহঃঁস-বহঃধহমষবসবহঃ-ধপঃরড়হ-ধঃ-ধ-ফরংঃধহপব.যঃসষ**

**ক্স যঃঃঢ়://িি.িংপরবহপবধষবৎঃ.পড়স/ঢ়যুংরপরংঃং-লঁংঃ-য়ঁধহঃঁস-বহঃধহমষবফ-ঢ়যড়ঃড়হং-নবঃবিবহ-বধৎঃয-ধহফ-ংঢ়ধপব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://পফং.পবৎহ.পয/লড়ঁৎহধষ/ঈঊজঘইঁষষবঃরহ/২০১৬/২০/ঘবংি%২০অৎঃরপষবং/২১৫৩১৭১?ষহ=বহ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/ওংঃরঃঁঃড়থঘধুরড়হধষবথফরথঋরংরপধথঘঁপষবধৎব**

**ক্স যঃঃঢ়ং://বহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/অখওঈঊথবীঢ়বৎরসবহঃ**

**ক্স যঃঃঢ়ং://পফং.পবৎহ.পয/লড়ঁৎহধষ/ঈঊজঘইঁষষবঃরহ/২০১৬/২০/ঘবংি%২০অৎঃরপষবং/২১৫৩১৭১?ষহ=বহ**